চা ইতিকথা
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

ড. মাইনউদ্দীন আহমেদ

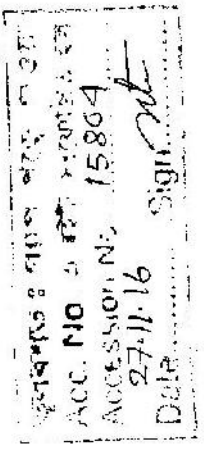

চা ইতিকথা
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

Acc. No
Accession No. 15864
Date 27.11.16
Sign

☐ মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	☐ [illegible]
☐ প্রশাসনিক কর্মকর্তা	☐ হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
☐ বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	☐ ফটোগ্রাফিক কর্মকর্তা
☐ ডকুমেন্টেশন কর্মকর্তা	☑ গ্রন্থাগারিক
ডায়েরী নং	তারিখঃ

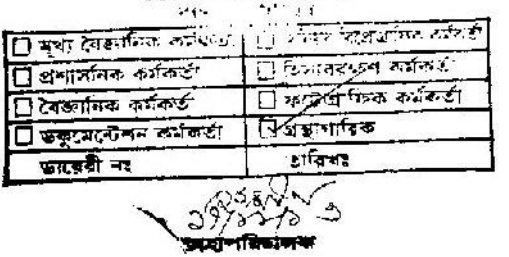

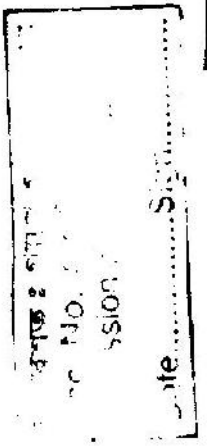

গ্রন্থাগারিক
No.
sion
Sign
Date

ড. মাইনউদ্দীন আহমেদ

উৎসর্গ

যিনি আমাকে গর্ভে ধারণ করেছেন, আমার বাবাকে হারিয়ে মাত্র ৯ মাস বয়সে
আমাকে কোলেপিঠে করে তিলে তিলে মানুষ করেছেন, যিনি নিজের জীবনের সব
সুখদুঃখকে ভুলে আমার মঙ্গলপ্রার্থনা করে চলেছেন
তিনি আমার মা।

প্রাককথা

চা গবেষণা ভবনে ড. মাইনউদ্দীন আহমেদ দেশে-বিদেশে একজন সুপরিচিত চা-বিজ্ঞানী, বিশেষ করে কীটতত্ত্ববিদ হিসেবেতো অবশ্যই। প্রায় তিন যুগ ধরে গবেষণাগারে, পরীক্ষণ খামারে, চা বাগানের মাঠে মাঠে চষে বেড়িয়ে, বিদেশে উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নিয়ে, চায়ের উপর আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে তাঁর অভিজ্ঞতার ডালিতে বিপুল সংগ্রহের মাধ্যমে আজ তিনি একজন পরিপক্ক বিজ্ঞানী। এটা আমাদের গর্ব। ২০০৫ সালে তাঁর লিখিত "Tea Pest Management" বইখানি ছিল কীটতত্ত্বের উপর স্বীয় বিষয়-বিশেষজ্ঞতার প্রথম বহিঃপ্রকাশ। ঐ বইয়ের "Foreword" লিখতে গিয়েই তাঁর মধ্যে একজন সুবিজ্ঞান-লেখিয়ের প্রতিভা ও দক্ষতার আভাস পেয়েছিলাম। বইখানি পাঠককূলে অভিনন্দিত হয়েছিল বলেই জানি। আজ তাই তারই লেখা "চা ইতিকথা- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি" পুস্তকের 'প্রাককথা' লিখতে বড় প্রীতিবোধ করছি

সারা বিশ্বে চা আজ একটি প্রতিষ্ঠিত "স্বাস্থ্যকর সরল পানীয়" ভাগ্যিস ২৭৩৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে চৈনিক সম্রাট শেন নাং (Shen Nung) এর অবকাশ স্থানে ফুটন্ত গরম পানির কেটলিতে পার্শ্বস্থ চা বৃক্ষের কয়েকটি শুকনো পাতা উড়ে এসে পড়েছিল আর তারই আরক-নির্যাসে তিনি এক "আশ্চর্যজনক উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী পানীয়" এর সন্ধান পেয়েছিলেন, নইলে এই বিস্ময়কর পানীয়ের খোঁজ আমরা পেতাম কোত্থেকে! সেই রাজকীয় আবিষ্কার যুগের হাত ধরে প্রায় পাঁচ হাজার বছর পরেও আপামর জনতার দৈনন্দিন জীবনে আজ চা একটি আবশ্যকীয় পানীয়। এখন সকালবেলা এককাপ চা না হলে আমাদের দিন শুরু হতে চায় না। আমরা কি কখনও ভেবে দেখেছি এই একটু চায়ের পিছনে নিহিত কত ইতিহাস, কত ত্যাগ, কত শ্রম ও বঞ্চনা, কত শিল্প, কত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, কত বাণিজ্য, কত কর্মসংস্থান ও সম্ভাবনা?

আমাদের হাতের কাছে বাংলায় চায়ের উপর লেখা বই খুবই কম, আর বিজ্ঞানবিষয়ক লেখাতে তো আরও ঘাটতি। সে শূন্যতা বইখানি অনেকটাই পূরণ করবে। একজন অনুসন্ধিৎসু পাঠক এ বইতে চায়ের ইতিকথা জেনে নিশ্চয়ই চমৎকৃত হবেন আবার আমাদের দেশেরই চা শিল্পের উত্তরাধিকার, পেছনের বিজ্ঞান গবেষণা, চাষাবাদ, শিল্প ও ব্যবস্থাপনা, বাণিজ্য এবং অগ্রযাত্রায় বিভিন্ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ও অবদান সম্পর্কেও একটা সম্যক ধারণা পাবেন। সাধারণ পাঠক, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষক, গবেষক, সর্বোপরি চা উৎপাদনকে যারা নেশা ও পেশা এবং শিল্পোদ্যোগ হিসেবে গ্রহণ করেছেন- তারা সবাই মন ও মননের খোরাক পাবেন বইটিতে।

বইটির লেখক চা-বিজ্ঞানী ড. মাইনউদ্দীন আহমেদ এর প্রতি রইল অনেক অভিনন্দন ও শুভকামনা।

এ এফ এম বদরুল আলম

ঢাকা ২৩ আগস্ট ২০১৬

অবসরপ্রাপ্ত পরিচালক, বিটিআরআই

আমার কথা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণিবিদ্যা পড়তে গিয়ে মাস্টার্সের শেষপর্বে এসে কীটতত্ত্বের উপর 'গবেষণা গুচ্ছের' ছাত্র হবার সুবাদে কীটতত্ত্ববিদের ছাপটা যে পিঠে স্থায়ীভাবে লেগে গেল তা সারা কর্মজীবন ধরেই আমাকে বহন করতে হলো। শেষ পর্যন্ত চা গবেষণায় এসে তরী ভীড়বে এমন কল্পনাও করিনি। ১৯৮৭ সালে নৈসর্গিক শ্রীমঙ্গলের বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউটে কীটতত্ত্ব বিভাগে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করতে পেরে কীটতত্ত্ব বিষয়ে বিদ্যার্জন ও প্রাসঙ্গিক কর্মক্ষেত্র পেয়ে যাওয়ায় ভেতরে ভেতরে গর্ব অনুভব করলেও প্রথম দিকে চ্যালেঞ্জটা মোকাবিলায় দ্বিধান্বিতও কম ছিলাম না। বৈজ্ঞানিক রহস্য ও নব নব আবিষ্কার কাকে না হাতছানি দেয়! ছোটবেলা থেকে আমাকেও দিত। জীবিকার অন্বেষণে চা-গবেষণায় কাজ করতে এসে নিজেকে তাই চা-বিজ্ঞান ধাতস্থ করে তুলতে নিরলস চেষ্টা করলাম। চা ছেড়ে তাই অন্য কোন পেশায় আর যাওয়া হয়নি- বলা যায় চায়ের প্রেমে পড়ে গেলাম। দেখতে দেখতে নীরবে এ ইনস্টিটিউটে কেমনে কেটে গেল প্রায় তিনটি দশক!

চা গবেষণা ইনস্টিটিউটের গ্রন্থাগারে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন চা-বিজ্ঞানী ও লেখকের বিষয়ভিত্তিক মূল্যবান অসংখ্য গবেষণা-প্রকাশনাসংবলিত জার্নাল ও বই রয়েছে তাছাড়া বিশ্বের চা উৎপাদনকারী বিভিন্ন দেশ ভ্রমণকালে আমি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে বেশ কিছু দুষ্প্রাপ্য বই সংগ্রহ করেছিলাম যার প্রায় সবই ইংরেজিতে লেখা। তাই সুপ্ত বাসনা ছিল, চা-এর প্রাসঙ্গিক সংগ্রহগুলো হারিয়ে যাওয়ার আগে আমার মাতৃভাষা বাংলায় তার নির্যাসগুলো একটি পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করতে পারলে ওরা বেঁচে যাবে এবং চা-গবেষণাসংশ্লিষ্ট তথা চা শিল্পে কর্মরত সুধিজন, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ ও শিক্ষকবৃন্দ ছাড়াও চা-অনুসন্ধিৎসু সাধারণ পাঠকের কৌতূহল মেটাতে সক্ষম হবে। মূলত সে উদ্দেশ্যেই এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

লিখতে গিয়ে যেসব বিষয়ে খটকায় পড়তে হয়েছে তা হল বৈজ্ঞানিক শব্দ এবং বহুল ব্যবহৃত ইংরেজি শব্দের বাংলা পরিভাষা চয়ন, কেননা অনেক শব্দের সঠিক বাংলা পাওয়া নিতান্তই দুষ্কর, তাছাড়া বাংলা শব্দটি মূল শব্দের শাব্দিক অর্থ বা ব্যঞ্জনা যথাযথ ফুটিয়ে তুলছে কিনা, সে বিষয়েও যথেষ্ট সচেতন থাকতে চেষ্টা করেছি। স্বীয় ধারণাতেই বেশ কিছু শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করেছি যা পাঠকভেদে নতুন মনে হতে পারে। তবে ঢালাওভাবে ইংরেজি শব্দের হুবহু বাংলাকরণ সমীচীন মনে হয়নি- তাতে অর্থ-বিচ্ছেদ হবে ভেবে বাংলা বানানে ইংরেজি শব্দই রাখতে হয়েছে। ভাষা নদীর মতো বহমান, এর চলার পথে সংযোজন, বিয়োজন, ভিন্ন ভাষার শব্দভাণ্ডার থেকে আত্মীকরণ প্রয়োজন, যা

ভাষাকে সমৃদ্ধ করে। সুতরাং চাসংশ্লিষ্ট কিছু বিদেশি শব্দকে বাংলা ভাষায় আত্মীকরণ করা দূষণীয় বলে মনে হয়নি।

এ বইখানি বাংলা ভাষায় চা এর উপর রচিত একটি পূর্ণাঙ্গ বই মনে করার যথার্থ কারণ নেই। চা একটি বিশাল কৃষিজ-শিল্প পণ্য: উদ্যানতত্ত্ব থেকে শুরু করে নন্দনতত্ত্ব, কোন কিছুই একে না ছুঁয়ে যায়নি : চা একটি ঘনিষ্ট বাস্তুতন্ত্র, একটি বিশাল জনগোষ্ঠীর জীবিকার নিমিত্তও বটে। চা একটি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, এর যেমন রয়েছে নিজস্ব একটি বিজ্ঞান, ভাষা ও সংস্কৃতি, তেমনি কিছুটা রাজনীতিও জড়িয়ে আছে সবুজঘন চায়ের রাজ্যে। এতবড় একটি কৃষিজ শিল্পকথা একটি মাত্র বইয়ে আবদ্ধ করা রীতিমত অসম্ভব ও অবাস্তব। এ বইটি পাঠে চা সম্পর্কে সামান্য তথ্যঝলক পাওয়া যাবে মাত্র- তত গভীরে প্রবেশ হয়তো হবে না। অগ্রবর্তী পাঠককে আরও পড়তে হবে

এখানে চায়ের ইতিকথার পাশাপাশি চা-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিয়ে কয়েকটি অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। বর্তমান ও আগামী পাঠককুল যদি এ থেকে কিছুটা নির্যাস আহরণে উৎসাহিত হয়ে বাংলায় চায়ের উপর আরও বই লিখতে উদ্দীপিত হন, তাহলে আমার এ শ্রম অধিকতর সার্থক হবে।

ইনস্টিটিউট পরিচালনার গুরুদায়িত্ব, গবেষণাকাজের সার্বিক তদারকি, প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, জরুরি সভা-সেমিনারে অংশগ্রহণের নৈমিত্তিক বাধ্যবাধকতা, ব্যস্ত ভ্রমণসূচির আধিক্য ও আধিপত্য এবং পারিবারিক কাজে যৎসামান্য সময় দেয়ার পর এ দুরূহ কাজটি দ্রুত সমাপনের সদিচ্ছা থাকলেও সময় লেগে গেল অনেক।

বইটির পাণ্ডুলিপিখানি সযত্নে বার বার দেখে পরামর্শ দিয়ে ও পরিশুদ্ধ করে বর্তমান আকারে উপস্থাপনে সক্রিয় সহায়তা দিয়ে যিনি কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন, তিনি হচ্ছেন শ্রদ্ধেয় প্রবীণ চা বিজ্ঞানী, বিটি২ ক্লোন চায়ের অন্যতম আবিষ্কারক ও সফল 'টি ব্রিডার' জনাব এ এফ এম বদরুল আলম, দীর্ঘতম সময়কালীন প্রাক্তন পরিচালক, বিটিআরআই- আমার ক্ষুদ্র বিজ্ঞানচর্চা ও চা গবেষণায় যাঁকে আমি মেন্টর হিসেবে দেখি।

আরও যাঁরা এ কাজে সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে যাঁর কথা স্বীকার করতে হয় তিনি জনাব মো. সাইফুল ইসলাম, ঊর্ধ্বতন শিক্ষক, বিটিআরআই উচ্চ বিদ্যালয়। বিটিআরআই এর যাঁরা সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন- সর্বজনাব শামীম আল মামুন, মিহির লাল সরকার, শেফালী বুনার্জী, সাইফুল ইসলাম।

সমগ্র বইটির ধৈর্যসাপেক্ষ কম্পোজের দীর্ঘ কষ্টটি যিনি সানন্দে করেছেন তিনি জনাব মুকুন্দ চন্দ্র রায়। কম্পোজিঙ্গে আরও পার্শ্ব-সহায়তা করেছেন জনাব ইয়াছিন আরাফাত। আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন অনেকেই যাঁদের নাম পরিসর ক্ষুদ্র হওয়ায় উল্লেখ করা সম্ভব হলো না। এঁদের সকলের প্রতিই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা থাকল।

নেপথ্যে যিনি এ বইটি প্রকাশে আমায় সদা অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন তিনি আমার সহধর্মিনী মোসাম্মাৎ শাহানা বিউটি। তাঁর ত্যাগ ও উৎসাহ না থাকলে হয়তো বইটি প্রকাশ করাই সম্ভব হতো না। আমার পুত্র লেফটেন্যান্ট রিফাতউদ্দীন আহমেদ লিওন, কন্যা নিশাত তাসনিম আহমেদ শাওলীন সর্বদাই তাগিদ দিয়েছে বইটি দ্রুত প্রকাশের জন্য। আমার ত্যাগী মা যিনি আজীবন আমার অগ্রগতি ও কৃতকার্যতার জন্য অবিরত দোয়া করেছেন, মহান সৃষ্টিকর্তার পরে তিনিই আমার পরিবারের সকলের শক্তির উৎস ও আধার। এ বই প্রকাশকালে মা- তোমাকে আবারও বিনম্র চিরকৃতজ্ঞতা ও চিরশ্রদ্ধা।

আন্তরিকতা ও সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বইটিতে ভাষাগত, বানানগত, শব্দচয়নগত, তত্ত্ব ও তথ্যগত ভুলত্রুটি থাকা বিচিত্র নয় যা পাঠককূলের নিগূঢ় দৃষ্টিতে হয়ত ধরা পড়বে। তাই পাঠকের নিকট এ সীমাবদ্ধতাটুকু স্বীকার করে নিচ্ছি অকুণ্ঠচিত্তে, আর সে সাথে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি কামনা করছি।

ড. মাইনউদ্দীন আহমেদ

সূচিপত্র

অধ্যায়	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	চা পরিচিতি (Introduction to tea)	১৩-৩৯
দ্বিতীয়	চায়ের উদ্ভিদ পরিচিতি (Tea botany)	৪০-৪৬
তৃতীয়	চা গবেষণার সূচনা (Beginning of researches on tea)	৪৭-৬০
চতুর্থ	বাংলাদেশে চায়ের সূচনা (Introduction of Bangladesh tea)	৬১-৬৯
পঞ্চম	বাংলাদেশে চা উৎপাদনকারী দেশি ও বিদেশি কোম্পানিসমূহ (Domestic and foreign entrepreneurs in producing tea in Bangladesh)	৭০-৭৭
ষষ্ঠ	চায়ের জাত উন্নয়ন (Varietal development of tea)	৭৮-৯৮
সপ্তম	উদ্ভিদ জীবপ্রযুক্তি (Plant biotechnology and tea)	৯৯-১১০
অষ্টম	চা এবং মানবস্বাস্থ্য (Tea and human health)	১১১-১২২
নবম	চা গাছের পুষ্টি, মৃত্তিকার উর্বরতা এবং সার ব্যবস্থাপনা (Nutrition soil fertility and fertilizer management of tea)	১২৩-১৪৭
দশম	চায়ের ক্ষতিকারক পোকমাকড় ও এদের প্রতিকার (Harmful insects and mites of tea and their control)	১৪৮-১৭২
একাদশ	কীটনাশক ও তৈরি চায়ে কীটনাশকের রেসিডিউ (Pesticides and their residues in finished tea)	১৭৩-১৮২
দ্বাদশ	চা গাছের রোগবালাই ও দমন পদ্ধতি (Tea diseases and their control measures)	১৮৩-১৯২
ত্রয়োদশ	চা উৎপাদনে ছায়াতরুর ভূমিকা (Role of Shade trees in tea production)	১৯৩-২০৫
চতুর্দশ	ছাঁটাই এর উপযুক্ত সময় এবং ছাঁটাই পূর্ববর্তী বিবেচ্য বিষয় (Ideal time and methods of tea pruning and its preconditions)	২০৬-২১৭
পঞ্চদশ	সেচ ও পানি নিষ্কাশন (Irrigation and drainage of tea)	২১৮-২২৫
ষষ্ঠদশ	সিটিসি চা তৈরি প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক (Aspects of CTC processing of tea)	২২৬-২৩০
সপ্তদশ	চা তৈরিতে সিটিসি রোলিং-এর কার্যকারিতা (Effectiveness of rolling in CTC processing of tea)	২৩১-২৪৮
অষ্টাদশ	বাংলাদেশ চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধির উপায় ও কৌশল (Methods and strategies for enhancing production of tea)	২৪৯-২৬৫
ঊনবিংশ	বিবিধ	২৬৬-২৭২

প্রথম অধ্যায়

চা পরিচিতি
(Introduction to Tea)

চা শব্দের উৎপত্তি

চীনের একটি উপজাতীয় ভাষা অময় (Amoy)। এই অময় ভাষার শব্দ 'তে' (te) থেকে পরবর্তীতে ক্যান্টনিজ ভাষায় চা (Cha) শব্দটির উৎপত্তি ঘটেছে বলে জানা যায়। চা শব্দটি পারস্য, পর্তুগীজ, জাপান, রাশিয়াসহ বিভিন্ন দেশের ভাষায় সাদরে গৃহীত হয়েছে। তবে 'তে' (te) নামটি থেকে আরেকটি অপভ্রংশ 'Tea' ইংরেজি ভাষা-প্রভাবিত বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ইংরেজরা এ উপমহাদেশে উপনিবেশ স্থাপন করার পূর্বেই ফারসি ভাষার অন্যান্য অনেক শব্দের সাথে 'চা' শব্দটি বাংলা ভাষায় স্থান করে নেয়। এ থেকে বুঝা যায় যে, 'চা' শব্দটি সরাসরি চীন থেকে এ উপমহাদেশে আসেনি, এসেছে ফারসি ভাষা থেকে।

চায়ের প্রচলন

চা সম্পর্কে সবচেয়ে প্রাচীন যে ধারণাটি পাওয়া যায়, তা হচ্ছে এরকম – ২৭৩৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে চীনের তৎকালীন সম্রাট শেন নং (Shen Nung) এর কাছে ঘটনাচক্রে ধরা পড়ে যে, চা পাতার নির্যাস একটি আশ্চর্যজনক উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী পানীয়। তিনি চায়ের বিভিন্ন ভেষজ গুণাবলী সম্পর্কে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালান এবং "The Herbal Canon of Shen Nung" নামক বইয়ে উল্লেখ করেন যে, চায়ের নির্যাসে ৭২ প্রকার বিভিন্ন বিষকে নির্বিষ করার ক্ষমতা আছে। তাছাড়া আরও যেসব তথ্য পাওয়া যায় তা থেকে জানা যায় যে, ১০৬৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে দক্ষিণ-পশ্চিম চীনে চা একটি দামি পণ্যে পরিণত হয় এবং চীনারা তখন উপঢৌকন হিসেবে রাজদরবারে চা নিয়ে যেত। সে সময় চাকে শুধুমাত্র পানীয় নয়, বরং সমান গুরুত্ব সহকারে ভেষজ হিসেবেও ব্যবহার করা হত। সাম্প্রতিককালে চীনের ইউনান প্রদেশে

প্রত্নতাত্ত্বিক খননের মাধ্যমে প্রমাণ পাওয়া গেছে, শেষকৃত্য অনুষ্ঠানেও চা ছিল একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। এমনকি কবরের ভিতরেও চায়ের ডাল ও পাতা দিয়ে দেয়া হত (Modder & Amarakoon. 2002)।

প্রথমদিকে চা-কে দক্ষিণ-পশ্চিম চীনের ইউনান প্রদেশের বাইরে বিস্তার লাভের সুযোগ দেয়া হয়নি। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত এ অবস্থা চলতে থাকে। পরবর্তী সময়ে ইউনান থেকে চীনের অন্যান্য প্রদেশেও চা গাছ ছড়িয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৬১ সালে ইউনান প্রদেশের মেংহই জেলায় বন্য অবস্থায় ১৭০০ বছরের প্রাচীন একটি চা গাছের সন্ধান পাওয়া যায়। তখন এর উচ্চতা ছিল ২১.১মি. এবং বেড় ছিল ১.০৩ মি.। এখনও গাছটি উৎপাদনশীল এবং মানসম্মত চা পাতা পাওয়া যায়।

বৌদ্ধধর্মের বিস্তৃতির সাথে সাথে চা-পানের অভ্যাসও ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এছাড়া চা এর বিস্তৃতিলাভের আরেকটি কারণ ছিল, সেসময় রাজদরবারের (Imperial Court) আদেশ। সে আদেশে মদ্যপানের স্থলে চা-পানের নির্দেশনা দেয়া হয়। ২২১ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চায়ের আবাদ ছড়িয়ে পড়ার বিষয়টি জানা যায়। এসময় চীনের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী ভিয়েতনাম, বার্মা, লাওস এবং থাইল্যান্ডে অভিবাসিত হতে থাকে এবং একই কারণে চা এর বিস্তার ঘটতে থাকে। সংখ্যালঘুদের দেশত্যাগের কারণ ছিল তখনকার সময়ে একটি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা–যুদ্ধ। বহু শতাব্দী পূর্বে এসব দেশত্যাগের ঘটনা ঘটলেও চা তৈরির পদ্ধতি এখনও সেই প্রাচীন চীনের মতই রয়ে গেছে।

১৩৯৮ সালের একটি প্রতিবেদনে দেখা যায় ১৩,৫৮৪টি ঘোড়ার বিনিময় মূল্য ছিল ২,৫০,০০০ কেজি চা পাতা। এ বিনিময় চীনের নিজ ভূমিতেই ঘটেছিল। ঐ সময় চা ছিল চীনদের জীবনধারনের একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। প্রচলিত আছে চীনা জনগণ তিনদিন না খেয়ে থাকতে পারত কিন্তু চা বাদ দিয়ে তাদের একদিনও চলত না।

পঞ্চম শতাব্দীতে চীন, ইস্তাম্বুল, রোম, আরব, ইরান, ভারত, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, কোরিয়া এবং জাপানের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে সাথে চা-পানের রীতিও বিশাল এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। চীনের সাথে সাগর পথে বাণিজ্যের সুবিধা সম্প্রসারিত হয় এবং সপ্তম শতাব্দীতে প্রথম চীনের সাথে জাপান ও কোরিয়ায় চা উৎসবের প্রচলন ঘটে। এর কিছুদিন পরে চায়ের বীজ এবং চাষ-প্রণালি জাপান ও কোরিয়াতে স্থানান্তরিত হয়। তবে তারও বহুদিন পর বাণিজ্যিকভাবে প্রথম চা বিক্রয় শুরু হয়। ১৬৭৫ খ্রি. থমাস গ্যারাওয়ে (Thomas Garraway) প্রথমবারের মত তার লন্ডন কফিহাউজে চা বিক্রি শুরু করেন। তিনি তার গ্রাহকদের চা-পানে

আকৃষ্ট করার জন্য সর্বপ্রথম যে বিশাল বিজ্ঞাপন তৈরি করেছিলেন তা নিম্নে উল্লেখ করা হল –

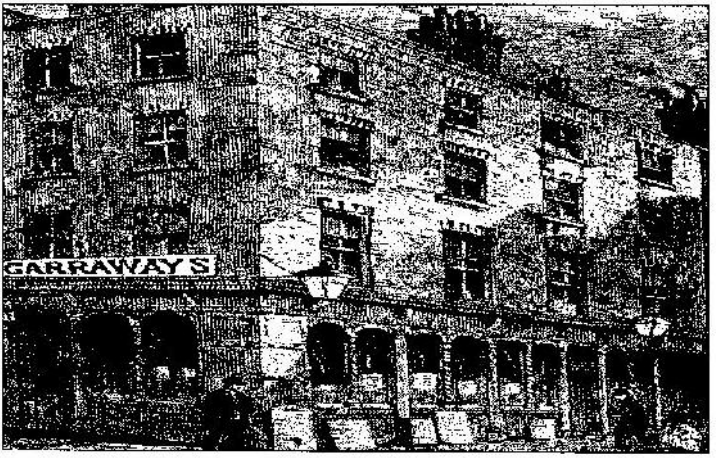

Garraway's Coffee House in Change Alley, England, 1657

"It maketh the Body active and lusty
It helpeth the Head-ach,
giddiness and heaviness thereof.
It removeth the Obstructions of the Spleen.
It is very good against the Stone and Gravel,
cleansing the Kidneys and Writers being
drank with Virgins Honey instead of Sugar.
It taketh away the difficulty of breathing,
opening Obstructions.
It is good against Lipitude Distillations,
and cleareth the Sight.
It removeth Lassitude, and cleanseth and purifieth
adult Humors and a hot Liver.
It is good against Crudities,
strengthening the weakness of the
Ventricle or Stomack,
causing good Appetite and Digestion,
and particularly for Men of a corpulent
Body, and such as are great eaters of Flesh.
It vanquisheth heavy Dreams, easeth the Brain,
and strengtheth the Memory ...."

পৃথিবীতে পানীয় হিসেবে পানির পরেই বর্তমানে চায়ের স্থান। শেন নাং এবং থমাস গ্যারাওয়ে বহুপূর্বেই চায়ের ভেষজ গুণাবলি সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা দেন। অধিকাংশ মানুষ চা-পান করে একটি সামাজিক পানীয় হিসেবে যার রয়েছে সুরম্য সুগন্ধ ও উদ্দীপক বৈশিষ্ট্য। বর্তমানে আধুনিক প্রাণ-রাসায়নিক গবেষণাতেও প্রমাণিত হয়েছে যে, চা শুধুমাত্র একটি পানীয় নয়, এর মাঝে রয়েছে বিশাল ক্ষমতা যা বহুবিধ রোগব্যাধি প্রতিরোধের মাধ্যমে দীর্ঘ জীবনদানে সক্ষম।

চায়ের উৎপত্তিগত ঐতিহাসিক ধারাবাহিক বিবরণ
(আবিষ্কার থেকে একবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত)

২৭৩৭ খ্রিস্টপূর্ব	-	সম্রাট শেন নাং কর্তৃক চা আবিষ্কার
৬০০ খ্রিস্টাব্দ	-	জাপানে চায়ের চাষ শুরু
৭৮০ খ্রিস্টাব্দ	-	লুউ কর্তৃক চা শব্দটি বইতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়
১৩৬৮-১৬৪৪ খ্রিস্টাব্দ	-	মিং ডাইন্যাস্টির আওতায় গতানুগতিক পদ্ধতিতে সবুজ, কালো ও উলং চা প্রস্তুত হয়
১৭০০ শতাব্দীর গোড়ায় দিকে	-	নিউ আমস্টার্ডম এ চায়ের বাণিজ্যিক গোড়াপত্তন
১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দ	-	ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক বাজারজাত করা
১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দ	-	বোস্টন টি পার্টি কর্তৃক আমেরিকার ঔপনিবেশিক বিদ্রোহের সূত্রপাত
১৮১০ খ্রিস্টাব্দ	-	তাইওয়ানে প্রথম চা গাছ রোপণ
১৮২৩ খ্রিস্টাব্দ	-	ভারতবর্ষে চায়ের আবির্ভাব ও উত্তরপূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদের পাশে আসাম জাতের চা গাছের সন্ধান লাভ
১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দ	-	লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক কর্তৃক 'টি কমিটি' গঠন
১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দ	-	সর্বপ্রথম ১২ বাক্স আসাম চা ইংল্যান্ডে রফতানি
১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দ	-	সর্বপ্রথম ৮ বাক্স আসাম চা কোলকাতা নিলামে তোলা
১৮৪০ খ্রিস্টাব্দ	-	বাংলাদেশের চট্টগ্রামের ভালি ক্লাব ও কোদলায় সর্বপ্রথম পরীক্ষামূলক চা চাষ শুরু
১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দ	-	সিলেটের মালনীছড়ায় বাণিজ্যিকভাবে চায়ের চাষ শুরু
১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ	-	হবিগঞ্জের লালচাঁদ ও মৌলভীবাজারের মিরতিংগা চা বাগানে বাণিজ্যিকভাবে চায়ের চাষ শুরু
১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দ	-	দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি ও কেরালায় চা চাষ সম্প্রসারিত করা

১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দ	-	ফরমোজায় (তাইওয়ান) উলং চা সর্বপ্রথম রফতানি
১৮৮১ খ্রিস্টাব্দ	-	ইন্ডিয়ান টি এসোসিয়েশন গঠন
১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দ	-	ব্রিটেনে ভারতের চা রফতানি
১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দ	-	UPASI (United Planters' Association of South India) গঠন
১৯০৮ খ্রিস্টাব্দ	-	আমেরিকাতে 'টি ব্যাগ' উদ্ভাবন হয়
১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ	-	উত্তর পূর্ব ভারতের আসামে বাংলাদেশের সিলেটের লাটিটিলা সীমান্তের অপর পারে পাত্রি চা বাগানের ব্যবস্থাপক এইচ ক্লার্ক কর্তৃক চায়ের অঙ্গজ প্রজননের নমুনা সংগ্রহ এবং মি. টানস্টেল কর্তৃক ভিপি কাটিং পদ্ধতির নিশ্চিত উদ্ভাবন
১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ	–	শ্রীমঙ্গলে বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা [তৎকালীন পাকিস্তান টি রিসার্চ স্টেশন (পিটিআরএস)]

চায়ের বিস্তৃতি

যে যাদুকরি বৃক্ষটি তার কচিপাতার নির্যাসজাত পানীয় দ্বারা সমস্ত পৃথিবীকে মোহাবিষ্ট করে রেখেছে যুগের পর যুগ ধরে, তার প্রথম আবির্ভাব ঠিক কোথায় হয়েছিল, সে সম্পর্কে শতভাগ নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে ধারণা করা হয় চীনদেশের উত্তরে কোথাও, সম্ভবত মধ্য মঙ্গোলীয়ায় চা গাছের আদি নিবাস। সেখান থেকে দক্ষিণে মধ্যচীন পর্যন্ত তা বিস্তার লাভ করে। প্রায় ৩৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দেও চীনদেশে চায়ের ব্যবহার সম্পর্কে জানা যায়। তখন মূলত একটি ঔষধী পানীয় হিসাবেই চা পান করা হত। পরবর্তীতে তা একটি সাধারণ উদ্দীপক পানীয় হিসাবে পরিগণিত হয়। জানা যায়, ৬০০ খ্রিস্টাব্দে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণের দ্বারা জাপানে চা এর বিস্তার ঘটে। এর ব্যবহার বহু বছর যাবত এ দুদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল। পাশ্চাত্যে চা এর প্রচলন ঘটে আরও বহু পরে, ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে।

ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশও চীনে চয়ের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা দেখে চা চাষের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। তারা চায়না ভ্যারাইটির চা-চাষের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে, কিন্তু এতে সাফল্য ছিল খুবই সীমিত। কিন্তু উত্তর পূর্ব ভারত এবং উত্তর বার্মার লোকজন চায়ের আরেকটি প্রকরণ 'আসামিকা' (*assamica*) সম্পর্কে পূর্বকাল থেকেই জানত। মাত্র অষ্টাদশ শতাব্দীতে বহির্বিশ্ব এটি সম্পর্কে জানতে পারে এবং পরবর্তীতে এশিয়ার বাইরের অন্যান্য মহাদেশেও সাফল্যজনকভাবে এটির চাষাবাদ শুরু হয়। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অধিবাসীরা ক্যামবয়েড (Cambod) নামক আরেকটি জাত সম্পর্কেও বহুকাল পূর্বেই জানত এবং উনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে তা বহির্বিশ্বে পরিচিতি লাভ করে।

চায়ের জগতে একজন প্রথিতযশা গবেষক হচ্ছেন Cohen Stuart (1920)। ইন্দোনেশীয়ার জাভায় চা চাষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও চা সম্বন্ধে প্রগাঢ় জ্ঞান থেকেই তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, চায়ের উৎপত্তি সম্পর্কে জানতে হলে দক্ষিণ চীন, তিব্বত ও ভারতের সীমান্তঘেষা ভারত-চীন উপত্যকায় যেতে হবে

তিনি ছাড়াও ইন্দো-চীন সীমান্ত বরাবর উজানে, উত্তর বার্মায়, দক্ষিণ তিব্বতে এবং উত্তর-পূর্ব আসামের পাহাড়ি অঞ্চলে প্রকৃত প্রাকৃতিক চায়ের (wild tea) সন্ধানে কয়েক দশকব্যাপী অনেকগুলো অভিযান চালান ক্যাপ্টেন Kingdon-Ward। তাঁর অভিযানলব্ধ অভিজ্ঞতা এবং অন্যান্য তথ্যপ্রমাণের আলোকে এ সম্পর্কে তিনি যে বর্ণনা দেন (১৯৫০), তাতে বিভিন্ন প্রকার চায়ের উৎপত্তি এবং বিস্তারের দুটি কেন্দ্রের কথা তিনি উল্লেখ করেন তাঁর মতে চা গাছ মঙ্গোলীয় প্লেটের কোনস্থানে প্রাথমিকভাবে উৎপন্ন হয় (Primary origin) এবং প্রায় ৬০° উত্তর অক্ষাংশ বরাবর বা তার চাইতেও উত্তরে সে স্থানটি অবস্থিত পরে হিমবাহের কারণে দুটি অক্ষ বরাবর তা বিস্তার লাভ করে। তার মধ্যে একটি অক্ষ বরাবর *assamica* এবং *cambodiensis* নামক প্রজাতি দুটি বিস্তার লাভ করে এবং ভারত, বর্মা, চীন ও তিব্বতের মিলিত সীমান্তের কাছাকাছি কোন স্থানে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ দ্বিতীয় কেন্দ্র থেকে পুনরায় তা ছড়িয়ে পড়ে তিনটি দিকে। ভূতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে ধারণা পাওয়া যায়, এ তিনটি দিক হল তিনটি নদীর উৎস থেকে গতিপথ বরাবর। নদী তিনটি হচ্ছে– ইয়াংসি, মেকং এবং ব্রহ্মপুত্র। উল্লেখিত তিনটি নদী অববাহিকায় যে তিনটি জাতের (Variety) ভ্যারাইটির দেখা পাওয়া যায়, তাদের কোন নির্দিষ্ট পূর্বপুরুষ সম্পর্কে তথ্য প্রমাণ না পাওয়াতে Kingdon-Ward (1950) মত প্রকাশ করেন যে, এ ভ্যারাইটিগুলো যে বংশধরা (Prototype) থেকে উদ্ভূত হয়েছে, সেটি বর্তমান চা-গাছ থেকে ভিন্ন ছিল।

বরুয়া (১৯৮৯) উল্লেখ করেন যে, চায়ের উৎপত্তি সম্পর্কে তথ্যপ্রমাণের অনুপস্থিতির কারণে Kingdon-Ward প্রদত্ত ব্যাখ্যাই অধিক গ্রহণযোগ্যতার দাবী রাখে তবে বর্তমানে শারীরবৃত্তীয়, অন্তঃঅঙ্গসংস্থানিক এবং জীনতাত্ত্বিক তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে চায়ের উৎপত্তিস্থল সম্পর্কে পুনর্বিবেচনার সুযোগ রয়েছে।

মঙ্গোলীয়ার কেন্দ্রস্থলে চায়ের উৎপত্তি হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব যদি কিছু জীবাশ্ম পাওয়া যায়। প্রায় ৩৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে চীনদেশে চায়ের ব্যবহার সম্পর্কে জানা যায়। তাছাড়া Vavilov এর বর্ণনা অনুযায়ী চীনদেশের কোন একটি স্থানে চা এর উৎপত্তি ঘটেছে (Centre of origin) এবং চীনের সুদীর্ঘ নদী পথে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় এর বিস্তার ঘটেছে (Centre of diversity)। তাছাড়া যদি চায়না ভ্যারাইটি উত্তর দিকে কোন স্থানে উৎপত্তি লাভ করেও, তথাপি '*assamica*' এবং '*cambodiensis*' প্রজাতি দুটি দ্বিতীয় কেন্দ্র থেকে প্রথম কেন্দ্রের রুক্ষ

জলবায়ুতে জন্মানো সম্ভব নয়। অন্যথায় এসকল কোমল জাতগুলো চীনের সর্বত্রই চাষাবাদ করা হত। মূলত চীনদেশে উৎপন্ন এ দুটি জাতের চা জাপান, তাইওয়ান, ইন্দোনেশিয়া এবং ভারতের কোথাও উপস্থিতির কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

চীনের ইউনান (Yunnan) প্রদেশের দক্ষিণাঞ্চলে চায়না জাতের চা এর বিস্তৃতির সাথে সাথে এর সাথে নিকট সম্পর্কযুক্ত (near relatives) প্রজাতিসমূহের সংকরায়ন ঘটে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। অথবা '*assamica*' জাতের বিস্তৃতির মাধ্যমে উদ্ভূতগণের (Genera) সাথে চায়না জাতের সংকরায়ন হতে পারে। যা পরবর্তীতে দক্ষিণে বার্মা (মায়ানমার) এবং উত্তরপূর্বে ভারতের দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

আসাম, চায়না ও ক্যাম্বোড জাত চায়ের বিস্তৃতি

প্রাচীনকালে বানর দিয়ে চা গাছের কাঁচা পাতা সংগ্রহ করা হতো

অভিবাসী জনগোষ্ঠির মাধ্যমে এ বিস্তরণ ঘটা সম্ভব। ইতিহাস Kingdon-Ward এর এ মতকে সমর্থন করে যে, এ এলাকায় কোন প্রাকৃতিক চা ছিল না। দক্ষিণ-পূর্বদিকে ছড়িয়ে পড়া '*cambodiensis*' ভারাইটির চা-ও একইভাবে সংকরায়নের মাধ্যমে উৎপত্তি লাভ করার সম্ভাবনা রয়েছে।

assamica গোষ্ঠীতে *cambodiensis* জেনোমের (genome) চা এর থাকার কোন প্রমাণ নেই। এটিকে উত্তর-পূর্ব ভারতে মাত্র উনিশ শতকের শুরুতে চাষাবাদ করা হয়।

ভারতীয় উপমহাদেশে চায়ের উৎপত্তি এবং সি. এ. ব্রুস এর অবদান ভারতীয় উপমহাদেশে চা-চাষের ইতিহাসে যার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে তিনি হলেন মি. চার্লস আলেকজান্ডার ব্রুস, সংক্ষেপে সি. এ. ব্রুস তাঁর নিকট ভারতের চা-শিল্প অনেকটাই ঋণী তিনি কোন বিজ্ঞানী ছিলেন না, কিন্তু তিনি ছিলেন ভারতীয় চা-শিল্পের প্রথম সুপারিনটেনডেন্ট। উদ্ভিদবিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর কোন জ্ঞান ছিল না। উদ্যানতত্ত্ব সম্পর্কেও তিনি ছিলেন অজ্ঞ। কিন্তু তিনি জানতেন কী করে একটি জঙ্গলকে আবাদ করতে হয়, কী করে তার বুক থেকে গোপন সম্পদ আহরণ করতে হয়। তিনি ছিলেন একজন অসীম ধৈর্যশীল পরিব্রাজকের মতো। যে কারণে মি. ব্রুস আসামে দিনের পর দিন থেকেছেন। এখানকার জলবায়ু এবং স্থানীয় জনসাধারণের চরিত্র সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য তাঁর ছিল সুস্বাস্থ্য এবং অগাধ জীবনীশক্তি। তিনি ছিলেন ক্ষুরধার চিন্তাশক্তি ও কর্মকৌশলের অধিকারী।

জঙ্গলের ভিতরে শতশত মাইল জুড়ে দিনের পর দিন মি. ব্রুসের অনুসন্ধানী পদচারণা প্রথম স্থানীয় গোত্র প্রধানগণ সুনজরে দেখেননি। কিন্তু তিনি তাঁর ব্যবহারগুণে শুধু তাঁদের মন জয় করেননি, সহযোগিতাও আদায় করে নিয়েছেন। ড. ম্যান তাঁকে একজন পরম প্রশংসনীয় অগ্রণী ব্যক্তি হিসেবে অভিহিত করেন এবং উল্লেখ করেন যে, মি. ব্রুসই প্রথম চা-গাছের প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা দেন। বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা দূর করে চা চাষের পথ সুগম করেন এবং পানযোগ্য চায়ের প্রথম উৎপাদকও তিনি।

আসামের পার্বত্য অঞ্চলে ১৮২৩ সালে সি. এ. ব্রুস প্রথম প্রাকৃতিক চায়ের (wild tea) সাক্ষাৎ পান। কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চীনের সাথে তাদের একচেটিয়া চা বাণিজ্যের ক্ষতির আশঙ্কায় এ যুগান্তকারী আবিষ্কারটিকে গোপন রাখে। তবে এ অবস্থা অবশ্য বেশি দিন ছিল না, কারণ স্যার মোশেফ ব্যাংক আসাম চায়ের বিভিন্ন ইতিবাচক দিক তুলে ধরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে একটি বিশাল প্রতিবেদন দাখিল করেন যাতে এর পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়। কিন্তু ব্যক্তি মি. ব্রুস থেমে থাকেননি। তিনি আসাম চায়ের প্রাকৃতিক কলোনিগুলো আবিষ্কার করেন, জঙ্গল পরিষ্কার করে গাছগুলোকে পরিচর্যা করার ব্যবস্থা করেন এবং পাতাচয়ন উপযোগী ঝোঁপ (bush) তৈরি করেন।

সি. এ. ব্রুস সিদ্ধিয়াতে একটি চা বাগানের গোড়াপত্তন করেন। এরকম একটি সময়ে ভারতের তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেনটিংক ১৮৩৪

সালের ২৪ জানুয়ারি একটি টি কমিটি প্রতিষ্ঠা করেন। কমিটির কার্যপরিধির প্রধান দিক ছিল ভারতে বাণিজ্যিকভাবে চা চাষের সম্ভাব্যতা যাচাই করা কিন্তু এ কমিটির সদস্যবৃন্দ স্থানীয় আসাম চায়ের মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হন। টি কমিটির সচিব জি.জে.গর্ডন ১৮৩৬ সালে বীজ এবং চা গাছ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে চীন দেশে যান। কিন্তু চীন থেকে আমদানিকৃত চা গাছগুলোকে আসামে জন্মানো সম্ভব হল না এবং কুমায়ুন, গাড়ওয়াল ও কাংরা ভ্যালিতে তা সাফল্যজনকভাবে চাষাবাদ করা সম্ভব হল তাছাড়া দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি এবং ওয়াইন্নাদে (Wyannad) কিছু চা গাছ জন্মানো সম্ভব হয়।

এ প্রসঙ্গে স্থানীয় চা চাষাবাদে মি. সি. এ. ব্রুসের একক প্রচেষ্টার কথাটি ভুলে গেলে চলবে না। তিনি সিদ্দিয়াতে ১৮২৫ সালে একটি চা চাষ প্রকল্প শুরু করেন। ১৮৩৬ সালে তিনি সেখানে ভারতীয় চায়ের একটি নার্সারি স্থাপন করেন একই সাথে তিনি নতুন নতুন প্রাকৃতিক চায়ের অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে থাকেন। ১৮৩৭ সালে তিনি সিদ্ধিয়াতে নিকটবর্তী মাদ্যক অঞ্চলে বহু নতুন প্রাকৃতিক চায়ের সন্ধান পান যাদের অধিকাংশ ছিল নপা পাহাড়ে এবং বাকিগুলো ছিল ত্রিপপুম এবং গুরবু পাহাড়ে। তাঁর মতে ইরাবতী থেকে আসামের পূর্বে চীন পর্যন্ত প্রাকৃতিক চায়ের একটি ধারাবাহিক বিস্তার রয়েছে।

স্থানীয় ভূস্বামীরা আসাম রাজ্যে এসকল জঙ্গল পরিষ্কার করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন ইতোমধ্যে ভারত সরকারের বিজ্ঞানবিষয়ক কমিশন এ অঞ্চল পরিদর্শন করেন। তাদের পরিদর্শনকৃত জেলাগুলো ছিল কুজু, নিংগ্রু, নাদোবার, টিংগ্রি এবং গাব্রু পর্বত কুজু এবং নিংগ্রু ছিল সিংফো প্রদেশে, নাদোবার এবং টিংগ্রি ছিল মাদ্যক বা বাড়মারা প্রদেশে এবং গব্রু পর্বত ছিল রাজা বুরুনদার সিং-এর রাজ্যে।

বেন্টিংক এ কমিটিকে ভারতে চা চাষাবাদ এবং বাস্তবায়নের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করার দায়িত্ব দেন। সে মোতাবেক 'টি কমিটি' ১৮৩৪ সালের ৩ মার্চ একটি সার্কুলার জারি করে যাতে চা চাষাবাদের উপযোগী জলবায়ু, মৃত্তিকা, এবং ভূমিরূপের বর্ণনা দেয়া হয় এবং কোথায় এগুলো পাওয়া যেতে পারে সে ব্যাপারে সুপারিশ করা হয়।

টি কমিটির সচিব ছিলেন মি. জি.জে. গর্ডন তাঁকে চা চাষাবাদ এবং প্রস্তুতি সম্পর্কে জানার জন্য চায়নাতে পাঠানো হয়। চায়ের বীজ, চা গাছ এবং চা শ্রমিক সংগ্রহ করাও ছিল তাঁর দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ১৮৩৪ সালের জুন মাসে তিনি "Water ..." নামক জাহাজে চড়ে চীনের উদ্দেশে কোলকাতা ত্যাগ করেন। তাঁর সঙ্গী ছিলেন খ্রিস্টান মিশনারি রেভারেন্ড চার্লস গাটজলাফ। পথে তারা জলদস্যু দ্বারা আক্রান্ত হলেও অবশেষে চীনে পৌঁছাতে সমর্থ হন সেখানে তাঁরা একত্রে চা

অধ্যুষিত অ্যাংকয় পাহাড় পরিদর্শন করেন কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে সবুজ চা অধ্যুষিত জেলাগুলোতে যেতে ব্যর্থ হন, কেননা কোন ইউরোপীয়কে সেখানে যেতে অনুমতি দেয়া হত না। যাহোক, মি. গর্ডন বহিয়া (Bohea) চা বাগানের কিছু বীজ সংগ্রহ করতে সমর্থ হন এবং তা ১৮৩৫ সালে কোলকাতা এসে পৌঁছায়।

চা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সরকার ১৮৩৫ সালে একটি বিজ্ঞানবিষয়ক কমিশন গঠন করে। এ কমিশনের সদস্য ছিলেন ড. নথানিয়াল ওয়ালিচ এবং ড. উইলিয়াম গ্রিফিথ নামক দুজন বোটানিস্ট এবং ড. জন মাক ক্লিলান্ড নামক একজন ভূতত্ত্ববিদ। তাদেরকে ভারতের নিজস্ব চা এবং পরীক্ষামূলক চাষাবাদের জন্য সবচেয়ে উপযোগী স্থান সম্পর্কে সরকারকে বিস্তারিত পরামর্শ দেয়ার দায়িত্ব দেয় হয়। কিন্তু পরীক্ষামূলক চা চাষাবাদের সবচেয়ে উপযোগী স্থান সম্পর্কে একমত হতে কমিশন ব্যর্থ হন। তাছাড়া ভারতের নিজস্ব চা চাষাবাদের ব্যাপারেও তারা একমত হতে পারেননি। বরং ড. গ্রিফিথ চায়না চা চাষাবাদের পক্ষে মত প্রকাশ করে বলেন যে, প্রকৃতিক চায়ের চাষাবাদের চেয়ে শতাব্দীব্যাপী পরীক্ষিত চায়না চায়ের চাষাবাদ অধিক যুক্তিসঙ্গত।

অবশেষে সরকারিভাবে চায়না জাতের চা চাষাবাদের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৮৩৬ সালের এপ্রিল মাসে আসামে চা চাষাবাদে সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে নিয়োগ পান মি.সি.এ. ব্রুস। পূর্বেই তা উল্লেখ করা হয়েছে। এ সময় চায়না থেকে আমদানিকৃত ২০,০০০ (বিশহাজার) চা গাছ তার কাছে চাষাবাদের জন্য পাঠানো হয়। চা কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী জীবিত গাছগুলোকে সিব্বিয়ার নিকটবর্তী 'সাইখওয়া' নামক স্থানে নার্সারিতে রোপণ করা হয়। মাত্র ৮০০ (আটশত) গাছ বেঁচে যায় এবং ড. গ্রিফিথের তথ্য অনুযায়ী বাগানে লাগানোর পরে আরও বহু গাছ মারা যায়। মি. ব্রুস উল্লেখ করেন যে, মাদক জেলার চুব্বার নিকটবর্তী 'দিনজয়' নামক স্থানে ১৬০০টি (একহাজার ছয়শত) চায়না চা গাছ লাগানো হয় এবং ১৮৩৯ সাল থেকে গাছগুলো উৎপাদনশীল হয়।

মি. গর্ডন চীন থেকে যে সকল শ্রমিক নিয়ে আসেন তাদেরকে সাথে সাথে মি. ব্রুসের নিকট পাঠানো হয়। তিনি তাদের সাহায্যে কিছু চা তৈরি করেন এবং ১৮৩৬ সালের প্রথমদিকে কোলকাতায় পাঠিয়ে দেন। এ চা মোরক জেলার স্থানীয় জাতের চা গাছের কচিপাতা থেকে তৈরি করা হয়েছিল। একই বছর দ্বিতীয়বার তিনি স্থানীয় চায়ের পাঁচটি বাক্স কোলকাতায় প্রেরণ করেন। কোলকাতায় এ চা ভাল চা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এর দু বছরের মধ্যে ১৮৩৮ সালে ব্রুস দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় বেঙ্গল টি এসোসিয়েশনের মাধ্যমে ভারতের সম্পূর্ণ নিজস্ব আসাম চায়ের প্রথম চালানটি সমুদ্রগামী জাহাজ 'ক্যালকাটয়া' করে লন্ডন পাঠাতে

ভারতের অরুণাচল, মেঘালয়, নগাল্যান্ড, মিজোরাম, সিকিম, উড়িষ্যা ও ত্রিপুরা রাজ্যে চা চাষ করা হয়।

সুরমা ভ্যালি চা

ভারতীয় উপমহাদেশে চা উৎপাদনে আসাম হচ্ছে শীর্ষস্থানীয় একটি প্রদেশ এর কারণ হচ্ছে এলাকাটি উষ্ণ এবং আর্দ্র, তাছাড়া খরাপ্রবণ নয়। বৃষ্টিপাতও চা চাষের জন্য অত্যন্ত অনুকূল। এ অঞ্চলের চেরাপুঞ্জিতে গড়ে ৩৮১ইঞ্চি বার্ষিক বৃষ্টিপাত হয়, যা পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চস্থানীয়। আসামকে মোটামুটি দুটি প্রধান ডিভিশনে ভাগ করা হয়েছিল: একটি হল ব্রহ্মপুত্র ভ্যালি এবং অপরটি সুরমা ভ্যালি। চা উৎপাদনকারী জেলা হিসেবেও প্রথমেই আসামের নাম আসে, পরবর্তীস্থান অধিকার করেছে কাছাড় এবং সিলেট জেলা

১৯৩২ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী সুরমা ভ্যালিতে চা চাষের আওতাধীন ১,৪১,৫৪২ একর জমি ছিল এবং ৮,০৭,১৬,২২২ পাউন্ড চা উৎপন্ন হয়েছিল সিলেটের জলবায়ু আসামের চেয়ে একটু ভিন্ন প্রকৃতির। প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, তবে সব জায়গায় সমানভাবে হয় না। বসন্তকালে বৃষ্টিপাত কম হওয়াতে পাতা চয়ন ঋতু একটু দেরিতে শুরু হয় এবং ডিসেম্বর পর্যন্ত চলতে থাকে, আগাম খরা হলে উৎপাদন মারাত্মক বিঘ্নিত হয়। মার্চ-এপ্রিল মাসে সিলেট অঞ্চলে তীব্র বাতাস প্রবাহিত হয়, যাকে 'তুফান' বলা হয় যা 'টাইফুন' এরই অপভ্রংশ। এ তুফান আসামের উত্তর-পূর্ব দিক থেকে ধেয়ে আসে।

লন্ডনে চায়ের প্রথম নিলাম সম্পর্কে পত্রিকাটিতে লেখা হয়– ব্রিটিশ উপনিবেশভুক্ত ভারত থেকে প্রথমবারের মত আমদানিকৃত চা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মিনসিং লেনের বাণিজ্যিক বিক্রয় কেন্দ্রে রেখেছিল। এতে আটটি চেস্ট/বাক্সে মোট ৩৫০ পাউন্ড চা ছিল। আসামের সুচং চায়ের তিনটি লট এবং আসাম পিকো (Pekoe) পাঁচটি লট মোট আটটি লটে আট পেটি চা রাখা হয়। ব্রোকার মি. থমসন প্রথম লটটি বিক্রির সময় ঘোষণা দেন যে, সর্বোচ্চ নিলাম ডাককারীর নিকটই প্রতিটি লট বিক্রি করা হবে।

প্রথম নিলাম ডাকটি ছিল প্রতি পাউন্ড ৫ শিলিং, দ্বিতীয় ডাক ছিল প্রতি পাউন্ড ১০ শিলিং। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর ২১ শিলিং/পাউন্ড দরে লটটি বিক্রি হয়। ক্রেতা ছিলেন ক্যাপ্টেন পিডিং নামক একজন ব্যক্তি। দ্বিতীয় 'সুচং' লটটি একই ব্যক্তি ২০ শিলিং/পাউন্ড দরে কিনে নেন। তৃতীয় এবং শেষ সুচং লটটি ১৬ শিলিং/পাউন্ড দরে বিক্রি হয়। ক্রেতা ছিলেন সেই ক্যাপ্টেন পিডিং।

History of Assam Tea

- Discovered by: C. A. Bruce
- First planter : East India Company
- World was informed: 1836, by Asiatic Journal
- First dispatch: 350 pounds on May 8, 1838, to London
- First buyer: Captain Pidding

The
Asiatic Journal
***
Monthly Register
***
British and Foreign India, China,
***
Australasia
-x-
Vol XXI - News series
***
September – December. 1836

London
Wr. H Allen and Co.
1836

National Drink!

England	: Tea
Scotland	: Whisky
China	: Tea
India	: Tea
Bangladesh	: Tea
Pakistan	: Sugarcane juice

Ref: Mridul Bazarika, Assam, 2011

অসম পিকোর (Pekoe) প্রথম লটটি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর ২৪ শিলিং/পাউন্ড দরে বিক্রি হয়। সকল নিলাম ডাককারী এতে অংশ নেন কিন্তু ক্যাপ্টেন পিডিং ছিলেন সর্বোচ্চ ডাককারী ব্যক্তি। তাই তিনি তা কিনে নিতে সক্ষম হন। আসাম

পিকোর বাকি লটগুলোও ক্যাপ্টেন পিডিং কিনে নিতে সক্ষম হন তবে পঞ্চম এবং শেষ লটটি নিয়ে তীব্র প্রতিযোগিতা হয়। এতে প্রায় ৬০টি নিলাম ডাক হয়। অবশেষে ৩৪ শিলিং/পাউন্ড দামে ক্যাপ্টেন পিডিং তা কিনে নেন। ফলে ক্যাপ্টেন পিডিং লন্ডনে আসাম চায়ের প্রথম চালানটির একক ক্রেতা হিসেবে ইতিহাসে নাম লেখান। আসামে যে চায়ের উৎপাদন খরচ ছিল ১ শিলিং/পাউন্ড, সে চাকে এত দাম দিয়ে কেনার পেছনে ক্যাপ্টেন পিডিং এর যে মানবিকতার পরিচয় মেলে তা হল, ব্রিটিশ আসাম চায়ের প্রতি জনসাধারণের সম্মানজনক আগ্রহ সৃষ্টি করা।

ক্যাপ্টেন পিডিং 'Howqua mixture' এর মালিক ছিলেন। তিনি পরে চালানের চা গুলোকে ছোট ছোট প্যাকে ২ শিলিং ৬ পেনি দরে বিক্রি করে দেন। চায়ের মান যা হোক না কেন, ক্যাপ্টেন পিডিং এর মাধ্যমে ভরতীয় ব্রিটিশ চায়ের একটি ভালো প্রচার হয়ে যায়।

১৮৩৯ সালের শেষের দিকে ৯৫ পেটি আসাম চায়ের দ্বিতীয় চালানটি ইংল্যান্ডে এসে পৌঁছায় এবং নিলামে তা যথেষ্ট সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৮৪০ সালের ১৭ মার্চ চালানটিকে বিক্রির জন্য নিলামে তোলে। তবে সম্মানিত কোর্ট অব ডাইরেক্টর তাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ১০ পেটি চা রেখে দেন বাকি চাগুলো দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ক্রেতাগণ প্রতি পাউন্ড ৮ শিলিং থেকে ১১ শিলিং দরে কিনে নেন। তবে তয়চং (Toyehong) চায়ের একটি লট ৪ থেকে ৫ শিলিং/পাউন্ড দরে বিক্রি হয়।

আসাম চায়ের আবিষ্কারকের পদক নিয়ে বিভ্রান্তি

আসামে সর্বপ্রথম কে চা আবিষ্কার করেন তা নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। ড. ওয়ালিসের মতে লেফটেন্যান্ট চার্লটন হলেন সেই ব্যক্তি, কিন্তু তাঁর এ প্রস্তাব টিকেনি পরবর্তী দাবিদার হলেন মি. সি. এ. ব্রুস এবং তাঁর ভাই মেজর রবার্ট ব্রুস, যিনি জোড়হাটে কর্মরত ছিলেন

ভারতের তেজপুরে সি.এ. ব্রুসের সমাধি
First Superintendent of tea culture in Assam

ভারতের তেজপুরে Tazpur Church Yard এ তাঁকে সম্মানের সাথে সমাধিস্থ করা হয়। সমাধি স্তম্ভে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে কিছু কথা লেখা রয়েছে। তেজপুর চা বাগান এলাকায় সি. এ. ব্রুস পরিবারের কিছু সদস্য এখনও সেখানে বসবাস করছেন।

মেজর রবার্ট ব্রুস মারা যাবার পর 'Bengal Agricultural and Horticultural Society' এর মাধ্যমে 'English Society of Arts' মি. সি. এ. ব্রুসকে একটি পদক প্রদান করে। কিন্তু লেফটেন্যান্ট চার্লটন এবং মেজর জেনকিনস, উভয়েই এর প্রতিবাদ জানান। তাঁদের আপত্তিকে বিবেচনায় নিয়ে আসামের নিজস্ব চা গাছের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করার জন্য লেফটেন্যান্ট চার্লটনকে একটি এবং এ বিষয়ে তথ্যানুসন্ধানে সহায়তার জন্য মি. জেনকিনসকে একটি স্বর্ণপদক দেয়া হয়।

শুধুমাত্র একজনই কোন পদকের দাবি নিয়ে আসেননি, কেননা তিনি তখন আর ইহজগতে ছিলেন না। তাঁর নাম মেজর রবার্ট ব্রুস। অনেকের মতে তিনিই ছিলেন আসাম চায়ের প্রকৃত আবিষ্কারক। তবে 'Tea in Assam' গ্রন্থের রচয়িতা স্যামুয়েল বাইলডন মি. মনিরাম দেওয়ানকে আসাম চায়ের আবিষ্কর্তা হিসেবে উল্লেখ করেন। এমনও হতে পারে যে, মনিরাম দেওয়ান মেজর ব্রুসকে এ সম্পর্কে প্রথম তথ্য সরবরাহ করেন এবং তাঁকে প্রথম সেই প্রাকৃতিক (Wild) চায়ের কাছে নিয়ে যান।

চা চাষবাদে উল্লম্ফন এবং ধ্বস (Tea mania and panic)

ভারতীয় উপমহাদেশে ১৮৫১ সালের দিকে চা চাষাবাদে বিশাল পুঁজির বিনিয়োগ ঘটে। এর কারণ ছিল আসাম টি কোম্পানির সাফল্য এবং পরবর্তী সময়ে ১৮৫৮ সালের দিকে জোড়হাট কোম্পানির ইতিবাচক অগ্রগতি। ফলে ১৮৫৯ সালের দিকে ভারতে প্রায় ৫০টি ব্যক্তিমালিকানাধীন চা চাষ প্রকল্প স্থাপিত হয়। আসাম ছাড়াও দার্জিলিং, কাছাড়, সিলেট, কুমাউন এবং হাজারীবাগে প্রচুর সম্ভাবনার হাতছানিতে মানুষ বিশাল পুঁজি লগ্নি করে। চা চাষে প্রবৃদ্ধির গতিও ছিল স্বাভাবিক এবং চমৎকার, কিন্তু ১৮৬০ সালের দিকে হঠাৎ করে চা ব্যবসায় ধ্বস নামে এবং তা এক প্রকার ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায়।

প্রথমদিকে চায়ের চাষাবাদ সম্প্রসারণে অতিউৎসাহী সরকার খুব সহজশর্তে চাষবাদ উপযোগী জমি বরাদ্দ দিতে থাকে। ফলে চা শিল্পের বিস্তার এবং বিকাশ ঘটে খুবই দ্রুত গতিতে। এ সময় ১৮৫৪ সালের আসাম আইনের বিধিবিধান আরও কঠোর করে ৯৯ বছরের জন্য জমি অধিগ্রহণ নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। ফলে উদ্যোক্তাগণ হতোদ্যম হয়ে পড়েন। তাঁদের ক্রমবর্ধমান হতাশা এবং অসন্তোষ দূর করার জন্য ১৮৬১ সালে লর্ড ক্যানিং কিছু নূতন নীতিমালা সংযুক্ত করেন যাতে জমি অধিগ্রহণ সহজ করা হয়। কিন্তু এ নীতিমালা তেমন কোন সুফল

দিতে পারেনি, কারণ ইতোমধ্যেই চা চাষবাদে ধ্বস নেমে মারাত্মক সংকট তৈরি হয়ে গিয়েছিল এরকম একটি সংকটের অনেকগুলো কারণ রয়েছে। সংকটটি সৃষ্টি হওয়ার প্রাক্কালে কয়েকটি চা বাগান বেশ ভালই চলছিল। এ বিষয়টিকে অনেকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রচার করতে থাকেন। ফলে অনতিবিলম্বে অসংখ্য নতুন নতুন বাগান প্রতিষ্ঠা লাভ করে এ সকল বাগানের কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনা ছিল না। পুরাতন বাগানগুলোকে কোন উপযোগিতা যাচাই না করেই যত্রতত্র সম্প্রসারিত করা হতে থাকে। নতুন নতুন কোম্পানি আত্মপ্রকাশ করতে থাকে এবং নতুনরা শেয়ারের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে।

কোলকাতায় প্রতিদিনই নতুন নতুন কোম্পানির আবির্ভাব ঘটতে থাকে এবং শেয়ারের দামও আকাশচুম্বী হতে থাকে। তাদের চোখে তখন রাতারাতি বিত্তশালী হওয়ার স্বপ্ন। উন্মত্ত প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে বহু মানুষ অন্যান্য পেশা এবং চমৎকার চাকরি-বাকরি ত্যাগ করে পতঙ্গের মত ছুটে আসতে থাকে অনেকের মতে সে দিনগুলো ছিল লোভী মানুষের দিন এবং প্রয়োজন ছিল এমন একটি চা-নীতি প্রণয়ন করা, যাতে কেউ কোন অলীক স্বপ্ন না দেখে এবং মানুষ বাস্তবের কঠিন মাটিতে পা রাখতে পারে।

কিন্তু বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে বসে সরকারের কোন এক স্বরাষ্ট্রসচিব ক্যানিং কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা সংশোধন করান। এ সংশোধনীর ফলে চা চাষযোগ্য জমি নিলাম ডাকের মাধ্যমে অবাস্তব মূল্যে বিক্রি হতে থাকে। প্রতি একর জমির মূল্য যেখানে ২ থেকে ৮ টাকা হওয়াই যুক্তিসংগত ছিল, সেখানে নিলাম ডাকের মাধ্যমে তা একর প্রতি ১০ টাকা বা তার চেয়েও বেশি করে বিক্রি হতে থাকে। ফলে প্রকৃত চা-করদের পক্ষে জমি কেনা দুরূহ হয়ে পড়ে।

এ সময় আরও কিছু অপকর্ম ঘটে। একই জমি বার বার বিক্রি হতে থাকে। এ ধরণের অপকর্ম আসাম, কাছাড়, দার্জিলিং এবং চট্টগ্রামে কমবেশি চলতে থাকে। চট্টগ্রামে বহু খাড়া পাহাড় এবং এমনকি ধানিজমি, যা চা চাষাবাদের উপযোগী নয়, তাও বার বার অস্বাভাবিক লাভে বিক্রি হতে থাকে চা-জ্বরে আক্রান্ত সে সময়টিতে এ খাতে টাকা লগ্নিকারী লোকজনের মধ্যে যেমন ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক ও নৌবাহিনীর কর্মকর্তা, তেমনি ছিলেন চিকিৎসক, প্রকৌশলী, পশুচিকিৎসক, স্টিমারের কাপ্তান, রসায়নবিদ, দোকানদার, পুলিশ ইত্যাদি লোকজন অর্থাৎ নানা-পেশার, নানা শ্রেণির মানুষ এতে ঝাঁপিয়ে পড়েন এর কারণ বিশ্লেষণ করে বলা যায় –

১. প্রথমদিকে চা চাষে উন্মত্ত লোকজন মনে করত কিছু চা গাছের মালিক হওয়া মানেই সম্পদশালী হওয়া।

২. লোকজনের মধ্যে বাস্তবতাবর্জিত একধরণের অপপ্রচার চালানো হয় যাতে তারা মনে করে চা চাষাবাদ নিশ্চিত লাভজনক

৩. এ খাতে দক্ষ, অভিজ্ঞ, ধৈর্যশীল মানুষের পরিবর্তে অদক্ষ এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষের আগমন।

৪. সরকারিভাবে যথেষ্ট দক্ষতার সাথে বিষয়টি খতিয়ে না দেখা এবং বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ না করা।

এরকম একটি উন্মত্ততা যখন চলছিল, তখন অনেকে ৫০০ একর জমির দাম দিয়ে পরে বরাদ্দকৃত জমি মেপে দেখেন ১০০ একর মাত্র। অনেকে আবার কফি গাছের সাথে চা গাছের পার্থক্যও জানতেন না। কিন্তু চা খাতে নিযুক্ত বোর্ড অব ডিরেক্টর্স এবং কলকাতায় নিয়োজিত সচিবগণের পিছনে সরকারের কড়ি কাড়ি টাকা ব্যয় হচ্ছিল। প্রতিটি বিভাগেই অদক্ষতা এবং অব্যবস্থাপনা প্রকট হয়ে উঠেছিল

১৮৬৫ সালের দিকে পরিস্থিতি চূড়ান্ত খারাপ আকার ধারণ করে। ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা কোম্পানিগুলো রুগ্ন হয়ে যায় এবং অধিকাংশ কোম্পানি বন্ধ হয়ে যায়। চা চাষাবাদে একদা যে উন্মত্ততা তৈরি হয়েছিল, এ পর্যায়ে এসে তা আতঙ্কে পরিণত হয়। যেকোনভাবে চা বাগান ক্রয় করার ইচ্ছা তখন যে কোনভাবেই হোক বিক্রি করার ইচ্ছায় পর্যবসিত হয়। যে চা বাগানের মূল্য ছিল হাজার হাজার টাকা তা তখন মাত্র কয়েকশত টাকায় বিক্রি হতে থাকে। কিছু বাগান বিক্রি না হওয়াতে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। চায়ের এ ক্রান্তিকালকে অন্ধকার সময় বলা যেতে পারে। ঐতিহাসিকগণ এ সময়টিকে উন্মত্ততা বা আতঙ্ক (Mania and panic) নামে অভিহিত করেন।

আসামের সে দিনগুলো

আসামে চায়ের আদি সময়কালটি কোন দুঃসাহসী অভিযাত্রিকের নিকট সুসময় বলে গণ্য হতে পারে কিন্তু বস্তুতঃ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। আসামের অধিকাংশ স্থানই তখন ১০ থেকে ১৫ ফুট উঁচু নলখাগড়ার দুর্ভেদ্য জঙ্গল দ্বারা আবৃত ছিল। মাঝে মাঝে সামান্য কিছু জমিতে হয়ত এক সময় ধানচাষ হত। বাকিটা ছিল বনজঙ্গল। যখন ব্রিটিশ কোম্পানিগুলো আসামে চা চাষের জন্য এ দুর্ভেদ্য জঙ্গল আবাদ করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করে, তখন অবস্থা এরকম ছিল যে, ঐ সকল এলাকায় ভয়ংকর বন্য জীবজন্তুর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং স্থানীয় অধিবাসীদের সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছিল।

নিম্ন অনুযায়ী জঙ্গল এলাকাই ছিল চা চাষের জন্য অধিক উপযোগী। আসামের জোড়হাট, ডিব্রুগড় এবং দুমদুমা জেলার ঘন জঙ্গল আবাদ করে তাতে ধীরে ধীরে

চা চাষাবাদ হচ্ছিল, যারা এ প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত ছিলেন, তারা অনেকটাই সভ্যজগত থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন লিন্ডে (Linde, 1874) এ অবস্থাটিকে আদিম বসতিগড়া মানুষের সাথে তুলনা করেছেন, যারা তাদের বসবাসের পরিধিকে ধীরে ধীরে ঘন জঙ্গল পরিষ্কার করে বাড়াচ্ছিলেন এবং চায়ের আবাদের গোড়পত্তন করছিলেন।

সে দিনগুলোতে একজন চা ব্যবস্থাপকের বাংলোর অবস্থা ছিল করুণ সেখানে থাকত একটি স্টোভ, চেরা বাঁশের একটি পাটাতন, যাতে শোয়ার কাজ চলত একটি বাক্স ছিল যা চেয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হত, একটিমাত্র টেবিল থাকত এবং অবশ্যই থাকত একটি ওষুধের শেল্ফ। এ ওষুধের শেল্ফ ছাড়া কারও পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব ছিল না। বেঁচে থাকার জন্য প্রত্যেক চা-করকে প্রতিদিন সকালে কুইনাইন খেতে হত, সপ্তাহে দুবার খেতে হত রেড়ির তেল এবং প্রতি চান্দ্রমাসে দুবার ক্যালোমেল গ্রহণ করা ছিল বাধ্যতামূলক। এ প্রসঙ্গে শেষ বয়সে কোলকাতায় বসে একজন চা-করের স্মৃতিচারণ ছিল এরকম– 'সেখানকার আবহাওয়ায় কোন ভেড়াকে বাঁচানো যেত না। হিন্দু লোকজন– গরুর মাংস বা দুধ ধর্মীয় বিধিনিষেধের কারণে খেতে নিষেধ করত। কাজেই পাখির মাংসই ছিল চা-করদের একমাত্র ভরসা। তারা অবশ্য মাংসের জন্য ছাগল পোষতেন এবং ছাগীর দুগ্ধ দোহন করে মাঝে মাঝে খেতেন মাঝে মাঝে শিকারীরা ছোট বন্য শুকর নিয়ে আসত। তাছাড়া ছিল বিভিন্ন প্রকার মোটা চাল সে চাল সেদ্ধ করে খাওয়া হতো অথবা গুঁড়া করে 'পরিজ' বা চাপ্টা করে 'চাপাতি' বানিয়ে খাওয়া যেত

ভালো জাতের কোন ঘোড়া সেখানে টিকতে পারত না। একজাতীয় ছোট্ট 'ভূটিয়া পনি' নামক ঘোড়া কোন রকমে টিকে থাকত ধানের কুড়া বা ধান খেয়ে।

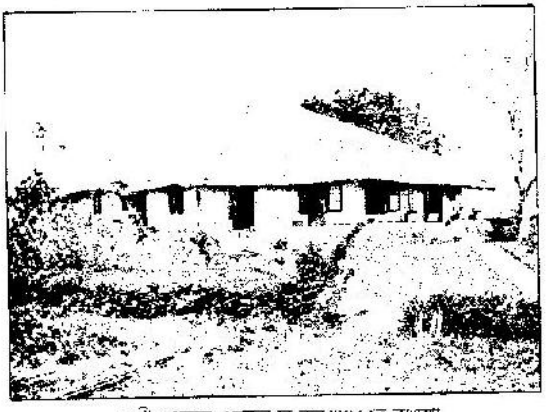

প্রাক্তনকালের একজন চা ব্যবস্থাপকের বাংলো

চা-করদের রোজনামচা ছিল সকালে কুইনাইন সেবন, তারপর কফিপান, এবং যা জুটে কপালে তাই খাওয়া তারপর ঠোঁটে একটি পাইপ ঝুলিয়ে দ্রুতবেগে বের হয়ে জঙ্গল পরিষ্কারের কাজ তদারকি করা, যতক্ষণ না দুপুরের খাবার সময় হয় তারপর বৈকালিক পরিদর্শনের কাজে আবার বেরিয়ে পড়া। এভাবেই সপ্তাহের পর সপ্তাহ – যতদিন না বাড়ি যাওয়ার সুযোগ ঘটে অথবা শেষ আশ্রয়স্থল সমাধিতে যাওয়ার সময় হয় ততদিন এভাবেই চলত।

উপমহাদেশে চা পরিবহনের আদি বৃত্তান্ত

ভারতে চা পরিবহন বরাবরই ছিল দুঃসাধ্য একটি কাজ। কেননা উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোলকাতা থেকে রেলপথে ডিব্রুগড়ের দূরত্ব ৮৩০ মাইল আসাম এবং ডুয়ার্স জেলায় নদীর ওপর অনেক স্থানে সেতু না থাকায় পরিবহনে আরও জটিলতা সৃষ্টি হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে আসামে প্রস্তুত চায়ের পরিবহন পথ ছিল ব্রহ্মপুত্র নদী। কোলকাতা এবং ডিব্রুগড়ের মধ্যে প্যাডেল চালিত একজাতীয় স্টিমার চলাচল করত, এ নদীপথের দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ১০০০ মাইল। এ পথ অতিক্রম করতে স্টিমারে সময় লাগত ১৫ দিন। সুরমা ভ্যালিতে রেল যোগাযোগ স্থাপনের পূর্বে বরাক নদী ছিল প্রধান পরিবহন পথ। দেশীয় নৌকায় করে বিভিন্ন স্থান থেকে ব্রহ্মপুত্র নদে চা নিয়ে আসা হত, যেখানে স্টিমারে চা তোলা হত তাছাড়া পরবর্তীতে সুরমা ভ্যালি অর্থাৎ সিলেটের সাথে চট্টগ্রামের সরাসরি রেল যোগাযোগ স্থাপিত হয়। কোলকাতা যাবার জন্য চাঁদপুরে গিয়ে স্টিমার ধরে গোয়ালন্দ যেত। অর্থাৎ চট্টগ্রাম অঞ্চলের চা রেলপথে এনে চাঁদপুর রাখা হত। চাঁদপুর থেকে স্টিমারে পাঠানো হতো গোয়ালন্দ ঘাটে গোয়ালন্দ থেকে পূর্ববঙ্গ ব্রডগেজ রেলপথে কোলকাতা পর্যন্ত পৌঁছানো হতো।

পূর্ববঙ্গ রেলপথের (East Bengal Railway) মাধ্যমে ডুয়ার্স থেকে লালমনিরহাট পর্যন্ত চা আসত। সেখানে আসাম–কোলকাতা রেললাইনের সাথে সংযোগ ছিল। এ লাইনটি সান্তাহার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং সান্তাহার থেকে তা শিলিগুড়ি হয়ে আগত ব্রডগেজ লাইনের সাথে যুক্ত ছিল। সান্তাহারে চা পৌঁছানোর পর তা পুনরায় কোলকাতাগামী ট্রেনে তুলে দেয়া হত। আরেকটি বিকল্প পথে ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে ধুবরি পর্যন্ত চা পৌঁছানো যেত।

আসামে প্রথম স্থাপিত রেলপথ ছিল জোড়হাট প্রভিন্সিয়াল রেলপথ এবং ডিব্রু–সদিয়া রেলপথ। এ দুটি রেলপথ স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল চা উৎপাদনকারী জেলাগুলোকে ব্রহ্মপুত্রের সাথে সংযুক্ত করা তারপর চট্টগ্রাম থেকে তিনসুকিয়া পর্যন্ত আসাম বেঙ্গল রেলপথ স্থাপন করা হয়। যা আড়াআড়িভাবে কাছাড় থেকে

আসাম ভ্যালির লামডিং পর্যন্ত বিস্তৃত। এর ধারাবাহিকতায় লামডিং থেকে গৌহাটি পর্যন্ত লাইন বসানো হয় এবং কোলকাতা পর্যন্ত পরিবহনের একটি বিকল্প রাস্তা তৈরি হয় যা ছিল রেলপথে গৌহাটি, তারপর নদীপথে স্টিমারে করে ধুব্রি এবং সেখান থেকে পূর্ববঙ্গীয় রেলপথে কোলকাতা পর্যন্ত। গৌহাটির বিপরীতে লালমনিরহাট থেকে আমিনগাঁও পর্যন্ত বিস্তৃত রেলপথটি চালু করার মধ্য দিয়ে কোলকাতা এবং আসামের মধ্যে যোগাযোগের শেষ ব্যবস্থাটি সম্পন্ন হয়। তারপর থেকেই আসামে বহু সংখ্যক শাখা রেলপথ স্থাপিত হয়।

তবে সুরমা ভ্যালিতে কিছু রাস্তা অনেক ভাল ছিল। এর কারণ এ সকল রাস্তায় অনেক কম যানবাহন চলাচল করত এবং রাস্তাগুলো নুড়িপাথরে তৈরি ছিল। আবার দক্ষিণ ভারতে ভালো রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল। তাছাড়া রাস্তাগুলো চমৎকারভাবে পিচঢালা ছিল। বহুক্ষেত্রে চা-কে গরুরগাড়ি বা ঘোড়ায় করে শতমাইল পাড়ি দিয়ে রেলপথ পর্যন্ত নিয়ে আসা হত। তবে অতিবৃষ্টির ফলে অনেক সময় যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ত এবং কয়েকদিন এমনকি কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত চা পরিবহন বন্ধ থাকত।

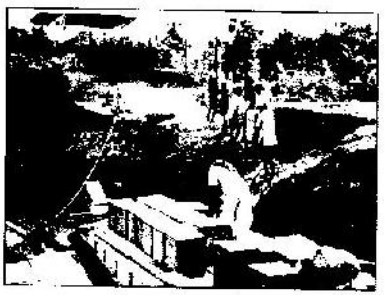

প্রাচীন চা পরিবহন চিত্র

মনিরাম দেওয়ান, এক মহান ব্যক্তিত্ব

১৮৫৮ সালে ইংরেজগণ মনিরাম দেওয়ানকে ফাঁসিতে ঝুলায়। তাঁর অপরাধ ছিল তিনি ১৮৫৭ সালের সিপাহীবিদ্রোহে অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বলা হয়ে থাকে যে, তাঁর ফাঁসি কার্যকর করার পূর্বে দেওয়ান আসামের মানুষকে তাঁর দুটি চা বাগানের চা গাছগুলোকে দেখাশোনা করার জন্য অনুরোধ করে যান। মনিরাম দেওয়ান শুধুমাত্র আসামে একজন চা আবিষ্কর্তাই ছিলেন না, অথবা তিনি শুধুমাত্র আসামে ব্যাপকভিত্তিক চা চাষবাদ ইংরেজদের নজরে আনেন তাই নয়, তিনি ছিলেন ব্যক্তি উদ্যোগে চা চাষের প্রথম সফল ব্যক্তি এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের চা সংশ্লিষ্ট প্রথম ব্যক্তি যিনি স্বাধীনতাসংগ্রামে আত্মদান করেন।

আসামে চা আবিষ্কারের জন্য সকল সম্ভাবনায় যার নাম আসে তিনি হলেন মনিরাম দেওয়ান। তিনি ছিলেন আসামের প্রথম চা-কর (Tea Planter)। চা চাষাবাদের জ্ঞান অর্জন করার পর তিনি ১৮৪২ সালে চা চাষাবাদ শুরু করেন। ১৮৪৩ সালে জোড়হাটের নিকটে সিনামারায় তিনি প্রথম চা বাগান শুরু করেন। ১৮৪৫ সালে সেনারির নিকটে সেংলাং নামক স্থানে তিনি অন্য চা বাগানটি চালু করেন। ১৮৪৭ সাল থেকে চা প্রক্রিয়াজাতকরণও শুরু হয়। মনিরাম দেওয়ান কর্তৃক চা চাষাবাদের পর্যায়ক্রমিক বিস্তার নিম্নে উল্লেখ করা হল–

সন	বিঘা
১৮৫৩	৩০০
১৮৫৪	৯০০
১৮৫৫	১০২৯

সন	বিঘা
১৮৫৬	১৬২৭
১৮৫৭	১৯৪১

এ সকল এলাকায় উৎপাদিত চায়ের মোট পরিমাণ ছিল ২২,৫০০ পাউন্ড। যাহোক, ইংরেজগণ একজন স্থানীয় লোক তাদের সাথে প্রতিযোগিতা করে চা চাষবাদে সাফল্য লাভ করছে দেখে তা সহ্য করতে পারেনি এবং বিভিন্ন প্রকার বাঁধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করতে থাকে। কিন্তু মনিরাম দেওয়ান ছিলেন একজন দেশপ্রেমিক এবং দৃঢ় চিত্তের মানুষ। তিনি চা-কে আসামের অহংকার মনে করেছিলেন।

তাঁকে ফাঁসি দেয়ার পরে ইংরেজগণ তাঁর দুটি চা বাগান অধিগ্রহণ করে এবং নিলামে বিক্রি করে দেয়। জর্জ উইলিয়ামসন নামক এক ব্যক্তি নামমাত্র মূল্যে বাগান দুটি কিনে নেন। জানা যায়, উইলিয়ামসন এহেন অবৈধ সুবিধা গ্রহণের জন্য পরবর্তীতে অনুতপ্ত হন এবং জোড়হাট ও গোলাঘাট এলাকায় লাইব্রেরি এবং বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য বাগান দুটি দান করে দেন। সিনামারা চা বাগানের একটি সেকশনের নাম এখনও মনি টি হিসেবে পরিচিত।

মনিরাম দেওয়ানের ফাঁসি আসাম অঞ্চলের মানুষের জন্য একটি আঘাত স্বরূপ ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বেশ কয়েকজন আসাম অঞ্চলের উদ্যোক্তা চা চাষে এগিয়ে আসেন। এসকল অগ্রণী ব্যক্তিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন রাজেশ্বর বড়ুয়া, হেমাধর বড়ুয়া, রায় বাহাদুর জগন্নাথ বড়ুয়া, কর্নেল শিবনাথ বোরা এবং সর্বানন্দ বারকোটকি।

চা এলাকার একটি ঐতিহ্যবাহী পোস্ট অফিস

বাংলাদেশের সিলেট ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের চা বাগানগুলো যখন প্রথম আবাদ শুরু হয় তখন ব্রিটিশ সাহেবগণ বাগানে থেকেই আবাদের কাজ করতেন। সুদূর যুক্তরাজ্য থেকে এদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আসতেন কোলকাতা হয়ে ট্রেনে

গোয়ালন্দ গোয়ালন্দ থেকে স্টিমারে চাঁদপুর হয়ে রেলে চট্টগ্রাম। অতঃপর গরু বা ঘোড়ার গাড়িতে করে চট্টগ্রামের বাগানগুলোতে যেতেন। সিলেট অঞ্চলে আসতেন গোয়ালন্দ হয়ে ঢাকা এবং তারপর সিলেট। আবার কখনো আসাম থেকে জুড়ী হয়ে সিলেট আসতেন বা শিলচর- করিমগঞ্জ হয়ে বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে আসতেন। এসব দুর্গম এলাকায় তাঁদের বসবাস ছিল অনেকটা নির্বাসনের মত। তাঁদের নিজ মাতৃভূমি যুক্তরাজ্যের যেসকল অঞ্চলে তাঁদের পরিবার বা পিতা-মাতা থাকেন তাদের সাথে যোগাযোগ হতো কেবল মাত্র পোস্ট অফিসের মাধ্যমে চিঠিপত্র যোগে। প্রয়োজনের তাগিদে চা আবাদি এলাকার কোথাও কোথাও পোস্ট অফিস স্থাপন করা হয়েছিল। ফিনলে টি কোম্পানির বাগানগুলোর কেন্দ্রস্থল কালীঘাটে এরূপ একটি পোস্ট অফিস স্থাপন করা হয়েছিল ১৯২৩ সালে (উৎস - জনাব আনোর উল্লাহ, সুপারভাইজর, জিপিও অগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম)। এ পোস্ট অফিসের সাথে জড়িয়ে আছে সেকালের ব্রিটিশ সাহেবদের জীবনের অনেক সুখ-দুঃখের কাহিনি। হয়তো চা-কর সাহেবগণ চেয়ে থাকতেন এ পোস্ট অফিসের দিকে করে তার প্রিয়জনের হাতের লিখা পত্র আসবে সে অপেক্ষায়, আর তা তার অবসরের একমাত্র উপকরণ। সে কাহিনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অমর ছোটগল্প পোস্টমাস্টার-এর কাহিনির সাথে অনেক মিল রয়েছে।

প্রায় ১২৪ বছর পূর্বে বাংলা ১২৯৮ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পোস্টমাস্টার গল্পটি লেখেন বলে জানা যায়। সে গল্পের পোস্টমাস্টার প্রত্যন্ত উলাপুর নামক গ্রামে নিতান্ত নির্বান্ধব পরিবেশে চাকরিজীবন শুরু করেছিলেন। গল্পের পোস্ট অফিসটি এক নীলকুঠির কল্যাণে স্থাপিত হয়, নীলকর সাহেবের একান্ত চেষ্টায়। তেমনি চা-কর সাহেবদের একান্ত চেষ্টায় উপমহাদেশের পাহাড়ি প্রত্যন্ত অঞ্চলে বেশ কিছু পোস্টঅফিস স্থাপিত হয়েছিল, এতে শুধু চা বাগানবাসী নন, আশেপাশের এলাকাবাসীও উপকৃত হয়েছিল। বর্তমানের মোবাইল টেলিফোন আর তথ্যপ্রযুক্তির যুগে আমরা কি সে সময়কার যোগাযোগ ব্যবস্থার ভয়াবহ রূপটি কল্পনা করতে পারি? কিংবা বিদ্যুৎহীন, গ্যাসহীন, রাস্তাঘাটহীন, যানবাহনহীন পাহাড়ি পরিবেশে টিকে থাকার সংগ্রামে যারা অকুতোভয় ছিলেন, তাঁদের অবদানকে খাটো করে দেখার কোন অবকাশ আছে কি? যুক্তরাজ্য থেকে আগত অনেক চা-কর সাহেব অনেক সময় ম্যালেরিয়াসহ দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে দিনের পর দিন যাপন করেছেন। আমরা জানি না, রবীন্দ্রনাথের পোস্টমাস্টারের মতো তাঁদের দেখাশোনা করার জন্য রতনের মতো নিবেদিতপ্রাণ কোন বালিকা ছিল কিনা? সে নিঃসঙ্গ দিনগুলোতে একটি চিঠির আশায় দিনের পর দিন পথ চেয়ে থাকা তারপর চিঠি পেলে সে কী আনন্দ! এ যেন এক কল্পকাহিনির মতো মনে হচ্ছে আমাদের। পোস্টমাস্টার গল্পের একস্থানে আছে- "এই নিতান্ত নিঃসঙ্গ প্রবাসে ঘনবর্ষায় রোগকাতর শরীরে একটুখানি সেবা পাইতে ইচ্ছে করে।"

পোস্টমাস্টার গল্পটির একটি পটভূমি আছে। রবীন্দ্রনাথের কুঠিবাড়িতে একজন পোস্টমাস্টার আসতেন। সেটা ১৮৯২ খ্রি. কাহিনি। এ সম্পর্কে এক সাক্ষাৎকারে কবি যা বলেছিলেন তা ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬ সালে 'Forward' নামক পত্রিকায় ছাপা হয়- Then there was a postmaster. He used to come to me. He had been away from his place for a long time and he was longing to go back. He didn't like his surroundings. He thought he was forced to live among barbarians. And his desire to get leave was so intense that he even thought of resigning from his post. He used to relate to me the happenings of the village life. He thus gave the material for a character in my story Postmaster. [গল্পগুচ্ছ, পরমা প্রকাশনী ঢাকা-১৩৯৫, পৃ: ৭৭৩]

এ আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি, গল্পের পোস্টমাস্টার, পোস্ট অফিস বা শহর আসলে সম্পূর্ণ অবাস্তব ছিল না, ছিল বাস্তবতার কাছাকাছি। সময়টি ছিল তখনই অনগ্রসর, সুলেখকের হাতে পড়লে বাংলাদেশের চা-শিল্পে সে সময়ে কালীঘাট পোস্ট অফিসের মতো একটি পোস্ট অফিসও হয়তো অনুরূপ কাহিনি সৃজন করতে পারত।

কালীঘাট পোস্ট অফিসের বর্তমান অবস্থা।

সেকালের চা বিপণন কৌশল ও বিজ্ঞাপনের ভাষা

বর্তমান বিশ্বে 'মার্কেটিং' শব্দটি অতিপরিচিত একটি শব্দ। পণ্যের প্রচার এবং প্রসারে নানাবিধ কৌশলের সফল বাস্তবায়নকে মার্কেটিং বা বিপণন বলা যায়। অন্য কথায় পণ্য এবং সেবা গ্রাহকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য যে ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া– তাকেই আধুনিক বিশ্বে বিপণন বলা হয়। এ প্রক্রিয়ায়

চারটি উপাদানের সফল সমন্বয় ঘটাতে হয় যেমন –

১) পণ্য সনাক্তকরণ, নির্বাচন এবং পণ্যের উন্নয়ন

২) পণ্যমূল্য নির্ধারণ

৩) ক্রেতারদোরগোড়ায় পৌছানোর জন্য একটি বিপণন-কৌশল নির্বাচন

৪) বিজ্ঞাপন কৌশল উন্নয়ন এবং প্রয়োগ।

বর্তমানে তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তিখাতে যে বৈপ্লবিক উন্নয়ন ঘটেছে, তাতে পণ্যের বিপণনে উল্লেখিত কৌশল বাস্তবায়ন অনেক সহজ হয়ে গেছে কিন্তু আজ থেকে প্রায় দু'শতাব্দী পূর্বে একটি নতুন পণ্যের প্রচার এবং প্রসার কার্যক্রম ছিল দুরূহ ব্যাপার 'চা' এর ক্ষেত্রে তা ছিল আরও দুরূহ কেননা চা উৎপাদিত হত দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে। ধরণ এবং প্রকৃতি ভিন্ন হলেও তখনও প্রতিযোগিতা ছিল। সে প্রতিযোগিতা একই পণ্যের সাথে ভিন্ন স্থানে উৎপাদিত একই পণ্যের, আমদানিপণ্যের সাথে রফতানি পণ্যের, দেশীয় বাজারের সাথে আন্তর্জাতিক বাজারের। তাই চা চাষের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং ব্রিটিশ শাসকদের এ উপমহাদেশে চায়ের প্রচার এবং প্রসারে 'বিপণন-কৌশল' সম্পর্কেও অনেক কাজ করতে হয়েছে এ ব্যাপারে তারা ছিলেন সময়ের চেয়ে অগ্রগামী।

উনবিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে আসামে প্রাকৃতিক বা আরণ্যক (wild) অবস্থায় চা-গাছ আবিষ্কৃত হয়– যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে এতে স্থানীয় ব্রুস ভ্রাতৃদ্বয়ের অবদান ছিল অনস্বীকার্য। আসামের সমাজসচেতন ব্যক্তিবর্গের মধ্যে মনিরাম দেওয়ানের নামও আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। তাঁরা তাঁদের শ্রম, মেধা এবং সর্বস্ব চায়ের উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত করেছিলেন। কিন্তু লগ্নিকৃত পুঁজির বিপরীতে সফল বিপণনের মাধ্যমে লাভের মুখ দেখা এত সহজ ছিল না। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকতা এক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে। তাদের সামনে যে সকল প্রতিবন্ধকতা ছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করার সহজ পন্থা খুঁজে বের করা। তাছাড়া একই মুদ্রার প্রচলন না থাকায় পণ্যমূল্য নির্ধারণে জটিলতাও ছিল কিন্তু তাই বলে তাদের প্রচেষ্টা থেমে থাকেনি তখনকার সময়ে যোগাযোগের অন্যতম প্রধান অবলম্বন ছিল নদীপথ এবং সদ্যনির্মিত রেলপথ।

নদীপথে বিভিন্ন নদীবন্দরে লোক সমাগম হতো। রেলপথে বিভিন্ন রেলস্টেশনে লোক সমাগত হতো। এ বিষয়টি মাথায় রেখে বিভিন্ন স্টিমার ও নৌবন্দরে এবং রেলস্টেশনে টিনের প্লেটে চা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রচলিত ভাষায় বিজ্ঞাপন লিখে

চিত্রসহ টাঙানোর ব্যবস্থা করা হত। এসকল বিজ্ঞাপনে চা-পানে আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে চায়ের উপকারিতা এবং প্রতিকাপ চায়ের মূল্য সম্পর্কেও চমৎকার বোধগম্যতারসাথে উপস্থাপন করা হত। শোনা যায় কোলকাতা, ঢাকা ও অন্যান্য বড় বড় শহরের মোড়ে দাঁড়িয়ে বিনেপয়সায় মানুষকে চা খাওয়ানো হতো।

বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীগণ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া রেলস্টেশনে যুগের অবহেলাপীড়িত এরকম কিছু দুর্লভ বিজ্ঞাপন প্লেট দেখতে পেয়ে সংগ্রহ করে আনেন। যা বর্তমানে ইনস্টিটিউটের দেয়ালে শোভা পাচ্ছে। সংগৃহীত এসকল প্লেটে দেখা যায়, বাংলা, ইংরেজি, উর্দু এবং অহমিয়া ভাষায় চা সম্পর্কে আগ্রহ উদ্দীপক বিজ্ঞাপন প্রদর্শিত হয়েছে। এসকল বিজ্ঞাপনচিত্রের কিছু নমুনা নিম্নে সন্নিবেশিত করা হল -

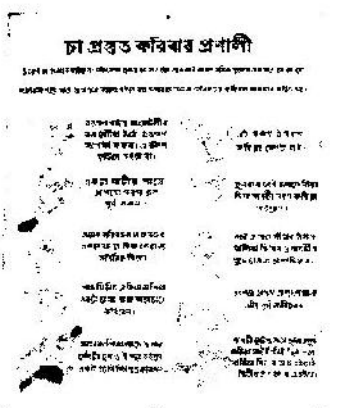

একটি বিজ্ঞাপনের ভাষা যেরূপ ছিল -

চা পানের উপকারিতা
ইহা খাইতে বেশ সুস্বাদু।
ইহাতে কোন অপকার হয় না।
ইহা জীবনী শক্তির উদ্দীপক
ইহাতে মাদকতা শক্তি নাই
ইহা ম্যালেরিয়া নিবারক।
ইহা সান্নিপাতিক বিকারের আক্রমণ
হইতে রক্ষা করে
ইহা বিসূচিকা প্রতিষেধক।
ইহা দেহমনের অবসাদ দূর করে।

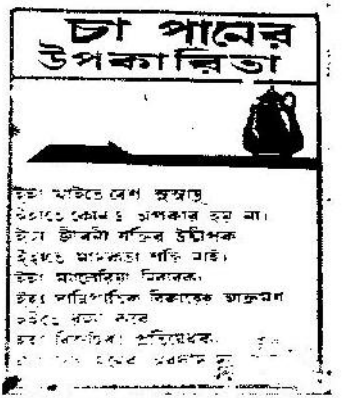

আরেকটি বিজ্ঞাপনচিত্রের ভাষা-

গরম চা
পান কর

সম্পদ	স্বাস্থ্য	সুখ

লাভ হইবে
শীত ও বর্ষার ব্যাধি দূর হইবে।
ইহাই একমাত্র
গ্রীষ্মের শীতল পানীয়।

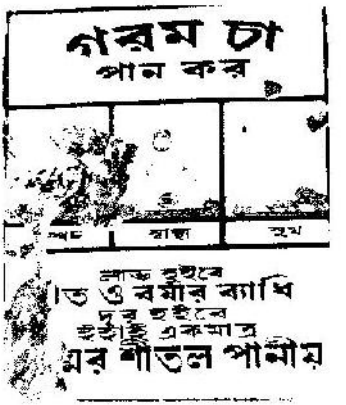

আরেকটি বিজ্ঞাপনচিত্রে গরম চায়ের প্রতি পেয়ালার দাম চিত্রের সাহায্যে সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে, যাতে দেখা যাচ্ছে এককাপ গরম চায়ের দাম মাত্র দুপয়সা। আরেকটি বিজ্ঞাপনে দেখা যাচ্ছে একজন মহিলার হাতে ধূমায়িত গরম চায়ের কাপ এবং তার নীচে চা পানের উপকারিতা সংক্ষেপে বলা আছে। সে সময়ে, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে একজন মহিলার হাতে ধূমায়িত গরম চায়ের কাপ, বর্তমানে হয়ত খুবই সাধারণ একটি বিজ্ঞাপন, কিন্তু সে সময়ে তা ছিল সময়ের চেয়েও অগ্রগামী চিন্তার প্রতিফলন।

স্থানীয় আসাম জাতের চায়ের সফল উৎপাদনের পর তা আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রি করার ব্যবস্থা নেয়া হয়। প্রথম চায়ের চালানটি ১৮৩৮ সালে সমুদ্রগামী জাহাজ 'ক্যালকাটার' মাধ্যমে লন্ডন পাঠানো হয়। ১৮৩৯ সালের ১০ জানুয়ারি

সে চা লন্ডনের বাজারে নিলামে বিক্রি হয় এবং যথেষ্ট সমাদর লাভ করে। এ নিলাম সম্পর্কে সংবাদপত্রে ফলাও করে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়। ইতোপূর্বে এ কথাগুলো একবার বলা হয়েছে তবুও পাঠকের স্মৃতিতে নেয়ার জন্য পুনরায় উল্লেখ করা হলো। গ্রাহক পর্যায়ে আসাম চা সুন্দর টিনের বাক্সে বিক্রি হতে থাকে। বাক্সের গায়ে "Assam Tea, the finest quality of Indian Tea" এ জাতীয় লেখা গ্রাহকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করত।

অনেক চড়াই উৎরাই, প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে, উপমহাদেশের উৎপাদিত 'চা' বিশ্ববাজারে স্থান করে নেয়। তাছাড়া অভ্যন্তরীণ বাজারেও দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করে। বিজ্ঞাপনের ভাষা এবং বাস্তবতার মধ্যে খুব বেশি ফারাক ছিল না। চা একটি উদ্দীপক ও নির্দোষ উপকারী পানীয় হিসেবে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অত্যাবশ্যকীয় পানীয় হিসেবে আজ বিশ্বব্যাপী সমাদৃত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

চায়ের উদ্ভিদ পরিচিতি

(Tea botany)

চায়ের উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম *Camellia sinensis L.* সকল চা গাছ একই প্রজাতিভুক্ত। পৃথিবীব্যাপী বিভিন্ন আকার আকৃতির চা গাছ রয়েছে। তবে চায়না এবং আসাম জাতের চা গাছ দুটি ভ্যারাইটি হিসেবে স্বীকৃত। চায়না চা-কে *C. sinensis var sinensis L.* এবং আসামজাতের চা-কে *C. sinensis var. assamica* নামে অভিহিত করা হয় (Kitamura 1950)। অবশ্য কিছু লেখক যেমন Cohen Stuart (1920), Humbert and Gagnepain (1943) প্রমুখ মনে করেন চায়ের আরও ভ্যারাইটি আছে, যাদের স্বীকৃতি দেয়া প্রয়োজন। ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত 'Two and a Bud' জার্নালের ১০ম ভলিউম সংখ্যা ৩ এ উল্লেখ করা হয় যে, বন্য এবং আধ-বন্য চা গাছ থেকে চাষাবাদ করা চা গাছের যে প্রকারভেদ রয়েছে তাতে দুটি Taxa কিছুতেই তাদের প্রতিনিধিত্ব করে না, আরও ট্যাক্সার (taxa) স্বীকৃতি দেয়া প্রয়োজন ঐ প্রবন্ধে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার তিনটি অঞ্চল, যথা আসাম, চীন এবং ইন্দো-চীনের নিজস্ব তিন প্রকার চায়ের অঙ্গসংস্থানিক, আন্তঃঅঙ্গসংস্থানিক এবং রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়। আসাম এবং চায়না চাকে দুটি ভিন্ন প্রজাতি যথাক্রমে *Camellia assania (Masters)* এবং *Camellia sinensis (L)* হিসেবে স্বীকৃতিদানের স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করা হয়। তাছাড়া দক্ষিণী (The southern form) তৃতীয় প্রকার চা-কে Wight (1962) আসামের একটি উপ-প্রজাতি (Sub-species) হিসেবে *Camellia assanica sub. sp. lasyocalyx* (Planch M. S.) নামে প্রস্তাব করেন।

দক্ষিণ-পূর্ব ভারতে আবাদকৃত বহু চা গাছই আসাম এবং চায়না চা গাছের শংকর (hybrid)। কিছু চা গাছ দক্ষিণী জাত থেকে এসেছে বলেই মনে হয়। তাছাড়া আরও কিছু উল্লেখযোগ্য মিশ্রিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন (Heterogenous) গাছ

রয়েছে যেগুলোকে শংকর-প্রজাতি (species hybrids) বলা যায় (Wight and Barua, 1957)। উল্লেখিত তিনজাতের চা গাছ ছাড়াও এদের উৎপত্তিতে *Camellia* গণভুক্ত আরও কিছু উদ্ভিদের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। তবে বর্তমানের চায়না হাইব্রিড বা আসাম জাতের চায়ের আদি পূর্ব-পুরুষ সনাক্ত করা যথেষ্ট কঠিন কাজ। উদাহরণ হিসেবে *Camellia* গণের একটি উদ্ভিদ এবং মধ্যপর্যায়ে আবাদকৃত চা গাছের বংশগতির সাথে এর যোগসূত্র বা প্রভাব সম্পর্কে আলোকপাত করা যায়। এ আলোচনা থেকে জানা যাবে যে, টোকলাই এ 'চায়না হাইব্রিড' নামে পরিচিত কিছু চা গাছের উৎপত্তিগত দিক নিয়ে প্রচলিত ধারণার চেয়েও অনেক জটিল একটি ইতিহাস রয়েছে।

টোকলাই এ চায়না শংকর (China hybrid) হিসেবে পরিচিত চা গাছগুলোকে 'টোকলাই Stock 14' বলা হয়। এ গাছগুলোকে জানার আগে আর একটি গাছ সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। এ গাছটি টোকলাই এ 'Wilson's Camellia' হিসেবে পরিচিত, পরবর্তীতে যার উদ্ভিদতাত্ত্বিক নাম দেয়া হয় *Camellia irrawadiensis* (P. K. Barua)। বর্মা মিলিটারি ফোর্সের অ্যাসিস্টেন্ট কমান্ডেন্ট এল. ও. উইলসন কর্তৃক ১৯১৭ সালে আপার বার্মা (বর্তমান মায়ানমার) থেকে এ গাছটি সংগৃহীত হয়। জানা যায়, সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ২৩২৫-২৬৫৭ মিটার (৭০০০-৮০০০ ফুট) উঁচুতে ২৬°- ২৭° উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯৮°-৯৯° পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত ইরাবতি উপত্যকার বনাঞ্চল থেকে তিনি গাছগুলোকে সংগ্রহ করেছিলেন।

উইলসনের বর্ণনা থেকে জানা যায়, যে গাছ থেকে তিনি বীজ সংগ্রহ করেছিলেন তা ছিল চা গাছ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। তবে জাতটি Theifera, তাই উইলসন একে ভিন্ন একটি *Camellia* প্রজাতি হিসেবে উল্লেখ করেন। টোকলাইতে সে সময় কর্মরত ছত্রাকতত্ত্ববিদ মি. এ.সি. টানস্টল কর্তৃক আসল বীজ থেকে উৎপাদিত বহুসংখ্যক সদৃশ উদ্ভিদের মধ্যে মাত্র একটি এখনও টিকে আছে। ১৯৫৬ সালে P.K. Barua এ গাছটির বর্ণনা দেন এবং ১৯৫৮ সালে Scaly "A Revision of the genus *Camellia*" নামক প্রবন্ধে গাছটি সম্পর্কে আলোকপাত করেন যা The Royal Horticultural Society, London কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

গাছটির উল্লেখযোগ্য কিছু বৈশিষ্ট্য

ক) ফুলের গঠন

একবছর বয়সী শাখার পাতার কক্ষে জন্মানো ব্রাক্টের কক্ষে সাধারণত ১-২টি ফুল উৎপন্ন হয়, তবে অগ্রমুকুলে আরও বেশি ফুল ধরতে পারে। ডিসেম্বর থেকে মার্চ মাস হচ্ছে পুষ্পায়নের সময়। কিন্তু আসল চা গাছে

পুষ্পায়ন ঘটে নভেম্বর এবং ডিসেম্বর মাসে। পুষ্পবৃন্ত (pedicel) চা গাছের চেয়ে অনেক দৃঢ়, উপরের অংশটি অনেক প্রশস্ত। চারটি উপ-পত্র (bracteole) থাকে, যা শীঘ্রই ঝরে পড়ে। বৃতি ৫টি স্থায়ী, বাইরের বৃতিটি সবচেয়ে ক্ষুদ্র। দল সাধারণত ৯টি থাকে। পোর্সেলিন (procelain) সাদা, কখনও গোলাপি আভাযুক্ত (rosy pink tint)। পুংকেশর অসংখ্য। গর্ভদণ্ড সোজা, উপরের দিকে ৪–৫টি বাহুতে বিভক্ত হয়ে মাথায় এমনভাবে যুক্ত হয় মনে হয় প্যাকযুক্ত একটি চাকা। গর্ভাশয় সিল্ভার আকৃতি, সাধারণত গর্ভদণ্ডের বাহুর সমানসংখ্যক এবং ঘন লোমে আচ্ছাদিত। ফলের মধ্যে ৪–৫টি বীজ থাকে। সর্বোচ্চ ৯টি বীজ পর্যন্ত থাকতে পারে। যা চাপ্টা।

চা ফুলের বিভিন্ন অংশ

খ) অঙ্গজ বৈশিষ্ট্য

উপমহাদেশীয় আবহাওয়ায় এটি প্রায় ৬ মিটার উঁচু একটি ঝোপালো উদ্ভিদ। মাটির কাছাকাছি অসংখ্য শাখা-প্রশাখায় পরিণত হয়। দুর্বল শাখা-প্রশাখা পূর্ণতা পাওয়ার পরে আগা থেকে মরতে থাকে এবং গোড়ার দিকে নতুন শাখা প্রশাখা জন্মায়। পাতাগুলো একান্তর (alternate), চকচকে, মসৃণ। কচি পাতাগুলো নরম, অনেকটা ইটবর্ণ। পত্রফলকে ছোট ছোট স্বচ্ছ বিন্দু (dots) থাকে যা আলোপ্রভ, ম্যাগনিফাইং গ্লাসের সাহায্যে আলোতে ধরলে বিন্দুগুলো দেখা যায়। এ বৈশিষ্ট্য *Camellia* গণের *Thea* অংশের এ উদ্ভিদটির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। চা উদ্ভিদে এরকম আলোপ্রভ স্বচ্ছ দাগ থাকে না। পত্রফলকের অভ্যন্তরে স্ক্লেরাইডের উপস্থিতির কারণে এসকল দাগ সৃষ্টি হয়।

গ) স্ক্লেরাইডের গঠন

প্রকৃত 'চা' উদ্ভিদে বিদ্যমান স্ক্লেরাইডের (sclereid) গঠনের সাথে *C. irrawadiensis* উদ্ভিদের স্ক্লেরাইডের গঠন সম্পূর্ণ ভিন্ন। একটি আদর্শ স্ক্লেরাইড গাঢ়, লম্বাকৃতি, কিছুটা শাখান্বিত, নিচের দিকে থাবার মত প্রসারিত এবং সচরাচর উপরের দিকে থলার মতো থাকে। থালার মত অংশটি পাতার উর্ধ্বত্বকের কাছে অবস্থান করে এবং লম্বা দেহটি পাতার প্যালিসেড কোষের সাথে সমান্তরালে বিন্যস্ত থাকে।

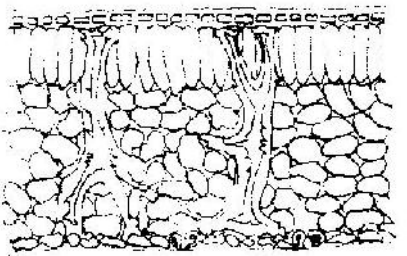

পাতার অভ্যন্তরে স্ক্লেরাইডের অবস্থান

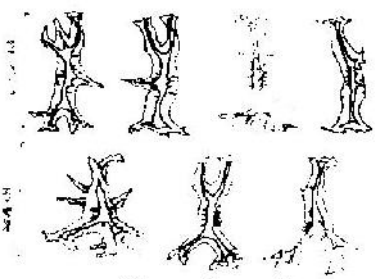

বিভিন্ন আকৃতির স্ক্লেরাইড

ঘ) রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য

রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যে চা গাছের সাথে *C. irrawadiensis* এর পার্থক্য আছে Roberts *et al* (1958) ক্রোমাটোগ্রাফির সাহায্যে ফেনলজাতীয় একটি অজ্ঞাত বস্তুর সন্ধান পান। যাকে তিনি 'A' হিসেবে চিহ্নিত করেন এ উপাদানটি তিনপ্রকার চা গাছের কোনটিতেই থাকেনা। *C. irrawadiensis* উদ্ভিদে ক্যাফেইন অনুপস্থিত

ঙ) পত্রফলকে স্ক্লেরাইডের উপস্থিতি

কিছু *Camellia* প্রজাতির পত্রফলকে স্ক্লেরাইডের উপস্থিতি এবং বিন্যাসের আলোকে তাদেরকে শ্রেণীবিন্যাস করা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, *C. sasanqua* (ক্যামেলিয়া শশাঙ্ক) প্রজাতিটির পত্রফলকের কিনারার দিকেই স্ক্লেরাইডের উপস্থিতি দেখা যায় কিন্তু *C. irrawadiensis* প্রজাতির উদ্ভিদে সমস্ত পত্রফলকব্যাপী স্ক্লেরাইড ইতস্তত ছড়ানো থাকে.

কিংডন – ওয়ার্ডের ক্যামেলিয়া

বার্মার (বর্তমান মায়ানমার) ভিক্টোরিয়া পর্বতের ১৯৮০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত ২১° উত্তর অক্ষাংশে এবং ৯৪° পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত কানপেটলেট (Kanpetlet) নামক অঞ্চল থেকে ১৯৫৬ সালে ক্যাপ্টেন কিংডন–ওয়ার্ড একটি *Camellia*

উদ্ভিদ সংগ্রহ করেন। সেখানে বেশ কিছু চা গাছের আবাদ ছিল। ধারণা করা হয় এ চা গাছগুলো বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে শানরাজ্য (Shan States) থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল। এর গর্ভমুণ্ড এবং পুংকেশরগুলো *C. irrawadiensis* এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। ফুলগুলো চা গাছের মতই ছোট ছোট এবং পাতা আসাম জাতের চায়ের মত।

১৯৫৮ সালে Wood এবং Barua দেখান যে, *C. irrawadiensis* এবং শানরাজ্যের *Camellia* উদ্ভিদের মধ্যে শংকরায়নের মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রথম জনুর গাছগুলোতে স্কেরাইড এবং রাসায়নিক উপাদানসমূহের পরিমাণ দুটি মাতৃউদ্ভিদের মাঝামাঝি। এদের একটি উদ্ভিদের সাথে চায়ের ব্যাকক্রসের মাধ্যমে প্রাপ্ত গাছগুলোতে স্কেরাইডের পরিমাণ *C. irrawadiensis* এর মত এবং রাসায়নিক উপাদান চা গাছের মতোই ছিল। এ থেকে বুঝা যায় যে, *C. irrawadiensis* থেকে আসা স্কেরাইড চায়ের রাসায়নিক গুণাগুণে তেমন কোন প্রভাব ফেলেনা।

শারীরবৃত্তীয়, অন্তঃঅঙ্গসংস্থানিক এবং জৈব রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যসমূহ বিবেচনায় উইলসনের *Camellia* প্রজাতিটি চা থেকে ভিন্ন এবং সংগতকারণেই নামও ভিন্ন *(Camellia irrawadiensis)*। স্কেরাইডের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যছাড়াও একটি বিশেষ রাসায়নিক যৌগের উপস্থিতি এ বৃক্ষের অনন্য বৈশিষ্ট্য। সে রাসায়নিক যৌগটিকে এখনও সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি বিধায় যৌগটিকে 'A' দ্বারা প্রকাশ করা হয়। প্রকৃত চা উদ্ভিদে এ যৌগটি অনুপস্থিত। প্রকৃত চা উদ্ভিদে ট্রাইগ্লাইকোসাইড হিসেবে স্কেরাইডের উপস্থিতি রয়েছে এবং একটি অজ্ঞাত ফেনল যৌগ (IC) থাকে।

যে সকল চা গাছকে আসাম এবং চায়না জাতের চায়ের মধ্যে ক্রসের মাধ্যমে প্রাপ্ত বলে মনে করা হয়, তাদের মধ্যে স্কেরাইডের বৈশিষ্ট্য বিচারে এসকল উদ্ভিদের চারটি পূর্বপুরুষ রয়েছে বলে মনে করা যুক্তিসংগত। এ সকল পূর্বপুরুষ হল আসাম, চায়না, দক্ষিণীজাত এবং *C. irrawadiensis*। উপসংহারে বলা যায় যে সকল চা গাছ মূলত চীন থেকে ভারতে নিয়ে আসা হয়, তারা আসলে শংকর-প্রজাতি (Species hybrids)। এদের ফুলের গঠন থেকে ধারণা করা হয়, *Camellia* গণের বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে বিভিন্ন সময় ক্রসের মাধ্যমে এদের আবির্ভাব ঘটেছে। এ সকল উদ্ভিদ বর্তমানে শুধুমাত্র উত্তর-পূর্ব ভারতের দার্জিলিং জেলায় জন্মায় এবং তা থেকে জেলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যযুক্ত 'দার্জিলিং চা' পাওয়া যায়।

চা-গাছের বৈজ্ঞানিক নামের উৎপত্তি

Kaemfer (১৭১২) সর্বপ্রথম 'Thea' নামক গণের অন্তর্ভুক্ত উদ্ভিদ হিসেবে চা গাছের বিস্তারিত বর্ণনা দেন। 'Thea' নামটি একটি ল্যাটিনকৃত চৈনিক নাম

এবং একইভাবে তা জাপানি নামও বটে। উদ্ভিদ শ্রেণিবিন্যাসের জনক ক্যারেলাস লিনিয়াস (১৭৫৩) তাঁর 'Species Plantarum' নামক বইয়ে চা-গাছের বৈজ্ঞানিক নাম দেন *Thea sinensis*. একই বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি শোভাবর্ধক চায়ের আরেকটি জাতকে *Camellia japonica* নামে অভিহিত করেন. George Joseph Kamel (1661 – 1707) নামক ফিলিপাইনে কর্মরত একজন জার্মান মিশনারির নামানুসারে Camellia নামটি দেয়া হয়, কেননা বৃক্ষটি সম্পর্কে তিনি বর্ণনা দিয়েছিলেন পরবর্তীতে Robert Sweet (1818) *'Thea'* এবং *Camellia* গণ নাম দুটিকে একত্রিত করে *'Camellia'* নামকরণ করেন। ১৯৩৫ সালে আমস্টারডামে অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ আন্তর্জাতিক বোটানিক্যাল কংগ্রেসে *'Camellia'* নামটি চায়ের গণ (Genus) নাম হিসাবে গৃহীত হয়।

পরবর্তীতে Sealy (1958) Zuvi 'A Revision of the Genus *Camellia* নামক প্রবন্ধে *'Camellia'* গণের অধীনে ৮০টি প্রজাতিকে অন্তর্ভুক্ত করেন। ফুলের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে এ প্রজাতিগুলোকে ১২টি দলে ভাগ করা হয়। সে অনুযায়ী চা বৃক্ষটি [*Camellia sinensis*] 'Thea' দলভুক্ত। এ দলের অন্যান্য প্রজাতিগুলো হচ্ছে *C. irrawadiensis*, *C. taliensis*, *C. gracilipes* এবং *C. pubicosta*. শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্য এবং রাসায়নিক উপাদান বিবেচনায় প্রথমোক্ত দুটি প্রজাতি চায়ের সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্কযুক্ত।

যেহেতু এ অধ্যায়ে প্রজাতি (species) নিয়ে লেখা হচ্ছে তাই এখানে প্রজাতির গ্রহণযোগ্য ইংরেজি ও বাংলা দুটো সংজ্ঞাই উল্লেখ আবশ্যক মনে করা যাচ্ছে –

Species: Species are a group of interbreeding natural population that are reproductively isolated from other such group.

প্রজাতি : প্রজাতি হচ্ছে আন্তঃপ্রজননশীল একদল জীব যারা একইরূপ আরেকদল জীব থেকে বংশগতভাবে পৃথক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন।

চায়ের আবাদকৃত প্রকরণ সম্পর্কে বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন সময়ে বর্ণনা দিয়েছেন, যেমন – Watt (1908), Vavilov (1926), Baildon (1877), Cohen Stuart (1918), Kingdon-Ward (1950), Federov (1960), Purseglove (1963)। কিন্তু আদি এবং অকৃত্রিম বন্য চা প্রজাতি, যা থেকে আবাদকৃত ভিন্ন অঙ্গসংস্থানিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত প্রজাতিগুলোর উৎপত্তি হয়েছে, তার বিলুপ্তির কারণে চা গাছের প্রকৃত উৎপত্তিস্থল সম্পর্কে অদ্যাবধি সংশয় রয়ে গেছে। ফলে এ সম্পর্কে বিভিন্ন লেখক এবং গবেষকের বিভিন্ন মতামত লক্ষণীয়।

Vavilov (1926) এর মতে চীনের কেন্দ্রস্থলই চায়ের উৎপত্তি স্থান (centre of

origin)। তিনি আরও মনে করেন এ স্থানটিই পৃথিবীর আদি এবং বৃহত্তম কৃষিকেন্দ্র, যা থেকে স্বাধীনভাবে বিপুলসংখ্যক আবাদি উদ্ভিদের বিস্তার ঘটে

Baildon (1877) এর মতে, চায়ের আদি নিবাস হচ্ছে ভারত এবং পরবর্তীতে চা চীনদেশে বিস্তার লাভ করে। তাঁর মতে আসামের পরিচিত এবং অনুকূল আবহাওয়ায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত চা গাছগুলো চীনদেশের প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে খর্বকায় আকৃতি লাভ করেছে।

যদিও শ্রেণিবিন্যাস ও অঙ্গসংস্থানের বিভিন্ন দিক বইটির কোথাও কোথাও উল্লেখ করা হয়েছে, তবুও এখানে সংক্ষিপ্তাকারে পুনাবৃত্তির আবশ্যকতা মনে করছি।

শ্রেণিবিন্যাস : Family : *Camelliacea*
Genus : *Camellia*
Species : *i. C. assamica*
ii. C. chinensis
iii. C. assamica lasiscalyx

প্রজাতিগুলো তিনটি জাত (jat) থেকে উদ্ভূত, আসাম চায়না এবং হাইব্রিড (ইন্দো-চায়না/ক্যাম্বো৬)

অঙ্গসংস্থান

প্রকৃতি	–	চিরসবুজ বৃক্ষ
পাতা	–	সরল, একান্তর, দাঁতযুক্ত (serrate)
ফুল	–	উভলিঙ্গ, সম্পূর্ণ
বৃত্যংশ	–	পাঁচটি
দলাংশ	–	পাঁচটি
পুংকেশর	–	অসংখ্য, পরাগধানী দ্বিকোষী
গর্ভাশয়	–	অধিগর্ভ, ২ – ৪ প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট
গর্ভাশয় সংখ্যা	–	২–৪টি, একক প্রায় বিরল, গর্ভাশয়ের প্রকোষ্ঠসমূহ কেন্দ্রীয় অক্ষের চারপাশে থাকে।
ফল	–	ক্যাপসুল
বীজ	–	স্বল্পায়ু, শুকালে কার্যকারিতা থাকে না
কোমোসোম	–	ত্রিপ্লয়েড, 2n = 30

শংকরায়ন কৌশল-পর-পরাগায়ন, স্ব-পরাগায়ন সার্থক হয় না। স্ব-পরাগায়নের সাফল্য মাত্র ৬–৪০%, আসাম জাতে সর্বনিম্ন এবং চায়না জাতে সর্বোচ্চ অন্তঃপ্রজাতি শংকরায়ন অসুবিধেজনক, কারণ এতে নতুন সৃষ্ট গাছগুলোর জীবনাশক্তি এবং গুণাগুণ হ্রাস পায়

তৃতীয় অধ্যায়

চা গবেষণার সূচনা

(Beginning of researches on tea)

১৮৯১ সালে ইন্ডিয়ান টি এসোসিয়েশন (ITA) এবং বেঙ্গল কৃষি ও উদ্যানতত্ত্ব সোসাইটি এর যৌথ কমিটি মি. এম. কেলওয়ে বোম্বার কে (Mr. M. Kelway Bomber) রসায়নবিদ হিসাবে নিয়োগদান করে। এ নিয়োগের সাথে সাথে সাংগঠনিকভাবে চা গবেষণার সূত্রপাত হয়। সে থেকে চা-শিল্পের উন্নয়নে সকল গুরুত্বপূর্ণ অবদানের পেছনে অগ্রদূত বিজ্ঞানীদের ভূমিকা চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে যারা চরম প্রতিকূলতার মাঝেও ব্যক্তিগতভাবে বিরাট অবদান রেখে গেছেন। চায়ের গুণগতমানের উপর রসায়নের ভিত্তি জানার জন্য মি. বোম্বার চায়ের রসায়ন, মাটি এবং সার নিয়ে গবেষণা করা শুরু করলেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও ১৮৯৩ সালে বোম্বার চাকরি ছেড়ে চলে গেলেন। তবে তাঁর গবেষণালব্ধ জ্ঞান ১৮৯৩ সালে প্রকাশিত তাঁর "The Chemistry and Agriculture of Tea Including Growth and Manufacture" নামক বই থেকে তা জানা যায়। তাঁর বিদায়ের পর ভরত সরকার Indian Tea Association (ITA) তে একজন কীটতত্ত্ববিদ নিয়োগ দেয়া হয়, যার নাম ড. জর্জ ওয়াট। তাঁর প্রাথমিক কাজ ছিল চা এর পচন (Blight) রোগ সম্পর্কে গবেষণা এবং চা এর বালাই-নাশক হিসেবে বাসক *(Adhatoda vasica)* উদ্ভিদের কার্যকারিতা সম্পর্কে জানা। ড. ওয়াট ১৮৯৫ সালের ১২ মার্চ থেকে ২৫ জুলাই পর্যন্ত নাগা পাহাড় এবং নেম্বার (Namber) জঙ্গলসহ আসাম ভ্যালির বহু চা বাগান এলাকা পরিদর্শন করেন পরিদর্শন শেষে ড. ওয়াট এ সিদ্ধান্তে আসেন যে, চা-বাগানসংশ্লিষ্ট প্ল্যান্টার্সগণের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় অনেকগুলো দীর্ঘমেয়াদি গবেষণা চালিয়েই শুধুমাত্র অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব। তাঁর গবেষণালব্ধ তথ্য তিনি ১৮৯৮ সালে প্রকাশিত তাঁর "The Pests and Blight of the Tea Plant" নামক বইয়ে লিপিবদ্ধ

করেন। এখানে উল্লেখ করলে অত্যুক্তি হবে না যে, Blight বলতে আসলে হেলোপেলটিস বা চায়ের মশার আক্রমণকে বুঝিয়েছেন।

তাঁর পরিদর্শনকালে ড. ওয়াট চা বাগান কর্তৃপক্ষকে চা চাষ এবং চায়ের বালাই ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বুঝাতে সক্ষম হন। তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল বিশাল যেমন প্রুনিং, প্লাকিং, ড্রেনেজ, ম্যানিউরিং এবং এমনকি পাইপের সাহায্যে ড্রেইনেজ সম্পর্কে তিনি দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন। ড. ওয়াটের রিপোর্টের ভিত্তিতে ITA চা-এর রসায়ন, চাষাবাদ এবং চা তৈরির ক্ষেত্রে গবেষণার জন্য একজন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা নিয়োগের প্রস্তাব দেয়। ওয়াটের সুপারিশ ছিল নিম্নরূপ-

১) চা চাষাবাদে আবহাওয়ার উপাদান যেমন– জলবায়ু, আর্দ্রতা এবং মৃত্তিকা, ভূমিরূপ, ছায়া, জঙ্গলের অবস্থান ইত্যাদির প্রভাব সম্পর্কে গবেষণা করতে হবে।

২) রোগ প্রতিরোধ, সারের প্রয়োজনীয়তা, ফলন এবং গুণগতমান বৃদ্ধির আলোকে চায়ের রাসায়নিক দিক নিয়ে গবেষণা করতে হবে।

৩) চা তৈরি করার সকল ধাপ এবং মাঠ পর্যায়ে অনুসৃত কার্যক্রম সম্পর্কে গবেষণা করতে হবে।

এ উদ্দেশ্যে ড. ওয়াট বোটানি এবং কেমিস্ট্রিতে পারদর্শী, প্রতিভাবান বিজ্ঞানী নিয়োগের পাশাপাশি স্থানীয় গবেষণাগারে এবং কোলকাতা মিউজিয়ামের কেন্দ্রীয় গবেষণাগারে তাঁদেরকে কাজ করার সুযোগ দেয়ার জন্য সুপারিশ করেন। তবে প্রস্তাবটি দ্রুত বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি আর্থিক সংস্থানের অভাবে। ১৮৯৯ সালে আসাম এবং বেঙ্গল সরকারের আর্থিক সহায়তায় ITA ড. হ্যারল্ড এইচ. ম্যানকে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগদান করে। তিনি ১৯০০ সালে কাজে যোগদান করেন এবং তাঁর যোগদানের মাধ্যমে উত্তর-পূর্ব ভারতে এক নবযুগের সূচনা হয়।

ড. ম্যান কোলকাতা মিউজিয়ামের 'Government Reporter on Economic Products' এর গবেষণাগারে কাজ শুরু করেন। সেখানে তিনি গবেষণার অনুকূল অনেক সুযোগ সুবিধার পাশাপাশি সরকারি বিশেষজ্ঞ অফিসারদের সহায়তা পান। তাছাড়া এজেন্সি হাউসগুলো নিকটেই ছিল এবং চা-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করাও খুব সহজ ছিল।

তাঁর কাজে এজেন্সি হাউসসমূহ এবং চা-বাগানসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এতটাই মুগ্ধ হন যে, চা গবেষণা সম্প্রসারণে তারা এগিয়ে আসেন। ১৯০২ সালে ITA এর সুপারিশের ভিত্তিতে কোলকাতা গবেষণাগারকে সদর দফতর রেখে ড. ম্যান গবেষণা সম্প্রসারণের জন্য একটি প্রকল্প প্রস্তাব করেন। চা উৎপাদনকারী জেলাসমূহের কেন্দ্রে তিনি একটি পরীক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের সুপারিশ করেন।

হতে পারে জোড়হাটে (jorhat) বা তার কাছাকাছি কোথাও। কেননা এ স্থাপনাটিতে রেল এবং নদীপথে সহজেই যাওয়া যেত। কেন্দ্রটি হবে আমেরিকান পরীক্ষণ স্টেশনগুলোর মত। যা হবে ২০ হেক্টর জায়গাজুড়ে যাতে কিনা প্রুনিং, প্লাকিং, ম্যানুরিং প্লানটিং প্রতিটি ক্ষেত্রে পরীক্ষণ চালানো সম্ভব হয়। এটি একটি চা কারখানার নিকটে হবে এবং এতে একজন অফিসার বা কর্মকর্তা কর্মরত থাকবেন যিনি প্রাথমিকভাবে হবেন একজন কৃষিতত্ত্ববিদ এবং রসায়নবিদ। পরবর্তীতে একজন ছত্রাকতত্ত্ববিদ এবং একজন কীটতত্ত্ববিদ নিয়োগের মাধ্যমে প্রকল্পটি সম্পূর্ণতা পায়। ভারত, বেঙ্গল এবং আসাম সরকারের আর্থিক সহায়তায় এবং বিভিন্ন প্ল্যান্টার্স এসোসিয়েশনের বদান্যতায় ১৯০৪ সালে জোড়হাট শহর থেকে প্রায় ৩০ কি.মি দক্ষিণে হিলিকা চা বাগানে (Heeleakah T.E.) একটি কেন্দ্র স্থাপিত হয় এবং এটির দায়িত্ব পান মি. ক্লড হাচিনসন।

স্কটিশ আসাম টি কোম্পানি কেন্দ্রটির সম্প্রসারণে একটি বাংলো, কিছু পুরাতন চা-বাগান এলাকা এবং জমি দিয়ে সহায়তা করে। ১৯০৫ সালের দিকে কেন্দ্রটি ১৩ হেক্টর জমি নিয়ে নিম্নলিখিত পরীক্ষণসমূহ শুরু করে –

১. গুণগতমান এবং ফলনের উপর সার প্রয়োগ পদ্ধতির ভূমিকা।
২. সবুজ সার প্রয়োগ।
৩. প্রুনিং এবং প্লাকিং পদ্ধতি।

একটি রাসায়নিক গবেষণাগারও শুরু করা হয়। অন্যান্য পরীক্ষণসমূহের মধ্যে ছিল গাঁজন প্রক্রিয়া (fermentation) এবং চায়ের গুণাগুণ, চায়ের মশাজনিত ব্লাইট (তখনকার সময়ে চায়ে মশার আক্রমণের কারণে ক্ষতকে ব্লাইট বলা হত) এবং রেডরাস্ট রোগের উপর তাপমাত্রার প্রভাব পরীক্ষণসমূহের ফলাফল থেকে জানা যায় যে, ধইঞ্চা দ্বারা সবুজ সারের ব্যবস্থা করা যায়, প্রতিহেক্টর জমিতে ৪৪৮কেজি খৈল প্রয়োগ করাই যথেষ্ট এবং সার প্রয়োগের ফলে চায়ের গুণগতমানের উপর কোন প্রভাব পড়ে না।

ড. ম্যান উত্তর পূর্ব ভারতের চা মৃত্তিকা পরীক্ষা করেন। তিনি লক্ষ্য করেন কিছু কিছু এলাকায় জলাবদ্ধতার কারণে অণুজীবের কার্যক্রমে বিঘ্নঘটে এবং ফলে গাছগুলো পুষ্টিহীনতায় ভোগে। তাই তিনি সুষ্ঠু পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উপর জোর দেন। তিনি দেখেন যে, চা গাছ অম্ল মাটিতে ভাল হয় এবং মাটিতে চুন প্রয়োগের ফলে ফলনের ক্ষতি হয় না। খৈল এবং গোবরজাতীয় সার চায়ের জন্য ভাল।

গাঁজনের (fermentation) উপর তাঁর গবেষণা থেকে তিনি উল্লেখ করেন যে, ৭৭-৮২ ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রায় উৎপন্ন চা সর্বোৎকৃষ্ট মানের হয়। তিনি

দেখতে পান যে, ৩ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে গাঁজনের ফলে চায়ের সুগন্ধ নষ্ট হয় এবং খুব দ্রুত উইদারিং বা ২৪ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে উইদারিং এর ফলে চায়ের গুণগতমান কমে যায়। তিনি চায়ের কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান পরিমাপের জন্য একটি রাসায়নিক পদ্ধতিও আবিষ্কার করেন।

কাছাড় জেলার কান্নিকুরিতে আরেকটি গবেষণাগার স্থাপন করা হয় এবং সেখানে মি. সি. বি. অ্যান্ট্রাম কীটতত্ত্ববিদ হিসেবে ১৯০৬ সালে যোগদান করেন। তিনি চায়ের তিনটি মারাত্মক বালাইয়ের উপর দ্রুত কাজ শুরু করেন। মি. হাচিনসনের নিয়োগের ফলে ড. ম্যান মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হন কিন্তু ১৯০৭ সালে তিনি চলে গেলেন এবং হাচিনসন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ড. ম্যান এবং তাঁর সহকর্মীদের কাজগুলো ৩৪টি পুস্তিকা এবং রিপোর্টের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। তাছাড়া ড. ম্যান এবং ওয়াট ১৯০৩ সালে বালাই এবং ব্লাইটের উপর ড. ওয়াটের বইয়ের অংশবিশেষ সরেজমিনে লিখেছিলেন।

১৯০৭ সালে ড. জি.ডি. হোপ মি. হাচিনসনের স্থলাভিষিক্ত হন। ১৯০৯ সালে মি. হাচিনসন স্বাস্থ্যগত কারণে অবসরে চলে যান এবং হিলিয়াকাতে তখন সি.এস.ও হিসাবে ড. হোপ ছাড়াও সহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসাবে মি. পি. এইচ. কার্পেন্টার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এ সময়ে চা গবেষণা অত্যন্ত উঁচুস্তরে পৌঁছয় এবং বলা যেতে পারে এ দশকটিতে চা মৃত্তিকার কৃষি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির ভিত রচিত হয়। তাছাড়া প্রধান প্রধান বালাই, রোগব্যাধি এবং চা প্রক্রিয়াকরণের উপর অনেক কাজ হয়।

এ দশকের শেষে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা চা উৎপাদনকারী প্ল্যান্টার্সগণের মাঝে বিতরণের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। এ উদ্দেশ্যে কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন স্থানে পরিদর্শনকালে বক্তৃতা দিতেন।

হিলিয়াকা কেন্দ্রটি চালানো ITA এর পক্ষে দুষ্কর হয়ে পড়ে কারণ প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রমিক পাওয়া যাচ্ছিল না। এ অবস্থায় গবেষণা কাজ চালিয়ে নেয়ার জন্য অন্য কোন স্থানের সন্ধান করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। কাজেই হিলিয়াকা কেন্দ্র থেকে ১৯১০ সালে সর্বশেষ কাজের বৃত্তান্ত একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল।

টোকলাই পরীক্ষণ কেন্দ্র (Tocklai Experimental Station)

জোড়হাট টি কোম্পানি কর্তৃক ১৯১১ সালে প্রদত্ত টোকলাই নামক স্থানে একটি গবেষণাগার এবং দুটি বাংলো নির্মাণ করা হয়। একই বছর ডিসেম্বর মাসে মি. এ.সি. টানস্টাল নামে একজন ছত্রাকতত্ত্ববিদ এবং মি. সি. এ. এন্ড্রুজ নামে

একজন কীটতত্ত্ববিদ কেন্দ্রটিতে যোগদান করেন। হিলিয়াকাতে সহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত মি.পি.এইচ.কার্পেন্টারও টোকলাইএ আবাসন গ্রহণ করেন। তাঁর আগমন এবং কীটতত্ত্ববিদ মি. অ্যানড্রুমের পদত্যাগের ফলে দুটি কেন্দ্র একীভূত হবার পথকে সুগম করে। চা-শিল্পের সাথে ব্যয় নির্বাহের ব্যাপারে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় আসাম এবং বেঙ্গল সরকার। ফলে টোকলাই পরীক্ষা কেন্দ্রটি স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলে। দুটি রাজ্য সরকারের সাথে ভারত সরকারও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অনুদান প্রদান করে যা পরবর্তীতে ১৯১১ সাল থেকে রেকারিং গ্রান্ট হিসেবে চালু হয় এবং এভাবেই টোকলাই পরীক্ষণ কেন্দ্রটি কাজ শুরু করে।

১৯১২ সালে মি.এইচ.আর.কুপার দ্বিতীয় সহকারী বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেন। সরকারের নিকট থেকে ৫০ একর জমি অধিগ্রহণ করে টোকলাইতে একটি পরীক্ষণ চা বাগান প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং পরবর্তীতে বাগানটির পরিধি আরও কিছুটা বৃদ্ধি পায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় দুজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে অংশ নেয়াতে টোকলাই গবেষণাগারের কাজে বিঘ্ন ঘটে। তারা যুদ্ধের পরে ১৯১৯ সালে আবার টোকলাই এ যোগদান করেন। এ সময় বরভেটার (Borbhetta) পরীক্ষণ কৃষি খামারের কাজ তদারকি করতেন মি. এ.সি.টানস্ট্যাল। একইসাথে মি. টানস্ট্যাল বিভিন্ন স্থান থেকে বীজ সংগ্রহ করে একটি উদ্ভিদতাত্ত্বিক প্লট তৈরি করেন যা পরে টিভি সহ বহু কাল্টিভারের উৎস হিসেবে ভূমিকা রাখে।

১৯১৯ সালে টোকলাই আবহাওয়ার ডাটা সংরক্ষণ করা শুরু করে। স্বাস্থ্যগত কারণে ড. জি. ডি. হোপ দায়িত্ব ছেড়ে দেয়ায় ১৯১৯ সালে মি. পি. এইচ. কার্পেন্টার মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব নেন। একই বছর মি. কার্পেন্টারকে টোকলাই এর সম্প্রসারণ এবং উন্নয়নের জন্য দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি টোকলাই এর ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি ক্রমান্বয়ে টেকনিক্যাল স্টাফ নিয়োগের জন্য সুপারিশ করেন। তিনি একজন করে রসায়নবিদ, ব্যাকটেরিওলজিস্ট, প্রাণরসায়নবিদ, উদ্ভিদবিদ এবং কৃষিবিদের প্রয়োজন তুলে ধরেন। তাছাড়া ১২০০০ হেক্টর জমি চা-চাষের আওতায় আসে এমন প্রতিটি জেলায় একজন আবাসিক জেলা অ্যাডভাইজরি অফিসার নিয়োগেরও সুপারিশ করেন। তাঁর পরামর্শ গৃহীত হয় এবং তা ধাপে ধাপে বাস্তবায়িত হয়।

১৯২০ সালে মি. সি. আর হারলারকে দ্বিতীয় রসায়নবিদ হিসাবে নিয়োগদান করা হয়। মি. এইচ.এইচ. উইলস ১৯২১ সালে কৃষিবিদ হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৯২৫ সালে চলে যান। ১৯২৪ সালে মি. সি.জে. হ্যারিসন তৃতীয় রসায়নবিদ

হিসেবে যোগদান করেন। ১৯২৫ সালে মি. এস.এফ.বেন্টন ব্যাকটেরিয়াবিদ হিসেবে যোগদান করেন। ১৯২৫ সালেই মি. হারলারকে ডুয়ার্স এ একটি অস্থায়ী উপকেন্দ্রের দায়িত্বে পাঠানো হয় তবে উপকেন্দ্রটি কয়েক বছর পরেই বন্ধ হয়ে যায়।

ITA ১৯২৭ সালে পুনাতে (Poona) কৃষি বিভাগের পরিচালক হিসেবে কর্মরত মি. ড.এইচ.এইচ. ম্যানকে টোকলাই পরিদর্শন করে এর কার্যক্রম এবং উন্নয়নের জন্য একটি রিপোর্ট দেয়ার জন্য অনুরোধ জানায়। তাঁর পরিদর্শন রিপোর্টে মি. কার্পেন্টারের গৃহীত কর্মকৌশলকে জোরদারভাবে সমর্থন জানানো হয়।

১৯২০ সালে ভৌত অবকাঠামোর আরও উন্নয়ন করা হয় এবং একটি কীটতত্ত্ব ল্যাবরেটরি ও চারটি বাংলো তৈরি করা হয়। দু'বছর পরে মাইকোলজিক্যাল এবং ব্যাকটেরিওলজিক্যাল ল্যাবরেটরিও স্থাপিত হয়। ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়নের ভিত্তিতে ১৯২২ সাল থেকে প্ল্যান্টার্সগণের জন্য বক্তৃতাপর্বের আয়োজন করা শুরু হয়। ১৯২৬ সালে চা কারখানা এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র তৈরি হয় এবং বৈদ্যুতিক সংযোগ স্থাপিত হয়। ১৯২৯ সালে গেস্ট হাউস এবং আরেকটি বাংলো তৈরি হয়।

১৯৩০ সালে এম্পায়ার (Empire) মার্কেটিং বোর্ড টোকলাইয়ে উদ্ভিদতাত্ত্বিক গবেষণার অর্ধেক খরচ বহন করার প্রস্তাব দেয়। এ বছর নতুন ল্যাবরেটরি এবং একটি বাংলো তৈরি হয়। একই বছর উদ্ভিদতত্ত্ববিদ হিসেবে ড. ডব্লিউ ওয়াইট যোগদান করেন।

একই বছর 'Green shoot cutting' এর সাহায্যে চায়ের বংশবিস্তার ঘটাতে সক্ষম হন মি. টানস্ট্যাল এ প্রক্রিয়াটি পরবর্তীতে চায়ের জন্য একটিমাত্র সহজ বংশবিস্তার প্রক্রিয়া উদ্ভাবনের দ্বার উন্মোচন করে এবং বর্তমানে চা সাম্রাজ্যে ক্লোন হিসেবে এর ব্যাপক প্রচলন ঘটেছে এ প্রসঙ্গে অঙ্গজ প্রজননের উৎস কাহিনি নিম্নে উল্লেখ করা হল -

যেভাবে অঙ্গজ প্রজননের শুরু

১৯৩০ সালের মে মাসের কোন একদিন কাছাড়ের পাথ্রি চা বাগানের (Pathini Tea Estate) ব্যবস্থাপক মি. এইচ. ক্লার্ক চা গাছের নিচে দুটি পাতা এবং একটি কুঁড়ির একটি গুচ্ছ দেখতে পান, যা সুন্দরভাবে বেড়ে উঠেছিল। তিনি এ গুচ্ছটি মাটি থেকে তুলে আনেন এবং দেখতে পান যে, মাটির নিচের অংশে মূল গজিয়েছে। তিনি এগুলোকে অন্য একটি স্থানে রোপণ করলেন এবং এগুলো দ্রুত পরিণত চারা গাছে রূপান্তরিত হল। তিনি বিষয়টি মি. এ. সি.

টিনস্টালকে জানালেন। মি. টানস্ট্যাল এ কথা শুনে কিছু শাখা কেটে মাটিতে রোপনের চেষ্টা করে সফল হলেন। এ ঘটনাটি একটি নতুন অধ্যায়ের জন্ম দিল যা 'অঙ্গজ প্রজনন' বা 'Vegetative propagation' নামে অদ্যাবধি চায়ে অনুশীলিত হয়ে আসছে।

নিয়ন্ত্রিত ইচ্ছেমতো অধিক ফলনের কারণে দরপতন ঘটায় ১৯৩১ সালে চা-শিল্পে আর্থিক সংকট দেখা দেয় এবং টোকলাই গবেষণাগার পরিচালনায় আর্থিক দিক কাটছাঁট করতে বাধ্য হয়। মি. হারলারসহ অনেককেই চাকরি ছেড়ে দিতে হয়। মি. হারলার চাকরি ছেড়ে দেয়ার পর ১৯৩৩ সালে "The Culture and Marketing of Tea" নামক একটি বই লেখেন।

আর্থিক সংকটের কারণে বহু চা-বাগান সার প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়। এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে টোকলাই এর বিজ্ঞানীরা সার না দিলে চা গাছের উপর কী প্রভাব পড়ে তার গবেষণা শুরু করেন। জানা গেল যে, সার না দেয়াতে উৎপাদন ১২৭৩ কেজি/হেক্টরে থেকে ১০৩১ কেজি/হেক্টরে নেমে আসে। কখনো সার দেয়া হয়নি এরকম প্লট থেকে সার দেয়া হয়েছে এমন প্লটে ১৩৪ কেজি/হেক্টর বেশি ছিল।

যাহোক, কয়েক বছরের মধ্যেই চা-শিল্প আর্থিক মন্দা কাটিয়ে ওঠে। ১৯৩৫-৩৬ সালে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর স্যার ফ্রাঙ্ক এল. ইংলেডো (Sir Frank L. Engladow) নেতৃত্বে একটি কমিশনকে নিয়োগ দেয়া হয়। তাঁদের কাজ ছিল টোকলাই এর সার্বিক কার্যক্রম মূল্যায়ন করে গবেষণার উন্নয়নে করণীয় সম্পর্কে মতামত দেয়া। অন্যান্য অনেক সুপারিশের মধ্যে এ কমিশনের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সুপারিশ ছিল নিম্নরূপ –

- লন্ডন অ্যাডভাইজরি কমিটি গঠনে যাতে ITA এর প্রতিনিধিসহ বিজ্ঞানের কতিপয় শাখার প্রতিনিধি থাকবেন
- তৈরি চায়ের রসায়ন সম্পর্কে লন্ডনে মৌলিক গবেষণা করা।
- জেলা অ্যাডভাইজরি সেবা খোলা।
- কতিপয় ক্ষেত্রে গবেষণার সম্প্রসারণ।
- চা উৎপাদনকারী দেশসমূহে মধ্যে কতিপয় গবেষণা কাজে সহযোগিতা

সুপারিশমালার ভিত্তিতে দ্রুত নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো নেয়া হয় -

- London Scientific Advisory Committee গঠিত হয়
- তৈরি চায়ের রসায়ন সম্পর্কে জানার জন্য যুক্তরাজ্যে একটি গবেষণাকেন্দ্র স্থাপিত হয়।

৩) চা উৎপাদনকারী (Planters) এবং বিজ্ঞানীদের নিয়ে বার্ষিক সম্মেলন শুরু হয়। ১৯৩৭ সালে প্রথম টোকলাই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

৪) চা-এর উপর বক্তৃতামালার সময়সীমা দুসপ্তাহের স্থলে তিন সপ্তাহ করা হয়

৫) ১৯৩৭ সালে তৃতীয় রসায়নবিদ হিসেবে ড. ই. এ. এইচ. রবার্টসকে নিয়োগ দেয়া হয় যিনি পরে বায়োকেমিস্ট হন। ১৯৩৯ সালে মেসার্স এফ. এস. মিচেল, ই. জে. উইন্টার এবং ড. ই. কে. উডফোর্ডকে অ্যাডভাইজরি অফিসার হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়।

১৯৩৮ সালে মি. এল. সি. কমরিকে কীটতত্ত্ববিদ হিসেবে নিয়োগদান করা হয় এবং ১৯৩৯ সালে মি.এন.এম. মেকগ্রেগরকে সিনিয়র অ্যাডভাইজরি অফিসার হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। এরফলে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডভাইজরি কেন্দ্র স্থাপন করা সুগম হয় এবং ডুয়ার্স, দার্জিলিং, সুরমা ভ্যালি এবং আসামে এসকল কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এর ফলে বিভিন্ন আবহাওয়াযুক্ত অঞ্চলে টোকলাই থেকে প্রাপ্ত কৌশলসমূহ প্রয়োগ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

একই বছর ডুয়ার্সের নাগরাকাটা এবং সিলেটের শমসেরনগরে এসকল অঞ্চলের Advisory কর্মকর্তাগণের থাকার জন্য দুটি বাংলো নির্মিত হয়। বর্তমানে ডানকান ব্রাদার্সের শমসেরনগর চা বাগানের মূল কোম্পানি ভিজিটিং বাংলোটিই ছিল টোকলাইয়ের সেই বাংলো (নিম্নে বাংলোর ছবি দেয়া হলো) সেখানে ক্লোন TV1 এর আদি পরীক্ষণ প্লটটি এখনও রয়ে গেছে। একই সময়ে দার্জিলিং এর Advisory কর্মকর্তার জন্য রাংনীতে তখন একটি বাংলো ভাড়া করা হয়।

কালসাক্ষী শমসেরনগর চা বাগানে Advisory কর্মকর্তার ভিজিটিং বাংলো। বাংলোর সামনে দাঁড়ানো লেখক ড.মাইনউদ্দীন আহমেদ। এ বাংলোরই কাছাকাছি ছিল TV1 ক্লোন এর অন্যতম ট্রায়াল প্লট।

[illegible] এ ভবনটিতে Advisory কর্মকর্তাদের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হতো বলে জানা যায়। সম্ভবত [illegible] King ও Watt সাহেব এ ঘরেই কাজ করতেন। বর্তমানে কিংস্ বাংলো নামে পরিচিত।

[illegible] বাগানের বর্তমান R&D Training Centre. লেখকের সাথে মি. শংকরলাল পোদ্দার, [illegible] (R&D) ও মি. কে. জি. আজম, ডেপুটি ম্যানেজার।

শমসেরনগর বাগানের একটি 'TV' ক্লোন গাছ

এ দশকেই মাঠ পর্যায়ের পরীক্ষণগুলোতে পরিসংখ্যান প্রক্রিয়ার যোগসূত্র স্থাপিত হয়। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান গবেষণাগারের বিজ্ঞানী মি.এস. এস. বোস টোকলাই এ দুমাস অবস্থান করে কতিপয় সহকারীকে চা গাছের মূলে স্টার্চ সঞ্চয় সম্পর্কে বহুবছরের সংগৃহীত ডাটার পরিসংখ্যানভিত্তিক বিশ্লেষণ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দান করেন।

উনবিংশ শতকের ত্রিশের দশকের শেষভাগে অর্জিত অগ্রগতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে ব্যাহত হয়। ১৯৪১-৪৪ সময়কালে পাঁচজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে যুদ্ধের কাজে নিয়ে যাওয়া হয় এবং অন্যান্যদের জাতীয় অন্যান্য কাজে নিয়োজিত করা হয়। শুধুমাত্র মুখ্য একজন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা টোকলাই এ সার্বক্ষণিক দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৪২ সালে দায়িত্বপালনকালে মি. কমরি নামক একজন কর্মকর্তা মারা যান। একই বছর মেহমানখানা, প্রশাসনিক কার্যালয়, উদ্ভিদ গবেষণাগার এবং চারটি বাংলো সেনাবাহিনী রিকুইজিশন করে নেয়। লাইব্রেরির সকল বইপত্র একটি বাংলোতে সরিয়ে নেয়া হয়। ধরভেটাতে মি. টানস্ট্যাল মাঠপর্যায়ের কৃষি খামার এবং মি. ওয়াইট উদ্ভিদতাত্ত্বিক গবেষণাগুলো দেখাশোনা করতেন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার সাথে সাথে মি. পি. এইচ. কার্পেন্টার অবসরে চলে যান এবং মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে মি. সি. জে. হ্যারিসন দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

যুদ্ধের পরের দু'বছরকে বলা যায় পুনর্গঠনকাল। ১৯৪৬ সালে কর্মকর্তা পদে প্রথম ভারতীয় হিসেবে মি. এন. জি. গোখলে নিয়োগ পান। একই বছর প্রথমবারের মত চা বিশ্বকোষ বা 'Tea Encyclopaedia' প্রকাশিত হয়।

১৯৪৭ সালে কৃষিবিদ হিসেবে মি. এস. কে. দত্ত এবং কীটতত্ত্ববিদ হিসেবে মি. হেইন্সওয়ার্থকে নিয়োগ দেয়া হয়। তিনি স্বাধীনোত্তর বাংলাদেশের চা পুনর্বাসন প্রকল্পের (BTRP) জন্য ওডিএ (ODA) এর একজন এডভাইজর হিসেবে বাংলাদেশে কাজ করে গেছেন। তার নিজ ভাষ্যমতে টোকলাইয়ের সঙ্গে থাকাকালে তিনি মাঠ পরীক্ষণ কাজে কালীঘাট চা বাগানেও কাজ করেছেন (বিটিআরআই এর প্রাক্তন পরিচালক জনাব এ.এফ.এম বদরুল আলম মহোদয়ের সাথে আলোচনাকালে জানা যায়)। একই বছর ITA, লন্ডন এবং কোলকাতার একটি যৌথ প্রতিনিধিদল টোকলাই পরিদর্শন করেন এবং প্রকৌশলগত গবেষণাগার স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন।

১৯৪৮ সালে কীটতত্ত্ববিদ হিসেবে ড. জি. এম. দাসকে নিয়োগ দেয়া হয়। এখানে উল্লেখ করলে অত্যুক্তি হবে না যে, ড. জি. এম. দাস বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন এবং এখানেই লেখাপড়া করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এস.সি পাস করে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর কোলকাতা চলে যান। ১৯৪৮ সালের কোন এক সময় চাকরির অন্বেষণে আসাম চলে যান। ঐ বছরই তিনি কীটতত্ত্ববিদ হিসেবে টোকলাই-এ যোগদান করেন। এ বইয়ের লেখক ড. মাইনউদ্দীন আহমেদ আসামের টোকলাই টি রিসার্চ এর শতবর্ষপূর্তিতে (২০১১ সালের নভেম্বর মাসে) যোগদানকালে ড. জি. এম. দাস এর Obituary ও তাঁর পুত্রের প্রদর্শিত ফিল্মের মাধ্যমে এ তথ্য সংগ্রহ করেন।

এছাড়া বায়োকেমিস্ট্রিতে মি. ডি. জে. উড এবং অ্যাডভাইজরিতে মি. পি.এম. গ্লোভার ও মি. আর. আই. ম্যাকলপাইন নিয়োগ পান। তখন ব্যাকটেরিয়াতত্ত্ব (Bacteriology), কীটতত্ত্ব (Entomology) এবং ছত্রাকতত্ত্ব (Mycology) শাখাগুলো মি. ই. হেইন্সওয়ার্থ, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ববিদের (Plant Pathologist) অধীনে ন্যস্ত করা হয়।

১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের পর সুরমা ভ্যালির কার্যক্রম টোকলাই থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত চালিয়ে যাওয়া হয়। মূলত এসময় পর্যন্ত বর্তমান বাংলাদেশের চায়ের সকল পরামর্শ টোকলাই থেকে পাওয়া যেত এবং নিশ্চিত করে বলা যায় শমসেরনগর চা বাগানেই TV1, TV2 জাতের ক্লোন আবিষ্কারের অন্যতম ট্রায়াল প্লট বিদ্যমান ছিল। যার অংশবিশেষ বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও বিদ্যমান থাকতে দেখা যায়। টোকলাই এক্সপেরিমেন্টাল স্টেশন থেকে একই বছর TV1,

TV2 এবং TV3 নামক তিনটি ক্লোন অবমুক্ত করা হয়। এ ঘটনাটি চা শিল্পে ক্লোনাল সিলেকশনের বিপ্লবের সূচনা করে এবং অঙ্গজ প্রজননের দ্বার উন্মুক্ত করে।

মি.আর.সি. জে. এইচ গিলক্রিস্ট দীর্ঘদিন যাবত টোকলাই এ চা আস্বাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৯৫১ সালে মি. জে. এম. ট্রিনিক (J.M. Trinick) টি টেস্টিং ডিপার্টমেন্ট এর দায়িত্ব নেন এবং মি. আই ম্যাকটিয়ারের (I. McTear) তত্ত্বাবধানে প্রকৌশল ডিপার্টমেন্ট কাজ শুরু করে একই বছর প্রশাসনিক কাজকর্ম দেখাশোনা করার জন্য মি. জে. ওয়াটসন মর্টন (J. Watson Morton) নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে যোগদান করেন।

১৯৫২ সালে Mr. C. J. Harrison অবসরে গেলে ড.আর.জে.ম্যাকলরি (Dr. R.J. Mellory) টোকলাই এর পরিচালক পদে যোগদান করেন। ১৯৫৩-৫৪ সালে অধ্যাপক স্যার ফ্রাঙ্ক অ্যাংলেড এর নেতৃত্বে দ্বিতীয় তদন্ত কমিশন গঠিত হয়।

১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠানটির প্রথম ত্রৈমাসিক জর্নাল 'Two and A Bud' প্রকাশিত হয়। ১৯৫৫ সালে মি. এইচ. ফার্গুসন (H. Ferguson) পরিচালক পদে যোগ দেন। ১৯৫৬ সালে ড. ডি. এন. বড়ুয়া উদ্ভিদরোগতত্ত্বের প্রধান এবং মি. ডি. এন. বারবরা মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৫৭ সালে মি. ম্যাকটিয়ার 'রেটরভ্যান' মেশিন আবিষ্কার করেন। একই সময় ডেয়ার্স এর ছায়াবৃক্ষে নতুন প্রজাতির একটি ছত্রাক আবিষ্কৃত হয় এবং পরবর্তীতে অনেকগুলো ছত্রাক প্রজাতি সনাক্ত হয়

১৯৬১ সালে মি. এ.জি. গোখলে প্রথম ভারতীয় হিসেবে টোকলাইয়ের পরিচালক পদে যোগদান করেন। একই সময় চা শিল্প তীব্র অর্থ সংকটে পড়ে এবং ITA টোকলাই পরীক্ষণ স্টেশনটি ১৯৬৩ সাল থেকে পরিচালনা করা ছেড়ে দেয়। ১৯৬৪ সালে 'Tea Research Association (TRA)' স্টেশনটি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে।

টোকলাই এক্সপেরিমেন্টাল স্টেশন এর নতুন ও বর্তমান নামকরণ

২০১৪ খ্রি. মার্চ মাসে টি রিসার্স এসোসিয়েশনের (TRA) ১৬০তম ম্যানেজমেন্ট কাউন্সিল সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, টোকলাই এক্সপেরিমেন্টাল স্টেশনের নতুন নামকরণ হবে টোকলাই টি রিসার্স ইনস্টিটিউট। নতুন এ নামকরণ ১৭ মার্চ ২০১৪ খ্রি. থেকে কার্যকর হয়েছে।

টোকলাই এক্সপেরিমেন্টাল স্টেশন (আসাম, ভারত) এর পরিচালকগণ

1.	Dr. H. H. Mann	10.	Dr. N. K. Jain
2.	Mr. C. M. Hutchinson	11.	Dr. B. Banerjee
3.	Dr. G.D. Hope	12.	Dr. R. Singh
4.	Mr. P.H. Carpenter	13.	Dr. B.C. Barbora
5.	Mr. C.J. Harrison	14.	Dr. Y. D. Pande
6.	Dr. R.J. Mellroy	15.	Dr. A. K. Mukhopadhaya
7.	Mr. N. G. Gokhale	16.	Dr. M. Hazarika
8.	Mr. D.H. Laycock	17.	Dr. N. Muraleedharan
9.	Mr. S. K. Dutta	18.	Dr. A. K. Barooah

প্রাচ্যের সাথে সংযোগ

টোকলাই পরীক্ষণ খামারের অতীত এবং অপসৃয়মাণ পথ পরিক্রমার দিকে তাকালে আমরা চায়ের পরম্পরাকে কখনো ভুলতে পারিনা। আবার যদি না চীন সম্রাট শেন নং খ্রিস্টপূর্ব ২৭৩৭ সালে চা আবিষ্কার করতেন, তাহলে পৃথিবীর চা ইতিহাসে টোকলাই এর প্রাসঙ্গিকতাও থাকত না।

চীন সম্রাট চায়ের নির্যাস পান করে 'চা' কে 'স্বর্গীয় উপশমকারী পানীয়' হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। পৌরাণিক কাহিনি অনুযায়ী আমরা জানতে পারি চীন সম্রাট শেন নাং গণসংযোগ করে যখন গ্রাম এলাকায় কোন এক স্থানে একটি চা গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন এবং কেটলিতে পানি ফুটানো দেখছিলেন, তখন বাতাস সে গাছের কয়েকটি পাতা উড়িয়ে এনে কেটলিতে ফেলে দেয়। পাতাসিদ্ধ গরমপানির সুগন্ধে আকৃষ্ট হয়ে তিনি সে লিকারটুকু পান করেন এবং বিশ্বের সর্বাধিক জনপ্রিয় পানীয়টিকে আবিষ্কার করেন। তবে চীন দেশের মানুষ সম্ভবত চতুর্থ শতাব্দী থেকে চা পান করে আসছে বলে জানা যায়।

চৈনিকরা ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষদিকে চা-কে ঔষধী পানীয়ের চাইতেও বেশি কিছু বলে বিশ্বাস করা শুরু করে। সুই রাজত্বকালে (৫৮৯ – ৬২০ খ্রি.) চাকে পানীয় হিসেবে সর্বপ্রথম পান করা হত এবং একে ভালো একটি পানীয় বলে গণ্য করা হলেও চা এর বহুবিধ গুণাবলি সম্পর্কে তারা অসচেতন ছিল।

সাং রাজত্বকালে (৯৬০ – ১২০০ খ্রি.) সকল প্রদেশেই চা এর প্রচলন ঘটে এবং চা পানকে তখন আভিজাত্যের প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হত। তখন শুকনো পাতাকে গুঁড়া করা হতো এবং একটি বাঁশের তৈরি নাড়ানির সহায্যে গরম পানিতে মিশিয়ে চা তৈরি করা হত।

৭ম এবং ৮ম শতাব্দীতে ঔষধী পানীয় হিসেবে চায়ের পরিচিতি লোপ পায় এবং পানীয় হিসেবে জনপ্রিয়তা দ্রুত এতবেশি বৃদ্ধি পায় যে, চীনের রাজস্ব বিভাগ এর উপর কর আরোপ করে। এ সময়ে চীনারা শিখল যে, চা যে অঞ্চলে পান করা হয় সে অঞ্চলের পানির সাথে অবশ্যই তাকে খাপ খেতে হবে।

চীন থেকে চায়ের চাষাবাদ জাপানে বিস্তার লাভ করে। সেখানে ২০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে চায়ের চাষাবাদ শুরু হয়। এমনকি জাপানে চা চীন থেকেও অনেক বেশি সামাজিক মর্যাদা লাভ করে। জাপানে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের দ্বারা চা চাষাবাদের সূচনা ঘটেছিল। এসকল সন্ন্যাসীগণ চীনদেশে ধর্ম প্রচারের ফাঁকে চায়ের বীজ জাপানে নিয়ে যেতে সক্ষম হন এবং এভাবেই জাপানে চা চাষাবাদের সূত্রপাত ঘটেছিল।

বর্তমানে জাপানের সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে চা এমন একটি প্রাচীন ঐতিহ্য হিসেবে পরিগণিত যে, জাপানি ঐতিহাসিকগণের পক্ষে বৌদ্ধমঠে চা-বিহীন কোনদিন ছিল, তা কল্পনা করাও কঠিন। সুতরাং আশ্চর্যের কিছু নেই যে, চা-কে তারা তাদের আদি সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করে। চা কে ঐশ্বরিক নিরাময়কারী এবং একটি সর্বোচ্চ স্বর্গীয় দান হিসেবে মনে করে।

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশে চায়ের সূচনা

(Introduction of Bangladesh tea)

১৮৪০ সালের প্রথমদিকে বাংলাদেশে চায়ের চাষ শুরু হয়। বাংলাদেশের চায়ের সঠিক ইতিহাস হচ্ছে উত্তর-পূর্ব ভারতের চায়ের ইতিহাস, বিশেষ করে সুরমা উপত্যকার ইতিহাস। ১৮২৭-১৮৫৭ সময়কালটি উপমহাদেশে চা চাষের সূচনাকাল হিসেবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, বিশেষ করে বাংলাদেশের জন্য। এই সময়কালের শেষভাগটি বাংলাদেশের বৃহত্তর সিলেট এবং বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলায় চা চাষের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়। চট্টগ্রামে চা চাষের সূচনা হয় ১৮৩৯-৪০সনে। চা গাছগুলো মূলত ছিল বীজজাত হাইব্রিড তবে কিছু স্থানীয় আসামজাত এবং চায়না টাইপের চা-গাছও ছিল। জেলা কালেক্টর মি. স্কিনস প্রথমে আসাম থেকে কিছু চা-বীজ এবং কোলকাতা বোটানিক্যাল গার্ডেন থেকে কিছু চায়না টাইপ চা গাছ সংগ্রহ করেন এবং চট্টগ্রাম ক্লাবের সামনে রোপণ করেন চট্টগ্রামের প্রথম চা বাগানটির নাম 'পাইওনিয়ার' (Pioneer) অসলেই যথার্থ ছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এ চা-চাষ উদ্যোগটি টিকেনি। মি. হগ নামক আরেক ভদ্রলোক ব্যক্তিগতভাবে কর্ণফুলী নদীর ওপাড়ে কোদালায় এক একর বা দুই একর জায়গায় চা-চাষ করেন। এটি ছিল চায়ের দ্বিতীয় চাষাবাদ প্রচেষ্টা। অবশেষে চট্টগ্রামে ১৮৪৩ সালে প্রথম চা প্রস্তুত হয়। ইতোমধ্যে আসামে কিন্তু অসাধারণ অগ্রগতি সাধিত হয়। সিলেটের চাঁদখানি পাহাড়ে স্থানীয় চা-গাছের উপস্থিতি পাওয়া যায় ১৮৫৫ সালে (Ahmed, 1963)। একই বছর কাছাড় এবং সিলেটের বিভিন্ন জেলা নিয়ে গঠিত সুরমা ভ্যালিতে চায়ের চাষ শুরু হয়। কয়েক বছর পর, সিলেট জেলার সীমান্তবর্তী খাসিয়া এবং জয়ন্তিয়া পাহাড়ে প্রাকৃতিক অবস্থায় চা গাছের সন্ধান পাওয়া যায়। ১৮৫৪ সালে সিলেট জেলায় সর্বপ্রথম মালনিছড়া চা বাগানে বাণিজ্যিকভিত্তিতে চায়ের চাষ শুরু হয় এবং অদ্যাবধি চা বাগানটি সফলজনকভাবে চা উৎপাদন করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় চায়ের অ'বাদকাল

চট্টগ্রাম	১৮৩৯-৪০
মালনীছড়া চ' বাগান, সিলেট	১৮৫৪
লালচাঁন্দ চ' বাগান, হবিগঞ্জ	১৮৬০
মিরতিংগা চা বাগান, মৌলভীবাজার	১৮৬০
পঞ্চগড়	২০০০
বান্দরবান	২০০৫

বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট এর অতীত এবং বর্তমান

চা গবেষণাকে মাঠভিত্তিক ও অধিক কার্যকরী করার লক্ষ্যে ১৯০৪ খ্রি. আসামের ইঁলিকা চা বাগানে একটি স্টেশন স্থাপন করা হয় এবং ১৯১১ খ্রি. আসামের জোরহাটে Tocklai Experimental Station এর স্থায়ী কার্যালয় স্থাপিত হয় যার নিগন্ত ও কার্যপরিধি পরিণামে সমস্ত উত্তর - পূর্ব ভারতের চা শিল্পে বিস্তৃত হয়। এখানকার উদ্ভাবিত প্রযুক্তিগত সুফল আমাদের এ অঞ্চলের (তখনকার) চা শিল্পও ভোগ করত। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত বিভক্তি ও স্বাধীনতার সুবাদে আমাদের চা অঞ্চল, তৎকালে যা সুরমা ভ্যালি চ' এবং হালদা ভ্যালি চা অঞ্চল নামে পরিচিত ছিল তা পাকিস্তান চা শিল্প হিসেবে পৃথক সত্ত্বা নিয়ে আবির্ভূত হলো। বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল Tocklai এর সঙ্গে বৈজ্ঞানিক স্বার্থের সরাসরি যোগাযোগ।

বিটিআরআই-এর প্রতিষ্ঠা

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) চা শিল্পের সার্বিক উন্নয়ন ও চায়ের বিপণনের লক্ষ্যে পাকিস্তান টি অ্যাক্ট/১৯৫০ এর আওতায় পাকিস্তান চা বোর্ড গঠিত হয়। অতঃপর চ' শিল্পের বৈজ্ঞানিক সমর্থনের যথাযথ গুরুত্ব অনুধাবন করেই চা বোর্ড ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে এক সিদ্ধান্ত বলে একটি চ' গবেষণা স্টেশন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং একজন মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা নিয়োগ করে তৎকালীন ঢাকস্থ কার্যালয়েই প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু করা হয়। অবশেষে ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৮ ফেব্রুয়ারি শ্রীমঙ্গলে পাকিস্তান চা গবেষণা স্টেশন (পিটিআরএস) নামে স্থায়ী গবেষণা কার্যালয় স্থাপিত হয়। ১৯৭১ এর স্বাধীনোত্তরকালে এ প্রতিষ্ঠানকে প্রথমে বাংলাদেশ চ' গবেষণা স্টেশন (বিটিআরএস) নামকরণ থেকে ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিটিআরআই) পূর্ণাঙ্গ ইনস্টিটিউট-এ উন্নীত করা হয়। শুরু থেকেই বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউটটি বাংলাদেশ চা বোর্ডের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। বাংলাদেশ চা বোর্ড বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। ফেব্রুয়ারি ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ চ' গবেষণা ইনস্টিটিউটের ৫০ বছর পূর্ণ হয়।

সহযোগে এ ইনস্টিটিউট National Agricultural Research System (NARS) এর একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসেবেও পরিগণিত। ইনস্টিটিউটটি শ্রীমঙ্গল শহর থেকে ৩.২ কি.মি. দূরে সমুদ্র সমতল থেকে ২৩.১ মি. উচ্চতায় অবস্থিত। এ ইনস্টিটিউটের বর্তমানে ৩টি পূর্ণাঙ্গ ও একটি নতুন সৃষ্ট উপকেন্দ্র রয়েছে। উপকেন্দ্রগুলোর একটি মৌলভীবাজার জেলায় কালিটিতে এবং একটি চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়িতে অবস্থিত নতুন উপকেন্দ্রটি উত্তরবঙ্গের পঞ্চগড় জেলার তেতুলিয়ায় আনুষ্ঠানিকভাবে ২০০১ খ্রিস্টাব্দে তার কার্যক্রমের সূচনা করেছে।

গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য

১. বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে ফলনশীলতা ও গুণগতমান বৃদ্ধি করা

২. চা শিল্পের উন্নয়ন ও উৎকর্ষে বিজ্ঞানভিত্তিক পরামর্শ ও সহায়তা দান।

৩. গবেষণালব্ধ প্রযুক্তি চাশিল্পে বিস্তার করা।

গবেষণা অবকাঠামো

১৯৫৭-১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের দিকে প্রধান গবেষণাগার ভবন, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তার বাসভবন এবং স্টাফদের জন্য কয়েকটি আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হয়। শ্রীমঙ্গলে ইনস্টিটিউটটির কার্যক্রমে মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তার (বর্তমানে পরিচালক) অধীনে তিনটি গবেষণ পদে কেমিস্ট, এগ্রোনমিস্ট ও প্যাথলজিস্ট নিয়োগ দিয়ে এবং কিছু কাঠামোগত স্টাফ নিয়ে ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে গবেষণা কার্যক্রমের সূচনা করা হয়। গবেষণা কার্যক্রম বিন্যাসে উক্ত তিনজন কর্মকর্তার অধীনে তিনটি ডিভিশন তথা কেমিস্ট্রি-মেট্রোলোজি, এগ্রোনমি-বোটানি ও প্লান্ট প্রটেকশন ডিভিশন নামে গবেষণাগারের পাশাপাশি মাঠপর্যায়ে গবেষণা কার্যক্রম শুরু করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৬১ খ্রি. এগ্রো-বোটানি ডিভিশনকে ভেঙে পূর্ণাঙ্গ দুটি ডিভিশন বোটানি ও এগ্রোনমি নামে এবং ১৯৮৭ খ্রি. কেমেস্ট্রি-মেট্রোলজি ডিভিশনকে সয়েল কেমেস্ট্রি ও বায়োকেমেস্ট্রি নামে দ্বিধা বিভক্তির মাধ্যমে গবেষণা কাজের পরিধি আরও সম্প্রসারণ করে মোট ৬টি ডিভিশন পরিচালনা করা হয়।

তৎপরবর্তীতে চা শিল্পের বিভিন্ন দিক বিবেচনায় পর্যায়ক্রমে উপদেষ্টা, পরিসংখ্যান অর্থনীতি ও টি-টেকনোলজি বিভাগ নামে আরও তিনটি বিভাগ খোলা হয়। ইতোমধ্যে ক্রপপ্রটেকশন ডিপার্টমেন্ট এর নামকরণ পরিবর্তন করে ১৯৭৫ খ্রি. পেস্টম্যানেজমেন্ট নামে নতুন নামকরণ করা হয়। উক্ত বিভাগের মধ্যে এন্টোমোলজি ও প্লান্টপ্যাথলজি সম্পৃক্ত রয়েছে। পরবর্তীতে ১৯৯৮ খ্রি. বাংলাদেশ চা বোর্ড উপদেষ্টা বিভাগটি বিলুপ্ত করেন একই বছর চা শিল্পের গবেষণা চাহিদানুসারে কাজের ধারা ও ফলিত দিক বিবেচনায় পেস্ট ম্যানেজমেন্ট

ডিভিশনকে পূর্ণাঙ্গ দুটি বিভাগ এন্টোমোলজি ও প্লান্টপ্যাথলজি বিভাগে বিভাজিত করে মোট ৮টি ডিভিশন গঠন করেন।

একই সময়ে, যেহেতু ইনস্টিটিউটটি জীববিজ্ঞান (Bio-science) এর অন্তর্ভুক্ত সেহেতু ৮ বিভাগের মধ্যে পরিসংখ্যান, অর্থনীতি ও টি টেকনোলজি বিভাগ জীববিজ্ঞান বর্হিভূত (Non- Bio) বিধায় এ দুটিকে Non- Bio এর অন্তর্ভুক্ত করে বাকি ৬টি ডিভিশনকে বিষয় ও কার্যক্রমের সম্পর্কানুসারে ৩টি ডিপার্টমেন্ট – ডিপার্টমেন্ট অব কেমিস্ট্রি, ডিপার্টমেন্ট অব ক্রপ প্রডাকশন ও ডিপার্টমেন্ট অব পেস্টম্যানেজমেন্ট শিরোনামে বিন্যাস্তিত করা হয়। ডিপার্টমেন্ট অব কেমিস্ট্রির অধীনে ২টি বিভাগ সয়েল কেমিস্ট্রি ও বায়োকেমিস্ট্রি, ডিপার্টমেন্ট অব ক্রপ প্রডাকশন-এর অধীনে বোটানি, এগ্রোনমি ও ডিপার্টমেন্ট অব পেস্টম্যানেজমেন্ট এর অধীনে এন্টোমোলজি ও প্লান্টপ্যাথলজি বিভাগে বিন্যস্ত করা হয়।

ইনস্টিটিউটের পরিচালক কারিগরি ও প্রশাসনিক প্রধান। মুখ্য ও প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাগণ গবেষণা ডিপার্টমেন্ট ও বিভাগগুলোর প্রধান থেকে গবেষণা ও উপদেশমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছেন।

উদ্দীষ্ট লক্ষ্যে ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের শুরু থেকে ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চা শিল্পের বাস্তব চাহিদা ও চাহিত গবেষণাবিষয়ে গুরুত্ব ও সময়োপযোগিতা বিবেচনায় সীমিত সম্পদের মধ্যেই ধীরে ধীরে জনবল সৃষ্টি করে বর্তমান গবেষণা পরিধি ৮টি বিভাগের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। এটা উল্লেখ অত্যুক্তি হবে না যে, গবেষণা বিষয় ও সৃষ্ট বিভাগের উন্মেষ, চা বিশ্বের আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য চা গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইনস্টিটিউটের অনুমোদিত ৩৬ জন বৈজ্ঞানিক জনবল শ্রীমঙ্গলস্থ প্রধান কেন্দ্র ও তিনটি উপকেন্দ্রে অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী বন্টন করা হয়েছে।

ইনস্টিটিউটের সাথে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের যৌথ গবেষণা কার্যক্রম রয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের সহায়তায়ও সময়ে সময়ে বিশেষ বিশেষ গবেষণা প্রকল্প পরিচালিত হয়ে আসছে।

প্রতিষ্ঠাকাল থেকে অর্জন/সাফল্য

এ ইনস্টিটিউট তার জন্মলগ্ন থেকে সীমিত সুযোগ-সুবিধা কাজে লাগিয়ে চা শিল্পের উন্নয়নে যথাযথ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। উদ্ভাবন করেছে অনেক লাগসই প্রযুক্তি। এর কিছু নিম্নরূপ:

১) বিটিআরআই এ পর্যন্ত BT1 থেকে BT18 নামে ১৮টি উচ্চফলনশীল ও আকর্ষণীয় গুণগতমান সম্পন্ন ক্লোন উদ্ভাবন করেছেন। যার গড় উৎপাদন হেক্টর প্রতি ৩ হাজার কেজির উপর এবং সর্বোচ্চ রেকর্ডকৃত ফলন ৪-৫ হাজার কেজি

২) কয়েকটি জেনারেটিভ ক্লোন সমন্বয়ে ৪টি বাইক্লোনাল বীজজাত BTS1, BTS2, BTS3 ও BTS4 এবং একটি পলিক্লোনাল বীজজাত উদ্ভাবন করা হয়েছে

৩) চায়ের নানাবিধ গবেষণায় ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য ইনস্টিটিউটে একটি টি জার্মপ্লাজম ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

৪) হেক্টর প্রতি চারার পরিমাণ ও আদর্শ রোপণ পদ্ধতি ও আনুষঙ্গিক পরিচর্যা নিরূপণ করা হয়েছে

৫) চায়ের আদর্শ-ছাঁটাই চক্র নির্ধারণ করা হয়েছে। চায়ের উৎপাদন ও গুণগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপযুক্ত টিপিং পদ্ধতি ও চয়ন পালা নির্ধারণ করা হয়েছে

৬) মাটি, পাতা ও সারের গুণগতমান নির্ণয় করে সারনীতি প্রণয়ন করা হয়েছে।

৭) মাটির পুষ্টি উপাদানের সঙ্কিক্ষণ মান নির্ণয় করা হয়েছে।

৮) মৃত্তিকা পুনর্বাসনের নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে

৯) পোকামাকড় ও রোগবালাই দমনে সমন্বিত পেস্ট ব্যবস্থাপনা নিরূপণ করা হয়েছে।

১০) আধুনিক IPM পদ্ধতিতে কতিপয় Bio-Control Agent সনাক্ত ও সংরক্ষণ করারপর প্রাথমিক গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

১১) তৈরি চায়ে কীটনাশকের অবশিষ্টাংশের MRL এর মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

১২) চা উৎপাদনে অর্থনৈতিক আয়-ব্যয় নিরূপণ করা হয়েছে।

১৩) চায়ের গুণগত মানোন্নয়নে টি টেস্টিং সেশন ও দলগত অনুশীলন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে।

১৪) EUএর আর্থিক সহযোগিতায় Pesticide Residue Analytical Laboratory স্থাপন করা হয়েছে।

১৫) কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিএআরসি'র আর্থিক সহযোগিতায় পূর্ণাঙ্গ Bio-Chemistry গবেষণাগার যন্ত্রপাতিসমৃদ্ধ ও আধুনিকায়ন করা হয়েছে

১৬) একইভাবে বাংলাদেশ চা বোর্ডের অর্থায়নে Bio Technology গবেষণাগার আধুনিকায়ন ও যন্ত্রপাতিসমৃদ্ধ করা হচ্ছে

এ সকল উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান চা শিল্পে বিস্তার ও বাস্তবায়নে চা শিল্পের অগ্রগতি ও উন্নয়নে প্রবহমান অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। একাত্তরের স্বাধীনতা

থেকে অদ্যাবধি চায়ের উৎপাদন বেড়েছে ৩১ মিলিয়ন কেজি থেকে ৬৭ মিলিয়ন কেজিতে, আবাদি এলাকা ৪২.৬ হাজার হেক্টর থেকে ৫৯ হাজার হেক্টরে এবং হেক্টর প্রতি জাতীয় গড় উৎপাদন ৭৩৫ কেজি থেকে ১২৭০ কেজিতে উন্নীত হয়েছে। উপরোক্ত বৃদ্ধি গবেষণা জ্ঞান ও প্রযুক্তির বাস্তব প্রয়োগের প্রতিফলন বলে দাবি রাখে।

এ ইনস্টিটিউটে উদ্ভাবিত প্রযুক্তির সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে ইনস্টিটিউটের কয়েকজন বিজ্ঞানী "বেগম জেবুন্নেসা ও কাজী মাহবুবুল্লাহ কল্যাণ ট্রাস্ট" প্রদত্ত স্বর্ণপদক পান। পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানীবৃন্দ সর্বজনাব এম এম আলী, ড. এস এ রশীদ, হারাধন চক্রবর্তী ও এ এফ এম বদরুল আলম যৌথভাবে অধিক উৎপাদনশীল ও সুগন্ধ ও উন্নত গুণাগুণসম্পন্ন চা ক্লোন বিটি২ উদ্ভাবনের জন্য এ পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত হন। এ ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন পরিচালক ড. কে. এ. হাসান চা শিল্পে তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত হন।

বিটি২ আবিষ্কারে অন্যতম বিজ্ঞানী জনাব এ এফ এম বদরুল আলম দীর্ঘদিন বিটিআরআই এর পরিচালক ছিলেন। তাঁর অনবদ্য অবদানে বাংলাদেশ সরকার তাঁকে ৩ বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক চাকরি বর্ধিত করেছিলেন। যা ইনস্টিটিউটের একজন বিজ্ঞানীর চাকরি মেয়াদ বর্ধনের প্রথম রেকর্ড। এ ইনস্টিটিউটের পূর্বতন বিজ্ঞানীদের প্রাপ্ত সম্মান ও সুনাম বর্তমানে কর্মরত বিজ্ঞানীদের অনুপ্রাণিত করেছে যার প্রতিফলন ঘটছে তাঁদের আজকের সফলতায়।

প্রযুক্তি হস্তান্তর

ইনস্টিটিউট গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও উদ্ভাবিত টেকসই প্রযুক্তি সম্বন্ধে নিয়মিত চা শিল্প সংশ্লিষ্টদের অবহিত করা হয়। বার্ষিক কোর্স, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, বার্ষিক প্রতিবেদন, জার্নাল, প্রজ্ঞাপন, প্যামফ্লেট, ওয়েবসাইট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সহায়তায় প্রযুক্তি হস্তান্তর কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

গবেষণাক্ষেত্রের আবশ্যকীয় দিক

১. বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন উচ্চফলনশীল ও গুণগতমানবিশিষ্ট ক্লোন ও বীজজাত উদ্ভাবন।

২. চায়ের মাটিতে জৈবপদার্থ উন্নীতকরণ।

৩. চায়ের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ।

৪. চায়ের রাসায়নিক বিশ্লেষণ ও গুণগতমান নির্ণয়

৫. চায়ের জাত উন্নয়নে বায়োটেকনোলজির প্রয়োগ।

৬. সেচ, পানি নিষ্কাশন ও খরা ব্যবস্থাপনা।

৭. ভূমি পুনর্বাসন ও মৃত্তিকা সংরক্ষণ

৮. স্থানীয় পরিবেশে চায়ের শারীরতাত্ত্বিক অবস্থা ও হারভেস্ট ইনডেক্স উন্নয়ন

৯. মাটির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধিতে সারনীতি নির্ধারণ।

১০. পোকা-মাকড়, রোগ-বালাই ও আগাছাদমনে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা অনুসরণ।

১১. তৈরি চায়ে ক্ষতিকর রাসায়নিক অবশেষ নিরূপণ।

১২. চা প্রক্রিয়াজাতকরণে শক্তির উৎস ও তার যথোপযুক্ত ব্যবহার পদ্ধতির উন্নয়ন।

১৩. শস্য বহুমূখীকরণ।

১৪. চা শিল্পের আর্থসামাজিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ

১৫. বাজারজাতকরণ ও বাজারের উন্নয়ন।

১৬. GIS ও চায়ের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ।

বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিটিআরআই) এর প্রধান/পরিচালকগণ

ক্র. নং	নাম	মেয়াদকাল
১.	ড. ফিরোজ হোসেন আব্বাসী	১৯৫৩ - ১৯৬০
২.	ড. খোন্দকার আমির হাসান	১৯৬১ - ১৯৭৪
৩.	ড. সিকন্দার হায়দর চৌধুরী	১৯৭৫ - ১৯৮৪
৪.	ড. এস.এ. রশীদ	১৯৮৫ - ১৯৯০
৫.	জনাব মজলিশ মোল্লা (ভারপ্রাপ্ত)	১৯৯০ - ১৯৯১
৬.	জনাব এ. এফ. এম. বদরুল আলম	১৯৯১ - ২০০৫
৭.	ড. মোহাম্মদ শহীদুজ্জামান	২০০৫ - ২০০৭
৮.	ড. ময়নুল হক	২০০৭ - ২০০৯
৯.	জনাব মুকুল জ্যোতি দত্ত	২০০৯ - ২০১১
১০.	ড. মাইনউদ্দীন আহমেদ	২০১১ -

বিটিআরআই এর ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত পর্যায়ক্রম

১৯৫৩খ্রি.	৮.৮.১৯৫৩ খ্রি. Dr. F. H. Abbasi প্রথম মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসাবে তিন বছরের চুক্তিতে Pakistan Tea Research Station এর প্রধান কেন্দ্র ঢাকায় যোগদান করেন।
১৯৫৬খ্রি.	পরবর্তীতে তাঁর চুক্তি ৮.৮.১৯৫৬ খ্রি. পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়।
১৯৫৭খ্রি.	শ্রীমঙ্গল শহর থেকে ২ কি.মি. দূরে James Finley হতে ১৮.৩০ একর Waste land Acquisition করা হয়। পরবর্তীতে আরও ৬৩.৬২ একর জমি acquistion করা হয় এবং Pakistan Tea Research Station (PTRS) স্থাপন করা হয়। PTRS এর জন্য মোট ৮১.৯২ একর জমি acquistion করা হয় এবং ২৭.২.১৯৫৭ খ্রি. Pakistan Tea Research Station এর প্রধান কেন্দ্র ঢাকা থেকে শ্রীমঙ্গল স্থানান্তর করা হয়।
১৯৫৮খ্রি.	৩০.৮.১৯৫৮ তারিখে Mr. M.A. Mannan, Agronomist হিসেবে PTRS এ যোগদান করেন। Mr. K.A Mahmud "Plant pathologist হিসেবে ৩০.৮.১৯৫৮ তারিখে PTRS যোগদান করেন। ঐ একই বছর ১.১০.১৯৫৮ খ্রি. Dr. K.A. Hasan "Chemist" পদে তৎকালীন PTRS এ যোগদান করেন।
১৯৫৮-৫৯ খ্রি.	Pakistan PWD এর মাধ্যমে ২টি "C" টাইপ বাংলো, ৮ টি "F" টাইপ, ৪ টি "G" টাইপ এবং ৬টি "H" টাইপ কোয়ার্টার নির্মাণ করা হয়।
১৯৫৯খ্রি.	তৎপরবর্তীতে Mr. Khurshid Akbar ২০.৬.১৯৫৯ খ্রি. Mr. K.A Mahmud স্থলে Plant pathologist পদে যোগদান করেন Pakistan Tea Research Station থেকে ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে ড.কে. এ.হাসান কর্তৃক প্রথম "Annual Report 1959" শিরোনামে প্রকাশিত হয়
১৯৬০খ্রি.	Dr. S. H. Choudhury "Asst. Chemist" হিসাবে যোগদান করেন। বাংলাদেশ চা বোর্ড বাধ্যতামূলক চা আবাদি কার্যকর করতে Development Division নামে বাংলাদেশ চা বোর্ডের অধীনে একটি Division খোলা হয়।
১৯৬০-৬১ খ্রি.	প্রথম Biennial Report প্রকাশিত হয়।
১৯৬১খ্রি.	প্রথম বাঙালি Dr. Hasan 1961 খ্রি. ফেব্রুয়ারিতে ড. আব্বাসী থেকে PTRS এর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তখন Chimistry and Meterological Division, Agronomy - Botany Division ও Plant protection Division নামে ৩টি Division পরিচালনা করা হয়।

১৯৬৩খ্রি.	PTRS হতে জুন মাসে Tea Journal of Bangladesh এর Volume 1 এর ২ টি সংখ্যা প্রথম প্রকাশিত হয়। একই বছর বিটিআরআই ৩ দিনব্যাপী নতুন সহকারী ব্যবস্থাপকদের জন্য প্রশিক্ষণ কোর্স বার্ষিক সর্টকোর্স নামে চালু করা হয়
১৯৬৪খ্রি.	সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক ৪৭৬.১৫ একর জমি PTRS এর নামে মডেল টি গার্ডেন করার জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়। গেস্ট হাউজ, ক্লাব ভবন, ৬টি G-type ও ৩টি E-type কোয়টার, PPWD কর্তৃক নির্মাণ করা হয়
১৯৬৫খ্রি.	বিলাশছড়া পরীক্ষণ খামারে ৫একর নার্সারি উত্তোলন করা হয় এবং ১৫.২০একর জমি আবাদির জন্য প্রস্তুত করা হয়। ৩টি E-type ভবন নির্মাণ করা হয় প্রথম বাংলাদেশ চা ক্লোন বি২০১/৩৯ কোড নাম্বারে এবং পরবর্তীতে বিটি১ clone হিসেবে প্রথম বিমুক্ত করা হয়।
১৯৬৬খ্রি.	চা বোর্ডের Development Division টি পরিচালক বিটিআরআই পরিচালকের অধীনে ন্যস্ত এবং বিভাগীয় স্টাফদের শ্রীমঙ্গলে বদলি করা হয়। সিআইইসিটি দ্বারা হাসপাতাল ভবন নির্মাণ করা হয়। আরও ৬ টি E-type ও ৪ টি G- type ভবন নির্মাণের কাজ প্রথম Short course on Tea culture চালু করা হয়।
১৯৬৯খ্রি.	এগ্রো-বোটানি ডিভিশন বিভক্ত করে পূর্ণাঙ্গ বোটানি ও Agronomy Division করা হয় ড. এম এ রশীদ বোটানি ও মি, এম, ফয়জুল্লাহ এগ্রোনমি বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জনাব এম এম আলী Development Division এর দায়িত্ব পালন করেন
১৯৭১খ্রি.	মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতাবর্ষ।
১৯৭৩	Development Division কে Advisory Division হিসেবে নতুন নামকরণ করা হয়। এ বছর BTRS কে পূর্ণাঙ্গ Institute এ উন্নীত করে Bangladesh Tea Research Institute (BTRI) নামকরণ করা হয়
১৯৭৫	BT2 ও BT3 ক্লোনদ্বয় বিমুক্ত করা হয়।
১৯৮৭	Chemistry-Meteorology বিভাগটি কাজের প্রকৃতি ও গুরুত্ব বিবেচনায় রেখে Soil Chemistry ও Biochemistry Division নামে বিভক্ত করা হয়। Soil Chemistry Division এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন ড.এ.কে.এম. গোলাম কিবরিয়া ও Biochemistry Division এর দায়িত্বভার প্রদান করা হয় জনাব এম এম মোল্লা এর উপর। এ বছরেই BT7 ও বাইক্লোনাল Seed stock BTS1 বিমুক্ত করা হয়
১৯৯৮	কাজের প্রকৃতি ও গুরুত্ব বিবেচনায় Pest Management Division কে ১৯৯৮ খ্রি. ২টি পূর্ণাঙ্গ Division হিসেবে Entomology ও Plant pathology Division নামে বিভক্ত করা হয়। Entomology Division এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন ড. মাইনউদ্দীন আহমেদ।

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশে চা উৎপাদনকারী দেশি ও বিদেশি কোম্পানিসমূহ
(Domestic and foreign Entrepreneurs in Producing tea in Bangladesh)

বাংলাদেশের চা উৎপাদনে দেশি ও বিদেশি যে সকল স্বনামধন্য কোম্পানি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন তাদের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নে উল্লেখ করা হলো –

ইস্পাহানি কোম্পানি

১৮২০ সালে হাজী মোহাম্মদ হাশেম (১৭৮৯–১৮৫০) পারস্যের ইস্পাহান থেকে বোম্বাইয়ে এসে প্রতিষ্ঠা করেন এমন একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, যা পরবর্তীকালে হয়ে উঠে উপমহাদেশের সবচেয়ে অভিজাত প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্যতম পরবর্তীতে মির্জা মেহেদি ইস্পাহানি, মির্জা মোহাম্মদ ইস্পাহানি ও সর্বোপরি মির্জা আহমেদ ইস্পাহানি এ প্রতিষ্ঠানকে নব নব সংযোজনের মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠিত গ্রুপ অব কোম্পানির রূপ দান করেন এবং এর হেড অফিস চট্টগ্রামে বর্তমান জায়গায় স্থানান্তর করেন। মির্জা মেহেদি ইস্পাহানি ১৯৪৯ সালে কোম্পানির চেয়ারম্যানের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং আমৃত্যু (২০০৪) দায়িত্ব পালন করেন।

ইস্পাহানি পরিবার দেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্প ও উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান। ইস্পাহানি পরিবারে চা-বাগান, স্কুল-কলেজ, টেক্সটাইল, শিপিং, পাটকল, খাদ্য সামগ্রী, চক্ষু হাসপাতাল, প্যাকেটজাত চা, ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার ইত্যাদি শিল্প, বাণিজ্যিক ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে এক বিশাল লোকবল কর্মরত আছে। ১৯২ বছরের পুরোনো প্রাচীন কোম্পানিটি এ উপমহাদেশে গুণগত পণ্য ও সেবা প্রদানে একটি অনন্য সাধারণ দৃষ্টান্ত রেখে চলেছে। ২০০৪ সালে মির্জা মেহেদি ইস্পাহানির মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মির্জা আলী বেহরুজ ইস্পাহানি

বর্তমানে কোম্পানির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন এবং মির্জা আলী বেহরুজ ইস্পাহানির ভ্রাতৃবৃন্দ – মির্জা সালমান ইস্পাহানি, মির্জা সাজিদ ইস্পাহানি ও মির্জা শাকির ইস্পাহানি পর্যায়ক্রমে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

এম আহমেদ টি কোম্পানি

অবিভক্ত ভারতে সিলেট ছিল আসামের অংশ। এতদঞ্চলে এম আহমেদ ছিলেন চা চাষের একজন পথিকৃৎ। এতদঞ্চলের মানুষের নিকট চা তখনও নতুন শস্য বা পানীয় হিসাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি। তাই চা চাষের ভবিষ্যৎ নিয়ে যথেষ্ট সংশয় ছিল। সিলেটে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে নতুন নতুন এলাকা চা চাষের আওতায় আসে। চা চাষে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের পূর্ণ সহযোগিতা সত্ত্বেও শুধুমাত্র ব্রিটিশ কোম্পানিগুলোর হাতেই চা-চাষ সীমাবদ্ধ ছিল। ব্রিটিশ নেতৃত্বে মিত্র দেশগুলো ১৯১৮ সালে মহাযুদ্ধে জয়লাভ করে। স্বাভাবিকভাবেই যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলোর অর্থিক অবস্থা খারাপ ছিল। ভারতের অর্থনীতিও ছিল টলমাটাল – যুদ্ধের বিশাল ব্যয়ভার তার অন্যতম কারণ ছিল। তবে ভারতীয়দের মনে পরিবর্তনের আকাঙ্খা ছিল। মহাযুদ্ধে তাদের অবদান এবং উৎসর্গ ছিল তাদের অনুপ্রেরণা। তাই তাদের মধ্যে ক্রমেই ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে এবং তারা নিজেদের শক্তির প্রতি আস্থাশীল হয়ে ওঠেন।

ভারতীয়দের মনের পরিবর্তন এবং আত্মবিশ্বাসের প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ এসময় তারা ব্রিটিশ কোম্পানিগুলোর নিকট থেকে চা বাগান কিনতে শুরু করে। অগ্রগামী উদ্যোক্তাদের মধ্যে যাদের নাম উল্লেখ করা যায় তারা হলেন জমিদার রায় বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী, পৃথিমপাশার নওয়াব আলী আমজাদ, খান বাহাদুর আব্দুল মজিদ সিআইই, আব্দুর রশীদ চৌধুরী, আবুল লেইছ সলউদ্দীন প্রমুখ।

১৯১৩ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করে এম. আহমেদ চৌধুরী সিলেটের মুরারী চাঁদ কলেজে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। একজন শিক্ষাবিদ কঠোর পরিশ্রম এবং ত্যাগের মাধ্যমে কীভাবে একজন সফল ব্যবসায়ী হতে পারেন, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলেন এম. আহমদ চৌধুরী। তিনি তাঁর দূরদৃষ্টি দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন যে, অভিজাত শ্রেণি ছাড়াও অদূর ভবিষ্যতে সাধারণ মানুষের নিকট চা একটি জনপ্রিয় পানীয় হিসেবে পরিগণিত হবে। ১৯২১ সালে জনাব আহমদ খান বাহাদুর আব্দুল মজিদ সিআইই এর নিকট থেকে মাত্র ৭০ একর জমি চা-চাষের আওতায় এনে চান্দবাগ চা বাগানটি কিনে নেন। উল্লেখযোগ্য যে ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ

Octavious Steel Company ব্রিটিশ ভারতীয় সরকারের নিকট থেকে ২২০০ একর জমি চা চাষ করার অনুমতি লাভ করে এবং তারাই চান্দবাগ চা বাগানটির গোড়াপত্তন করে।

অর্থিক সংকট ছিল চা-চাষে নব্য উদ্যোক্তাগণের প্রধান সমস্যা। পূর্ব বাংলায় তখন মাত্র হাতে গোনা কয়েকটি কো-অপারেটিভ ব্যাংকের অস্তিত্ব ছিল কিন্তু তারা চা ব্যবসায় আর্থিক সহায়তাদানে তেমন আগ্রহী ছিল না। সে সকল দিনগুলোতে কেন শস্যের চাষাবাদে ঋণ দেয়ার ধারণাই ছিল অভিনব। একমাত্র বিকল্প ছিল হুন্ডির মাধ্যমে বা নিজস্ব অর্থায়নে অগ্রসর হওয়া। শ্রমিক বা অন্যান্য খাতে খরচ খুবই কম ছিল, তাই চায়ের দামও কম ছিল। চায়ের বাজারজাতকরণ ছিল সম্পূর্ণ একটি ব্যক্তিগত উদ্যোগ। সে সকল দিনে একটি বাগান চালানো সত্যিই দুরুহ ছিল। চা চাষে জ্ঞানের অভাব ছিল অন্যতম প্রতিবন্ধক। কিন্তু উদ্যোক্তাগণ সুদিনের আশায় কখনো হাল ছাড়েননি। আসামের কাছাড় জেলায় অবস্থিত স্টারলিং টি কোম্পানির চা বাগানে চাকরি করে জনৈক আব্দুল ওয়াহিদ চৌধুরী প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। এম আহমেদ তাঁকে চান্দভাগ চা বাগান দেখাশোনার কাজে নিয়োজিত করেন। ফলে বাগানটির যথেষ্ট উন্নতি ঘটল। পরবর্তীতে জনাব আহমেদ আসাম জেলার শিবসাগরের নগেনগণ্ড চা বাগানটি ক্রয় করেন। বাগানটি ছিল উপজাতি অধ্যুষিত মিকিড় পাহাড় অঞ্চলে। কিন্তু স্থানীয় উপজাতীয়রা চা চাষে মোটেই আগ্রহী ছিল না, তাই শ্রমিকের দুষ্প্রাপ্যতা বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়।

ব্রিটিশ কোম্পানিগুলো সরকারি সহায়তায় নিম্নবর্ণের শ্রমিকদের বিহার, উড়িষ্যা এবং তামিলনাড়ু থেকে নিয়ে এসে চা বাগানে কাজে লাগাত। জনাব আহমেদ তাঁর তৃতীয় বাগানটি ক্রয় করেন ১৯৪০ সালে আসাম জেলার ত্রিপুরাতে এবং নাম দিলেন ফুলবাড়ি চা বাগান, নামটি ছিল তাঁর পূর্বপুরুষদের গ্রামের নামে। বাগানটি চা চাষের জন্য একটি আদর্শস্থান ছিল। বাগানটি বর্তমানে মহেশপুর চা বাগান নামে পরিচিত এবং ত্রিপুরা অঞ্চলের সর্বোচ্চ ফলনশীল বাগান হিসেবে পরিচিত।

১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের সময় বহু সম্পত্তি হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে বিনিময় ঘটে এ প্রক্রিয়ায় ত্রিপুরার ফুলবাড়ি এবং সিলেটের মহেশপুরের বিনিময় ঘটে ১৯৫০ সালে। জনাব আহমেদ ১৯৪৫ সালে নগেনগণ্ড চা বাগানটি বিক্রি করে দেন এবং সেই টাকায় ১৯৪৬ সালে জনৈক অস্কার ভার্নন কার্নিশের নিকট থেকে লালাখাল চা বাগানটি কিনে নেন। কার্নিশ কয়েক বছর পূর্বে বাগানটি জেমস ফিনলে কোম্পানির নিকট থেকে কিনে ছিলেন। খাসিয়া এবং জয়ন্তিয়া পাহাড়ের মাঝে সারি নদী বরাবর লালাখাল চা বাগানটি নৈসর্গিক সৌন্দর্যের এক লীলাভূমি। ব্রিটিশ -ভারতীয় সরকার ১৮৬৯ সালে জনৈক পেট্রিক বুকাননকে যে

ঋণ মঞ্জুর করেন তার মাধ্যমে লংলাখাল বাগানটি প্রতিষ্ঠিত হয়। লংলাখাল শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিতই ছিল না, এটি ছিল প্রাণীবৈচিত্র্যে ভরপুর এবং তখন সেখানে রয়েল বেঙ্গল টাইগারও পাওয়া যেত।

জেমস ফিনলে টি কোম্পানি

ইংল্যান্ডের গ্লাসগো শহরে ২৫০ বছরেরও অধিককাল পূর্বে তুলা উৎপাদনকারী হিসেবে ফিনলে'র যাত্রা শুরু হয়। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ফিনলে ভারতবর্ষে চা চাষ করার জন্য প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন। তারা এ শিল্পের গোড়াপত্তন করেন এবং এর প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন মূলত তাঁদের প্রচেষ্টায় উপমহাদেশে বিভিন্ন চা বাগান তৈরি হয় এবং চা উৎপাদনের সুযোগসুবিধা আলোর মুখ দেখে।

জেমস ফিনলে লিমিটেড কোম্পানি চা উৎপাদন এবং বিপণনে বিশ্বে সবচেয়ে বেশি পরিচিত একটি নাম। ১৭৪৫ সালে যুক্তরাজ্যের ইতিহাসে 'দুর্যোগপূর্ণ ৪৫' বা 'Jacobite rising' নামক ঐতিহাসিক যুদ্ধবিগ্রহের দিনগুলোর অব্যবহিত পরবর্তী বছরগুলোতে ফিনলে কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা মি. জেমস ফিনলে পারিবারিক তুলা ব্যবসায়ী হিসেবে যাত্রা শুরু করেন। যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে কথিত আছে তিনি ঘোড়ায় চড়ে তুলা ব্যবসা করতেন। ১৭৯০ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু তার পূর্বেই তিনি একটি দ্রুত বিকাশমান প্রতিশ্রুতিশীল কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে যান। তখনকার গ্লাসগো ডাইরেক্টরিতে তাঁর নাম একজন তুলা ব্যবসায়ী এবং প্রস্তুতকারক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত আছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন তাঁর ব্যবসায় তিনি কারুকার্যময় মসলিন কাপড় বিপণনের ব্যবস্থাও করেছিলেন।

জেমস ফিনলে পরবর্তী বংশধর মি. কার্কম্যান ফিনলে প্রাথমিকভাবে তিনটি বিশাল স্পিনিং কারখানা কিনে নেন। এসকল কারখানা ছিল মধ্য ও পশ্চিম স্কটল্যান্ডের কাটিন ব্যালিনডাল্লোস এবং ডিনস্টন নামক স্থানে। ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্য করতে একজন সফল ব্যবসায়ী, গ্লাসগোর একজন এমপি এবং চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি হিসেবে মি. কার্কম্যান ফিনলে এশিয় মহাদেশে ব্যবসা ক্ষেত্রে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচ্ছত্র আধিপত্য খর্ব করার জন্য প্রভাব খাটান।

১৮৪২ সালে মি. কার্কম্যান ফিনলের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি ঘটে। ১৮৪৯ সালে ফিনলে কোম্পনিতে যোগদেন মি.জন ম্যুর। ১৮৭১ সালে ভারতবর্ষে তাঁর প্রথম ভ্রমণকালে মি. ম্যুর ভারতে ব্যবসার উদ্দেশ্যে 'ফিনলে ম্যুর এন্ড কোম্পানি' নামক একটি প্রাইভেট কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন অপরদিকে গ্লাসগোতে অবস্থিত ফার্মটি ভারতের বোম্বে (বর্তমানে মুম্বাই) এবং কোলকাতায় তৈরি পণ্য প্রেরণ অব্যাহত রাখে। এর ফলে দু' দেশে ব্যবসা সম্প্রসারিত হয়।

মি. ম্যুর ১৮৮২ সালে বর্তমান বাংলাদেশের উত্তর ও দক্ষিণ সিলেট (প্রা.) কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৯৬ সালের মধ্যেই ম্যুর সমগ্র উপমহাদেশে বিভিন্ন চা বাগানের সম্প্রসারণ ঘটান।

১৮৯৪ সালে তিনি দক্ষিণ ভারতের ত্রিবাঙ্কুর (Tribancoor) রাজ্যে বিশাল উঁচু একটি জঙ্গল কিনে নেন। ১৮৯৬ সাল থেকে ১৮৯৮ সালের মধ্যে ফিনলে ম্যুর অ্যান্ড কোম্পানি কর্তৃক 'কনসোলিডেটেড টি অ্যান্ড ল্যান্ডস' কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯০৯ সালে মি.জন ম্যুরের পুত্র ক্যো ম্যুর তাঁর পিতার বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে সমন্বিত করে একটি প্রাইভেট কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন। তাই ১৯২৪ সালে ফিনলে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত হয়। উল্লেখ্য যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে ফিনলে কোম্পানি ব্রিটিশ সরকারকে বালির বস্তা, খাকি সুতিকাপড় এবং চা সরবরাহ করত।

১৯২৬ সালে মি. ক্যো ম্যুর কেনিয়াতে বৃহৎ পরিসরে চা চাষ করার উদ্দেশ্যে ভারত ও শ্রীলঙ্কার চা করদের একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন। এর ফলে ফিনলে বিশ্বের বুকে সর্ববৃহৎ চা উৎপাদনকারী ও বিপণনকারী কোম্পানিতে পরিণত হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়।

২০০০ সালে সোয়্যার গ্রুপ কর্তৃক অধিগ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত মি. ক্যা ম্যুরের উত্তরসুরী তাঁর পুত্র মি. রিচার্ড ম্যুর কর্তৃক চা, পাট এবং অন্যান্য কোম্পানিগুলোর উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়।

ঔপনিবেশিক শাসনকালের পরবর্তী ৫৭ বছর ধরে ব্রিটিশ ফিনলে গ্রুপ কর্তৃক কোম্পানি পরিচালিত হয়ে আসছিল। ২০০৪ সালে বাংলাদেশের একদল সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী কোম্পানিটিকে কিনে নেন। বর্তমানে ফিনলে হাউস, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশে কোম্পানিটির সদর দফতর অবস্থিত।
তথ্য উৎস ঃ সরোয়ারুল আলম, ডিজিএম, জেমস ফিনলে টি কোং লিঃ

ডানকান ব্রাদার্স লিমিটেড

ডানকান ব্রাদার্স ক্যামেলিয়া পিএলসি গ্রুপের অধীন একটি কোম্পানি। বাংলাদেশ ছাড়াও যুক্তরাজ্য, ভারত, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা, কেনিয়া, মালাউই, যুক্তরাষ্ট্র, নেদারল্যান্ড এবং বারমুডাতে এ কোম্পানির মূল বিনিয়োগ রয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ থাকলেও কোম্পানিটির মূল বিনিয়োগ হচ্ছে কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন ও বিপণনে। এ কোম্পানি বিশ্বে বছরে প্রায় ৮০ মিলিয়ন কেজি চা উৎপাদন করে। ফলে চা উৎপাদনের ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ কোম্পানির দাবিদার।

ডানকান প্রেক্ষাপট

যুক্তরাজ্যের গ্লাসগো শহরের ডানকান পরিবারের দু'ভাই ওয়াল্টার ডানকান এবং উইলিয়াম ডানকান ব্যবসার উদ্দেশ্যে ১৮৫৯ সালে কোলকাতা আসেন। সুতরাং উপমহাদেশে ১৫০ বছর পূর্বে ডানকান ব্রাদার্সের যাত্রা শুরু হয়। তখন উপমহাদেশে চা উৎপাদন, বিপণন ও ব্যবসা অত্যন্ত সম্ভাবনাময় ও আকর্ষণীয় ব্যবসা হিসাবে সম্প্রসারিত হচ্ছিল এবং তা ডানকান ভাইদেরও মনোযোগ আকর্ষণ করে। তখন থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত 'চা' ব্যবসাই ছিল ডানকানদের মূল ব্যবসা। তবে ওয়াল্টার ডানকান ১৮৫৯ সালে কোলকাতা পৌঁছে প্যাট্রিক প্লেফেয়ার নামক ব্যবসায়ীর সাথে যৌথভাবে যে ফার্মটি প্রতিষ্ঠা করেন তার নাম ছিল মেসার্স প্লেফেয়ার ডানকান এন্ড কোম্পানি, যার অফিস ছিল তৎকালীন ৬৪, ক্লাইভ স্ট্রিটে, বর্তমানে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস রোডে। একই বছর জানুয়ারিতে ওয়াল্টার তুলার ব্যবসা দিয়ে তার যাত্রা শুরু করেন।

চা ব্যবসা শুরু

ক্লাইভ স্ট্রিটের অফিসে জনৈক চার্লস স্টুয়ার্ট লেকির সাথে ওয়াল্টারের পরিচয় হয়। কাছাড়ের ডলু এবং জালিঙ্গা নামক দুটি চা বাগানের এজেন্সির সাথে স্টুয়ার্টের ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল। ১৮৬০-৬১ সালের দিকে স্বাস্থ্যগত কারণে মি. লেকি ভারত ত্যাগ করার পূর্বে প্লেফেয়ার, ডানকান এন্ড কোম্পানিকে তাঁর ব্যবসাটি বুঝিয়ে দিয়ে যান। এ সুযোগে ওয়াল্টার নিজের জন্য ডলু চা বাগানের কিছু শেয়ার কিনে নেন। এভাবেই ডানকানের চা ব্যবসার যাত্রা শুরু হয়। ১৮৬৯ সালে ওয়াল্টার ভারত ছেড়ে গ্লাসগো চলে যান। ১৮৭৪ সালে প্লেফেয়ারের সাথে অংশীদারি ব্যবসার সমাপ্তি ঘটিয়ে ডানকান ভাইয়েরা নিজেরাই ব্যবসা শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন। একই ধারাবাহিকতায় ১৮৭৫ সালের জানুয়ারিতে গ্লাসগোতে 'ওয়াল্টার ডানকান এন্ড কোম্পানি' এবং কোলকাতায় 'ডানকান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানি' যাত্রা শুরু করে।

১৮৮০ সালে তুলা ব্যবসার পতন শুরু হলে ডানকান কোম্পানি চা ব্যবসার দিকে ঝুঁকে পড়ে। কোম্পানিটি দ্বারা এ সময় নতুন নতুন চা বাগান অধিগ্রহণ করা হয় এবং ১৮৯০ সালের দিকে চা বাগানের সংখ্যা ১২টিতে উন্নীত হয়। চা চাষের অওতায় জমির পরিমাণ দাঁড়ায় ২৩৫০ হেক্টর। ১৯১০ সালের শেষের দিকে ম্যাকমিকিন পরিবারের নিকট থেকে আলীনগর কোম্পানি এবং এছাড়াও মাধবপুর, পত্রখোলা ও কুরমা চা বাগান তিনটি অধিগ্রহণের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য সংযোজন ঘটে। ১৯২৩ সালের শেষের দিকে বিভিন্ন দেশে কোম্পানির চা বাগানের সংখ্যা ৫০টিতে উন্নীত হয় যাদের ২০,০০০ হেক্টর আবাদি জমি থেকে বার্ষিক চা উৎপাদন ছিল ১৪.৫ মিলিয়ন কেজি। ১৯১৯-২১ সালের প্রকট মন্দার ধকল কাটিয়ে উঠতে

না উঠতেই ১৯৩১-৩২ সালের দিকে চা শিল্পে বিরাট পতন ঘটে। এতে ডানকান ব্রাদার্স খুব বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়নি এবং তারা সফলভাবে পরিস্থিতি সামাল দিতে সক্ষম হয়। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে বেশ কিছু জনবল কমানো হয়।

ভারত ভাগের পর ১৯৪৮ সালের ৩১ জুলাই কর্পোরেট কোম্পানিটি একটি পাবলিক কোম্পানিতে রূপান্তরিত হয়। ১৯৪৯ সালের ২০ জানুয়ারি ডানকান ব্রাদার্স (পাকিস্তান) লি. নামে চট্টগ্রামে এর সদর দপ্তর স্থাপিত হয়। এ সময় কোম্পানির দ্রুত প্রসার ঘটে। নতুন নতুন এলাকায় চা আবাদ চলতে থাকে। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর Duncan Brothers এবং Octavius Steel Co. একই মালিকের অধীনে আসে এবং ১৯৭০ সালের জানুয়ারিতে এর সদর দপ্তর চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় চা শিল্পেও মারাত্মক বিপর্যয় নামে। কোম্পানির বিভিন্ন সম্পদ, কারখানা এবং বাগানগুলোর মারাত্মক ক্ষতি হয়, কোন কোন ক্ষেত্রে যা কাটিয়ে ওঠা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ব্রিটিশ এবং পাকিস্তানিরা চলে যায়। বাংলাদেশ চা তখন বিশ্ববাজারে ছিল অপরিচিত। ফলে কারখানাগুলোতে তৈরি চা অবিক্রিত পড়ে থাকত। ১৯৭১-৭৪ সময়কালে কোম্পানি মারাত্মক আর্থিক সংকটে পড়ে। এ সময় Lawrie Group PLC সহায়তার হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসে। লরির সাথে ব্যবসায়িক সূত্রে ডানকান ব্রাদার্স যুক্তরাজ্যের Camellia PLC এর অন্তর্ভুক্ত হয়। বাংলাদেশের চা বিশ্ববাজারে ধীরে ধীরে জায়গা করে নিতে থাকে এবং গুণেমানে উন্নতি ঘটে। চা এর অভ্যন্তরীণ চাহিদাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। চা শিল্প এগিয়ে যায় এবং এ গ্রুপটির ভাগ্যও ফিরতে থাকে।

ক্যামেলিয়ার অন্তর্ভুক্ত হবার পর থেকে এর আকার আয়তন বাড়তে থাকে। বিগত তিন দশক যাবত চা ছাড়াও গ্রুপটি ইন্স্যুরেন্স, লীজ এবং অন্যান্য বহুবিধ ক্ষেত্রে ব্যবসা সম্প্রসারণ করতে থাকে। একই সাথে গ্রুপটি এদেশের এক চতুর্থাংশ চা উৎপাদন করে যাচ্ছে। Duncan দের সহযোগী কোম্পানি United Insurance, United Leasing এবং Duncan products ইত্যাদি।

ডানকানদের বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে দশটি চা বাগান আছে। এগুলো হচ্ছে, আমু, নালুয়া, চাঁনপুর, মাজদিহি, আলীনগর, চাতলাপুর, শমসেরনগর, লংলা, ইটা এবং করিমপুর। আশির দশকের প্রথমদিকে Bangladesh Tea Rehabilitation Project (BTRP) এর অধীনে Overseas Development Agency (ODA) এর অর্থায়নে চা পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় গতি আসে। ১৯৯০ দশকে গ্রুপটি চায়ে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে। ১৯৯২ সালে লক্করপুর, সিলুয়া ও রাজকি চা বাগান নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় সুরমা ভ্যালি টি কোম্পানি। তারপর হিংগাজির ও পাল্লাকান্দি চা বাগানদ্বয়

কোম্পানি কিনে নেয় এবং অবশেষে ২০০১ সালে কিনে নেয় চাকলাপুঞ্জি চা বাগান বর্তমানে ১৮,৫০০ হেক্টর এলাকাব্যাপী বাংলাদেশে ডানকান কোম্পানির ১৬টি চা বাগান আছে।

ডানকান চা উৎপাদন

কোম্পানির ১৬টি বাগানের ৯১০০ হেক্টর জমিতে বছরে ১২-১৩ মিলিয়ন কেজি চা উৎপাদিত হয়। প্রতি হেক্টরে গড় উৎপাদন ১৪০০ কেজির উপরে, যা গড় জাতীয় উৎপাদনের চেয়ে অনেক বেশি। চা উৎপাদন বৃদ্ধিতে অনুসৃত মৌল কার্যক্রম হচ্ছে নিজস্ব নার্সারিতে উন্নতমানের ক্লোন চারা উৎপাদন, কৃষি কৌশল উন্নয়ন, যথাযথ সার ব্যবস্থাপনা এবং পাতাচয়নের আদর্শমান বজায় রাখা ইত্যাদি।

হিংগাজিয়া এবং পাল্লাকান্দি ছাড়া অন্যান্য প্রতিটি বাগানের নিজস্ব আধুনিক যন্ত্রপাতি সজ্জিত চা কারখানা আছে। কারখানাগুলো জাতীয় গ্যাস গ্রীডের সাথে সংযুক্ত। সকল চা বাগান ও চা কারখানাগুলো ISO 22000 : 2005 সার্টিফাইড। তাদের রয়েছে নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা। সবগুলো বাগানেই CTC চা তৈরি করা হয় তবে শিলুয়া চা বাগানে একসময় Orthodox চা তৈরি করা হত এবং তা London Harolds এ বিক্রয় করা হত।

তথ্য উৎস : ডানকান ব্রাদার্স-এর ওয়েবসাইট http://www.duncanbd.com

তৎকালীন মেসার্স শাহ-ওয়ালেস পাকিস্তান লিমিটেড

মেসার্স শাহ-ওয়ালেস পাকিস্তান লিমিটেড এর আওতাধীন যেসব চা বাগান ছিল – তারমধ্যে রাজনগর, নিউসমনবাগ, লস্করপুর, শিলুয়া ও রাজকি প্রধান। ১৯৫৮ সালে উক্ত বাগানগুলোর রেজি. ভূমির পরিমাণ ছিল – ৪,৬২৩.৯০ একর এবং ১৯৫৮ সালে উক্ত বাগানগুলোর বার্ষিক উৎপাদন ছিল - ৪০,৭৩,২৯০ পাউন্ড চা।

মেসার্স জেমস ওয়ারেন এন্ড কোং লিমিটেড এর আওতাধীন চা বাগানগুলো ছিল – দেউন্দি, লালচন্দ, মির্তিঙ্গা ও ফুলতলা চা বাগান। ১৯৫৮ সালে উক্ত বাগানগুলোর রেজি. ভূমির পরিমাণ ছিল – ৩,৮০৪.৮৮ একর এবং ১৯৫৮ সালে এসব বাগানের উৎপাদন ছিল ২৫,৬৯,৫৮৬ পাউন্ড চা। পরবর্তীতে মেসার্স জেমস ওয়ারেন এন্ড কোং লিমিটেড এর নিকট বাগানগুলো হস্তান্তর করেন। তখন মি. ডি. ব্ল্যাক মেসার্স শাহ-ওয়ালেস পাকিস্তান লিমিটেড এর সি.ই.ও. ছিলেন। মি. ডি. ব্ল্যাক চট্টগ্রাম অফিসে বসতেন। এসময় মেসার্স শাহ-ওয়ালেস পাকিস্তান লিমিটেড এর শিপিং ব্যবসাও ছিল।

তথ্য উৎস : মো. আজিজুল আলম, মহাব্যবস্থাপক, কল্পনাপাহাড় চা বাগান।

ষষ্ঠ অধ্যায়

চায়ের জাত উন্নয়ন
(Varietal development of tea)

পূর্বের দু'একটি অধ্যায়ে আলোচনা করেছি যে, বাংলাদেশে চায়ের প্রথম আবাদ হয় চট্টগ্রামের হালদা ভ্যালিতে এবং বৃহত্তর সিলেটের সুরমা ভ্যালিতে ১৮৪০ থেকে ১৮৫৭ সালের সময়কালের মধ্যে। প্রায় একই সময়কালে উত্তরপূর্ব ভারতের আসাম, দার্জিলিং, তেরাই এবং ডুয়ার্সে চা-চাষ আবাদ শুরু হয়। সে সময় থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশ পর্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত অবিভক্ত চা-শিল্পে বিভিন্ন চা বাগানের মধ্যে যোগাযোগ এবং জ্ঞান ও উপকরণ বিনিময়ের মাধ্যমে অখণ্ড এবং সমান্তরাল অগ্রগতি সাধিত হয়। ফলে এতদঞ্চলের চা গাছগুলোর আদি বা পূর্বপুরুষ কোন একক উৎস থেকে আসেনি, বরং বিভিন্ন উৎস থেকে এসেছে।

প্রাথমিকভাবে চীন থেকে আগত বা চায়না শংকর (Hybrid) জাতের চায়ের প্রচলন ঘটেছিল। কিন্তু দ্রুতই এসকল চা গাছের বিস্তারকে নিরুৎসাহিত করা হয় এবং নতুন চা আবাদিতে অভ্যন্তরীণ আসামিকা (Assamica) জাতের বিভিন্ন প্রকার চা গাছের বিস্তার ঘটানো হয়। এসকল চা গাছের মধ্যে বিশেষ করে গাঢ় থেকে হালকা গাঢ় রঙের এবং মাঝারি থেকে বড় পাতাবিশিষ্ট চা গাছগুলোই প্রাথমিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তবে হালকা সবুজ রঙের জাতগুলোকে কম গুরুত্ব দেয়া হয়। কালক্রমে বহু বীজতলা বা নার্সারি প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং এসকল বীজতলা থেকে চারা উৎপাদিত হতে থাকে। আসামিকা জাতের গাঢ়শক্ত এবং মধ্যম আকৃতির পাতাবিশিষ্ট গাছগুলো এসকল বীজতলাতে লাগান হতো। এদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল আগাম পাতা-উৎপাদন।

বাংলাদেশের মণিপুর চা বাগানে Stiefalhagen brothers কর্তৃক ১৮৬০ সালে প্রথম এ ধরণের মানসম্মত বীজতলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এসকল বীজ মূলত

তৎকালীন বার্মা (বর্তমান ময়ানমার) থেকে সংগ্রহ করা হয় (Bezbaruah and Dutta 1974)। সে থেকে এসকল জাত মণিপুরি হিসেবে চা-জগতে পরিচিতি লাভ করে। মণিপুর, আমু, বালিশির, মির্তিঙ্গা এবং লস্করপুর থেকে সংগৃহীত জাতগুলোকে টোকলাই জার্মপ্লাজম ব্যাংকে ১৯১৮ সাল থেকেই সংরক্ষণ করা হয় Bezbaruah and Dutta, 1974)। বর্তমান বীজজাত গাছের অনেকগুলো পূর্বপুরুষ অতিক্রম করে এসেছে, যার সূচনা ১৯১০ সালের আগে নয়।

বাংলাদেশের চা জাতসমূহকে বংশগতির ভিত্তিতে চারটি পর্যায় অতিক্রম করতে হয়েছে। পর্যায়গুলো হচ্ছে –

১. ১৯৫০ এর বিভাগ পূর্ববর্তী দশকের ধীর এবং স্থির বিস্তারকাল।
২. ১৯৬০ এর দশকের দ্রুত এবং অবশ্যম্ভাবী (Mandatory) বিস্তারকাল।
৩. ১৯৭০ এর স্বাধীনতা পূর্ব দশকের পরিকল্পনা এবং কর্যক্রম পুনর্গঠনের সময়কাল।
৪. ১৯৮০ এবং ১৯৯০ এর দশকের গবেষণা ও উদ্ভাবনকে কাজে লাগিয়ে চা শিল্পের উন্নয়নে সত্যিকার সদ্ব্যবহারের সময়কাল।

এসকল পর্যায় চা শিল্পের উন্নয়নে ক্লোনাল বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ, সমৃদ্ধি এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল

চা শিল্পের উন্নয়নে উন্নত চাষ সামগ্রীর ভূমিকা

চা শিল্পের উন্নয়ন সূচকটি বোঝার সুবিধার্থে বাংলাদেশের চা-চাষ সময়কালকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা প্রয়োজন

১. ১৯৪৮ থেকে ১৯৭০ সময়কাল পর্যন্ত স্বাধীনতাপূর্ব সময়কাল
২. ১৯৭৩ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত স্বাধীনতা পরবর্তী সফল সময়কাল।

এ দুটি সময়কাল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ের চেয়ে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে চায়ের উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এর কারণ হতে পারে –

১. চা চাষাবাদের অগ্রগতি।
২. উৎপাদন কৌশলের সামাজিকীকরণ।
৩. উচ্চফলনশীল এবং অঙ্গজ বংশবৃদ্ধি বা ক্লোনসমূহের আবাদ।
৪. নতুন নতুন এলাকায় বীজ ও চা আবাদ।
৫. নিবিড় চাষাবাদ।
৬. নতুন ধারণা এবং উৎপাদন কৌশল আত্মীকরণ।
৭. লক্ষ ব্যবস্থাপনা।

স্টক রোপণ এবং বাংলাদেশে এর উন্নয়ন

১৯৪৭ থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে চা বীজ স্টক চাষ সম্প্রসারণ মোটেই উল্লেখযোগ্য ছিল না। এর পরিমাণ ছিল মাত্র ৯৩৪ হেক্টর। কিন্তু ষাটের দশকে এর সম্প্রসারণ ছিল উল্লেখযোগ্য, মোট ১১,৪০১ হেক্টর। এটি ছিল তৎকালীন সরকারের বাধ্যতামূলক সম্প্রসারণ নীতির ফল। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত সকল নতুন চা গাছ ছিল মূলত দেশে প্রাপ্ত বীজ এবং খুবই নগণ্য সংখ্যক আমদানিকৃত বীজ থেকে প্রাপ্ত জাত। ১৯৪৭ সালে মাত্র ২৮.৮ হেক্টর পুরাতন বীজবাড়ি (Seed baries) ছিল। পরবর্তী বিশ বছরে নতুন ১৮৩.৬৫ হেক্টর বীজ বাড়ি প্রতিষ্ঠিত হয়, যার অধিকাংশ ছিল আসামিকা জাতের নিচের ছকে যে সকল সাধারণ ও পুরাতন বীজ স্টক বিদ্যমান, তাদের এলাকার পরিমাণ এবং বৈশিষ্ট্য দেখানো হয়েছে।

সিডবাড়িতে গাছের প্রকার	প্রকৃতির পাতার বৈশিষ্ট্য	১৯৪৭ পূর্ববর্তী প্রতিষ্ঠিত		১৯৪৮ –১৯৭০		১৯৭০ সনে মোট	
		এলাকা (হেক্টর)	%	এলাকা (হেক্টর)	%	এলাকা (হেক্টর)	%
আদর্শ আসাম জাত	খুব বড় পাতা, গাঢ়/ হালকা গাঢ়/ হালকা সবুজ এবং নির্ভরশীল পাতা	৭.৭৫	২৬.৯১	৩১.৫৮	১৭.১০	৩৯.৩৩	১৮.৫১
প্রধানত আসাম কিন্তু মণিপুর এবং বার্মা মিশ্রিত	বড় থেকে মাঝারি পাতা বৈশিষ্ট্য, নিশ্চিত গাঢ় সবুজ পাতা	১৫.০৫	৫২.২৬	৭০.৮৩	৩৮.৫০	৮৫.৮৮	৪০.৪৩
আদর্শ মণিপুরি	মাঝারি পাতা, খুব গাঢ় সবুজ পাতা কিন্তু ঝুলন্ত পাতা নয়, শক্ত গাছ	৬.০০	২০.৮৩	৬১.০৯	৩৩.৫০	৬৭.০৯	৩১.৫৮
মিশ্রিত শংকর (উপরের তিনটির কোনটিই নয়)	মাঝারি/চায়না মিশ্রিত	-	-	২০.১৫	১০.৯০	২০.১৫	৯.৪৮
	মোট	২৮.৮০	১০০%	১৮৩.৬৫	১০০%	২১২.৪৫	১০০%

উৎস : উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের প্রকাশিত প্রতিবেদন, বিটিআরআই (আলম, ১৯৯৪)

ছক থেকে আমরা সে সময়ে বিদ্যমান অভ্যন্তরীণ বীজ সম্পদের একটি সুন্দর ধারণা পাই। ১৯৮০ সনে ৫৭টির মতো বীজবাড়ি ছিল কিন্তু পরবর্তী মাঠ উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণ কার্যক্রম শুরু করার পূর্বে এসকল বীজ বাগানের বীজমান মূল্যায়নের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু নিকট ভবিষ্যতে বীজজাত চা কিছু সময়ের জন্য প্রাধান্য বিস্তার করেই যাবে। বিদ্যমান চা গাছগুলোর মাতৃবীজ সমূহের (ছকে উল্লেখিত) ৫৮.৯৪% উন্নত আসাম জাত এবং পূর্ববর্তী প্রাধান্য বিস্তারকারী (Pre-dominant) আসাম বীজজাত গাছের শতকরা ৭৬ ভাগ বিদেশি কোম্পানি মালিকানাধীন বাগানে রয়েছে। ফলে তাদের বাগানেই ফলন এবং মানের দিক থেকে সবচেয়ে উন্নত জাতের চা গাছ রয়েছে এ গ্রুপের মোট ৬৬.১৪% এবং বীজজাত গাছের মধ্যে ৩১.৫৮% হচ্ছে অপেক্ষাকৃত কম ফলন মানসম্পন্ন মণিপুরি জাতের গাঢ় পাতা বৈশিষ্ট্য চা গাছ। মণিপুরি জাতের চা গাছের একমাত্র সুবিধা হল এগুলো শক্ত গড়ন সম্পন্ন, ভালোভাবে অভিযোজিত এবং দীর্ঘজীবী গাঢ় পাতাবিশিষ্ট এ মণিপুরি জাতের চা তাদের বাগানগুলোতে খুবই জনপ্রিয়।

শংকরজাতের চা গাছগুলোও গুণেমানে অন্যান্য গাছের তুলনায় খারাপ নয়। এ জাতীয় চা গাছ মাত্র ৯.৪৮ শতাংশ যার মধ্যে বিদেশি গ্রুপের কোম্পানিসমূহের অওতায় আছে তাদের নিজস্ব গাছের ৬২.১৩ শতাংশ। অতীতে বীজজাত চারাগাছ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত চা বাগানগুলোতে দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে সে সময়ে প্রাপ্য সবচেয়ে ভালো জাতের গাছই লাগানো হয়েছিল।

সে সকল বীজজাত যা হারিয়ে গিয়েছে কিন্তু এখনও চা বাগানগুলোতে সেগুলোর উত্তর-পুরুষ গাছগুলো বিভিন্ন সেকশনে সুশোভিত রয়েছে, তাদের মধ্যে যথাযথ জরিপ চালিয়ে সঠিক ইতিহাস পুনরুদ্ধার করা সম্ভব এবং পুনরায় বীজ-স্টক গড়ে তোলা সম্ভব।

বীজজাতের কিছু চায়ের ফলন এবং মান

বাংলাদেশের ৫৭টি বিদ্যমান বীজ বাগানের বীজগুলোর মান যাচাইয়ের প্রক্রিয়া বিটিআরআই কর্তৃক এ পর্যন্ত ৪৪টি বীজের উপর জরিপ চালানো হয়েছে এবং বীজতলায় এদের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা, বৃদ্ধি এবং চারাগাছের প্রকৃতি সম্পর্কে ভিত্তি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছিল। বীজতলায় সার্বিক দিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট এ ধরণের ১৮টি প্রতিশ্রুতিশীল স্টক নিয়ে পূর্নমূল্যায়ন করা হয়। এতে দু' সেট স্টক ব্যবহার করা হয় এবং BTS1 নামে একটি বাইক্লোনাল বীজ স্টককে তুল্য নিয়ামক ধরা হয়। এগুলো বিলাসছড়া পরীক্ষণ খামারের টিলার ঢালে ১৯৮৭ সালে দুটি ভিন্ন মাঠ যাচাইয়ের মাধ্যমে তুলনা করা হয় (Alam, 1994)। এ পরীক্ষণটির মাধ্যমে সাধারণভাবে প্রমাণিত

হয় যে, বেশির ভাগ আসাম এবং আসামজাতের বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন চা ফলনের ক্ষেত্রে বাইক্লোনাল BTS1 এর সমতুল্য, যেখানে কিছু মণিপুরি চা নিম্নমান সম্পন্ন হিসাবে প্রমাণিত হয়। শুধুমাত্র একটি হালকা-পাতা বিশিষ্ট আসাম এবং একটি আদর্শ মণিপুরি জাত ছিল সাধারণ মানের ঠিক নিচে। অন্যান্যগুলো ছিল গ্রহণযোগ্য গড়মানের বা বেশি (Alam, 2002)।

আমাদের চা শিল্প পৃথিবীর চা গবেষণার পথিকৃৎ টোকলাই দ্বারা বিশালভাবে প্রভাবিত। এ সংশ্লিষ্টতা এখনও আছে এতদসত্ত্বেও বাংলাদেশের খুব কম চা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ টোকলাই এর পলিক্লোনাল এবং বাইক্লোনাল বীজ সম্পর্কে অবগত। ১৯৫৪ সালে আসামের সমতল ভূমির জন্য টোকলাই কর্তৃক 'গৌরীশংকর' নামে (Stock 203) একটি পলিক্লোনাল বীজ উদ্ভাবন করে। তাছাড়া দার্জিলিং এর উঁচু ভূমির জন্য 'নন্দদেবী' (Stock-378) নামে একটি বাইক্লোনাল বীজ উদ্ভাবন করে পরবর্তীতে তারা আরও নয়টি বাইক্লোনাল শংকরজাত বীজ স্টক উদ্ভাবন করেছে। তাছাড়া চা শিল্পের জন্য দক্ষিণ ভারতের উপাসি (UPASI TRF) চা গবেষণা কেন্দ্র এরূপ অরও পাঁচটি বাইক্লোনাল বীজ স্টক উদ্ভাবন করেছে।

বাংলাদেশে ১৯৭০ সাল অবধি এসকল বীজ স্টক এবং তাদের গুরুত্ব সম্পর্কে চা-করদের কোন পরিষ্কার ধারণাই ছিল না। ১৯৭৪ সালে বিটিআরআই BTS1 এবং BTS2 নামে দুটি বীজ স্টক উদ্ভাবন করে (Alam *et al* 1974)। কিন্তু চা শিল্প এদের গুরুত্ব সম্পর্কে অনুধাবন করতে পারে ১৯৭৯ সালে, যখন বাংলাদেশ চা পুনর্বসন প্রকল্পের আওতায় উন্নতজাতের বীজ এবং ক্লোনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ফলে চা-করদের মধ্যে বাই-ক্লোনাল স্টক সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৮ সন থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশের ৪৮টি চা বাগানে BT1 এবং TV1 থেকে প্রাপ্ত BTS1 স্টকটি ৬৪.৬৮ হেক্টর জমিতে চাষাবাদ করা হয়েছে। এগুলো থেকে প্রত্যায়িত বীজ উৎপাদিত হচ্ছে। BT1 এবং TV19 থেকে প্রাপ্ত BTS3, ৭ হেক্টর জমিতে আবাদ করা হয়েছে। ২০০২ সনে B207/39 এবং TV19 থেকে প্রাপ্ত BTS4 নামে আরেকটি স্টক সুপারিশ করা হয়েছে। পলিক্লোনাল বীজ স্টকের সংখ্যা মাত্র তিনটি। এদের মধ্যে দুটি মণিপুরি জাতের। এগুলো হচ্ছে মির্তিঙ্গা পলিক্লোনাল এবং আলীনগর পলিক্লোনাল। তৃতীয়টি বিটিআরআই কর্তৃক ভাড়াউড়া চা বাগানে উদ্ভাবন করা হয়। মোট ৭.৭ হেক্টর জমিতে এ ধরনের বীজ স্টক রয়েছে কিন্তু এগুলো খুবই উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া ফেলতে পারেনি। তাই অবহেলিত অবস্থায় রয়েছে কিংবা বাই-ক্লোনাল স্টক বা স্বাভাবিক প্লাকিং সেকশনে পরিণত হয়েছে।

বাংলাদেশে প্রচলিত চায়ের জাত (Agrotypes)

চা গাছ Theaceae পরিবারের একটি দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ। এ উদ্ভিদের আদি পূর্বপুরুষের ইতিহাস মহাকালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। এটি একটি উভলিঙ্গ (bisexual) উদ্ভিদ এবং প্রধানত পর-পরাগায়নের (cross-fertilization) মাধ্যমে এর বীজ উৎপন্ন হয়। সেক্ষেত্রে প্রজাতির বিশুদ্ধতা রক্ষিত হয়নি বরং বিভিন্ন প্রকার জাত বা Agrotype এর উৎপত্তি ঘটেছে। সাম্প্রতিক শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী শ্রেণিবিন্যাসের আওতায় চা গাছের তিনটি ট্যাক্সা (Taxa) বা দল আছে। এ ট্যাক্সাগুলো ভৌগলিকভাবে তিনটি অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করে। এ অঞ্চলগুলো হচ্ছে - আসাম, চায়না এবং ইন্দো-চায়না। প্রথম দুটি অঞ্চল থেকে আমরা দুটি প্রকরন (Variety) পেয়েছি, যথা- '*assamica*' এবং '*sinensis*' তৃতীয় অঞ্চলের চা গাছকে 'southern form' বা 'Camboid form' বলা হয়।

ইতিপূর্বে Watt এবং Mann বিভিন্ন এগ্রোটাইপ সনাক্তকরার ক্ষেত্রে পাতায় বিদ্যমান শিরার সংখ্যা বিবেচনা করেন। তাঁদের মতে, ৮ জোড়া শিরাযুক্ত পাতা হচ্ছে বিশুদ্ধ চায়না চা, ১৬ জোড়া শিরাযুক্ত পাতা হচ্ছে বিশুদ্ধ আসাম চা, ১৬ জোড়ার চেয়ে বেশি হলে তা মণিপুরি বা বার্মা চা এবং হাইব্রীড বা শংকরজাতের চায়ের ক্ষেত্রে সাধারণত ৯-১২ জোড়া শিরা থাকে। বিভিন্ন জাতের চায়ের উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা করা Sealy (1958) এ মত দেন যে, *Camellia sinensis* var. *sinensis* এবং *Camellia sinensis* var. *assamica* এ দুটি অবিসংবাদিত ভ্যারাইটি ব্যতিরেকে অন্যান্য কথিত ভ্যারাইটিসমূহের শ্রেণিবিন্যাসগত দিক দিয়ে কোন পৃথক বিশেষত্ব নেই। কখনো কখনো ভ্যারাইটিগুলোকে জাত (Jat) হিসেবে অভিহিত করা হয়, যা এর উৎপত্তিস্থান বা আদি পূর্বপুরুষ উদ্ভিদগোষ্ঠী নির্দেশক, অর্থাৎ শুধুমাত্র ভৌগলিক গুরুত্বই বহন করে। কিন্তু এ ধরনের বিন্যাস বিভিন্ন প্রকরনের পুষ্পপত্র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও ধারণা দেয়, যা যথেষ্ট বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। বর্তমানে অধিকাংশ চাষকৃত চা গাছ তিনটি জাতের উত্তরসূরী বলে মনে করা হয়, বিশেষ করে 'assamica' এবং 'sinensis' প্রকরণ দুটির মধ্যে আন্তঃভ্যারাইটি ক্রসের মাধ্যমে প্রাপ্ত। গাছের আকার, পাতার গঠন ও বিন্যাস, ফলন ও গুণাগুণের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের চা গাছগুলোকে ৭টি উপজাত বা 'Agrotype' এ ভাগ করা যায়, নিম্নে সেগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হল।

- আসাম জাত: এ গাছগুলো কিছুটা বৃক্ষ (tree) আকৃতির, অসংখ্য পৃথক শাখাযুক্ত, সুস্পষ্ট শীর্ষদেশ প্রাকৃতিকভাবে উচ্চতায় ১০-১৫ মিটার হয়। পাতাগুলো হালকা থেকে গাঢ় সবুজ বর্ণের। চকচকে, নিচের দিকে ঝুলানো। পাতার শিরাগুলো খুব স্পষ্ট থাকে, অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ আকার হয়। পাতাগুলো দৈর্ঘ্যে ৮-২০ সে.মি. এবং প্রস্থে ৩.৫-৭.৫ সে.মি.। দুই

শিরার মধ্যবর্তী স্থান যথেষ্ট স্ফীত। কচি পাতার নিচের দিকে সাদা লোমের আধিক্য দেখা যায়। বাংলাদেশের চা বাগানগুলোতে আসাম জাতের চায়ের চাষ বাদ সীমিত।

২) চায়না জাত: ছোট আকৃতির ঝোপালো গাছ। ২-৩ মিটার উঁচু হয়, গোড়া থেকে অসংখ্য খাড়া শাখা বের হয় এবং দেখতে গম্বুজের মতো লাগে। পাতাগুলো ছোট ছোট, খাড়া, পুরু, পার্ভিফ্লোরা (Parviflora) জাতীয় চায়না গাছের পাতার দৈর্ঘ্য ১ - ২.২ সে.মি. এবং প্রস্থ ১ - ২.২ সে.মি. প্রস্থ হয়। আবার ম্যাক্রোফাইলা (Macrophylla) জাতীয় চায়না জাতের পাতার দৈর্ঘ্য ৪-১৪ সে.মি. এবং প্রস্থ ২.২-৫ সে.মি. পর্যন্ত হয়ে থাকে। সংক্ষিপ্ত বৃন্তযুক্ত পত্রফলক উপবৃত্তাকার অগ্রভাগ ভোঁতা, পত্রফলকের কিনারা ভোঁতা খাঁজকাটা, চর্মবৎ, গাঢ় সবুজ, কুঁড়ি এবং প্রথম পাতাটি অসংখ্য রোমযুক্ত থাকে। কচি পাতাগুলাতে লাল বর্ণ কণিকার উপস্থিতির জন্য কিছুটা লালচে, খাটোবৃন্তযুক্ত এবং খাড়া থাকে। ফুলের সংখ্যা অনেক এবং ফুলগুলো আগাম ফোটে। এ জাতের চা গাছ খুব বেশি দেখা যায় না, তবে বাংলাদেশের কিছু কিছু চা বাগানের পুরাতন সেকশনে শুধুমাত্র দেখা যায়। পোকামাকড়ের উপদ্রব বেশি হয়। লালমাকড় এবং রেডরাস্ট রোগ খুব বেশি দেখা দেয়। ফলন কম এবং লিকার পাতলা ও ক্ষেত্র বিশেষে সুগন্ধি পেয়ালিমান (cup-quality) সম্পন্ন।

৩) মণিপুরি জাত: আসামজাতের চায়ের সাথে এ জাতীয় চা গাছের মিল আছে তবে পাতাগুলো আসামজাতের পাতার চেয়ে ক্ষুদ্রাকৃতি, গাঢ় সবুজ বর্ণের অমসৃণ, অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ নিচের দিকে ঝুলানো থাকে। দৈর্ঘ্যে পাতাগুলো ১৫.৪-২০.৬ সে.মি. হয় এবং প্রস্থে ৬.৫-৯ সে.মি. হয়ে থাকে। সচরাচর পাতার উভয় দিকে ২২টি করে শিরা থাকে। কচি পাতায় কদাচিৎ সাদা রোমের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। গাছগুলো তুলনামূলকভাবে খরা সহিষ্ণু এ জাতীয় চা গাছ বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি। গুণগতমান চলতিমানের। পোকামাকড়ের আক্রমণ কম হয়। খুব সহজেই অঙ্গজ বংশবিস্তার ঘটে।

৪) বার্মা জাত: এ জাতীয় চা গাছ আসামজাতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। পাতাগুলো চকচকে, গাঢ় সবুজ, মধ্যম বা বড় আকৃতির কিন্তু আসামজাতের পাতার চেয়ে ছোট এবং সামান্য গোলাকৃতি। পাতাগুলো খাড়া, শীর্ষভাগ সুস্পষ্ট, বিস্তৃত এবং ভোঁতা কিনারাবিশিষ্ট, উপর দিকে কিছুটা অবতল, কোন রোম থাকে না পোকামাকড়ের উপদ্রব অনেক কম হয়। ফলন ও

টি এগ্রোটাইপস

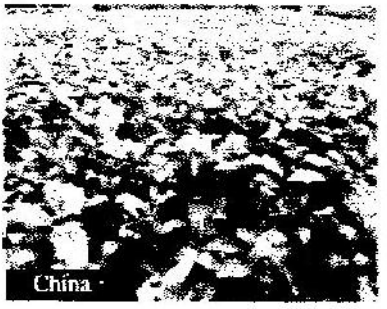

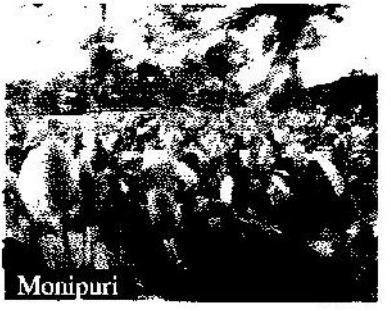

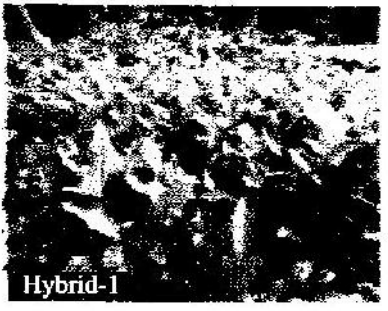

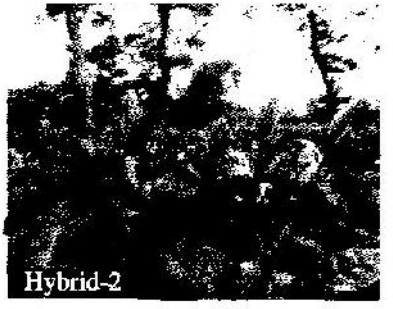

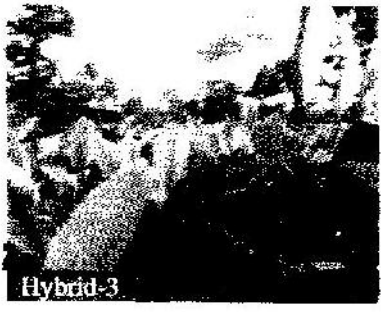

ক্লোন চা

গ্রাফটিং, লেয়ারিং, কাটিং, টিস্যু কালচার ইত্যাদি যে কোন অঙ্গজ পদ্ধতিতে কোন উদ্ভিদের মূল, কাণ্ড, পাতা, রাইজোম বা দেহের যে কোন অংশ থেকে যে সকল নতুন উদ্ভিদ পাওয়া যায়, তাদেরকে ক্লোন বলা হয়। এ ক্ষেত্রে ফুল ও বীজের কোন ভূমিকা থাকে না।

ক্লোনের মাধ্যমেই বিশ্বব্যাপী চায়ের ফলন এবং গুণগতমান বৃদ্ধি পেয়েছে। চা-করদের নিকট একই ধরনের অঙ্গসংস্থানিক এবং গুণগতমান সম্পন্ন চায়ের চাহিদা থাকায় তা পূরণের জন্য অঙ্গজ উপায়ে বংশবিস্তার করা ছিল অনেকটা বাধ্যতামূলক। কেননা অঙ্গজ বংশবিস্তার পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাপ্ত গাছগুলো আকার-আকৃতি, ফলন এবং গুণেমানে একইরকম হয়। এর আলোকে ইন্দোনেশিয়াতে লেয়ারিং, বাডিং বা কাণ্ডে গ্রাফটিং এর মাধ্যমে অঙ্গজ উপায়ে চায়ের বীজবাগান প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিশ্বের বিভিন্ন চা উৎপাদনকারী দেশে কাটিং এর মাধ্যমে অঙ্গজ বংশবিস্তারের উদ্যোগ নেয়া হয় এ বিষয়ে প্রায় একই সময়ে সফলতার রিপোর্ট দেন ভারত থেকে Tunstall (1931), শ্রীলংকা থেকে Tubbs (1932) এবং ইন্দোনেশিয়ার জাভা থেকে Wellensiek (1933) নামক বিজ্ঞানীগণ। কিন্তু বর্তমানকলের একক পত্রবিশিষ্ট আন্তঃপর্ব কাটিং এর গুণগতমান অর্জন করার জন্য অনেকদিন সময় লেগেছে। এখানে পুনরায় উল্লেখ করছি যে, এ কৌশলের মাধ্যমে উপমহাদেশে ১৯৪৯ সালে ভারতের টোকলাই পরীক্ষণ কেন্দ্র থেকে TV1, TV2 এবং TV3 নামক প্রথম ক্লোন চা অবমুক্ত করা হয়। এর ফলে ক্লোন চা এবং জাত উন্নয়ন গবেষণায় গতি সঞ্চারিত হয় এবং ১৯৬০ এর মধ্যেই বিভিন্ন আবহাওয়া উপযোগী অধিকাংশ জাত সাফল্যজনকভাবে মাঠপর্যায়ে ফলনে অবদান রেখে টোকলাই পরীক্ষণ কেন্দ্র এক্ষেত্রে উপমহাদেশে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে।

বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (তৎকালীন পাকিস্তান চা গবেষণা কেন্দ্র) ১৯৬৬ সালে প্রথম ক্লোন চা অবমুক্ত করতে সক্ষম হয়। বাংলাদেশে সুরমা ভ্যালির শমসেরনগর চা বাগানে TV1 জাতের টোকলাই ক্লোন চায়ের কিছু নিদর্শন রয়েছে। টিভি১ ক্লোনটি কোয়ালিটি ক্লোন হিসেবে বাংলাদেশের সব চা বাগানেই কমবেশি লাগানো আছে। ১৯৭০ সালের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশে ব্যাপক ক্লোন চাষাবাদের উল্লেখযোগ্য বিস্তার ছিল না। বর্তমানে প্রায় শতকরা চল্লিশ ভাগ আবাদই ক্লোন।

প্রধান চা উৎপাদনকারী দেশসমূহে ক্লোন চায়ের মাধ্যমে জাত উন্নয়নের সংক্ষিপ্ত পটভূমি

ভারত

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে স্থাপিত টোকলাই পরীক্ষণ কেন্দ্র থেকে ৩২টি ক্লোন চা

অবমুক্ত করা হয়েছে। দক্ষিণ ভারতের উপাসি চা গবেষণা ইনস্টিটিউট ২৮টি ক্লোন উদ্ভাবন করা হয়েছে। এর ফলে উত্তর-পূর্ব ভারতে ২০১৪ সালে হেক্টর প্রতি ফলন ১৪১৬ কেজি থেকে ১৮৫০ কেজিতে বৃদ্ধি পায় এবং একই সময়ে দক্ষিণ ভারতে হেক্টর প্রতি ১৬৪৫ কেজি থেকে ২৩০০ কেজি ফলন বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া প্রতিযোগিতামূলক ক্লোন চায়ের গ্রাফটিং এর মাধ্যমে মাতৃ উদ্ভিদ থেকে ২০ থেকে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত অধিক ফলন পাওয়া গেছে। ১৯৯০ সালে তাদের মোট জাতীয় উৎপাদন ছিল হেক্টর প্রতি ১৭২৯ কেজি যা বৃদ্ধি পেয়ে হেক্টর প্রতি ২০১৪ সালে হয়েছে ১৮৬৫ কেজি।

শ্রীলংকা

শ্রীলংকায় পুরাতন বীজজাত চায়ের উৎপাদন ছিল হেক্টর প্রতি ১০০০ কেজি। ১৯৫২ থেকে ১৯৬০ সময়কালে তাদের প্রথম 'সেলানি সিরিজ ২০০০' এর আওতায় উঁচু ভূমিতে ক্লোন চা থেকে হেক্টর প্রতি ২৫০০ কেজি এবং নিচু ভূমিতে আরও বেশি ফলন পাওয়া যায়। সে থেকে বিভিন্ন নামে ক্লোন সিরিজ অবমুক্ত করা হয়। ১৯৬০ থেকে ১৯৭০ সময়কালে TRI 3000 সিরিজের মাধ্যমে হেক্টর প্রতি ফলন ২৫০০ থেকে ৩০০০ কেজি, TRI 4000 সিরিজের মাধ্যমে ২৭০০ থেকে ৪০০০ কেজি পর্যন্ত ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৯০ সালে তাদের জাতীয় উৎপাদন ছিল হেক্টর প্রতি ১০৫৫ কেজি থেকে ২০১৪ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয় হেক্টর প্রতি ১৭৬৫ কেজি।

কেনিয়া

কেনিয়াতে ১৯৬৭ সন থেকে জাত উন্নয়নে গবেষণা শুরু হয় তখন থেকে KTDA কর্তৃক ভিপি পদ্ধতির মাধ্যমে গবেষকগণ জাত উন্নয়নে দ্রুত সফলতা লাভ করে এবং আশানুরূপ ফলন বৃদ্ধি করতে সক্ষম হন। কেনিয়াতে ক্ষুদ্র চা-চাষীদের ৭০ শতাংশ চা গাছ টোকলাই জার্মপ্লাজম উৎসের ৬/৮ নামক ক্লোন চা। ক্ষুদ্র চা-চাষিরা কেনিয়ার মোট চা উৎপাদনের ৫৬ শতাংশ উৎপন্ন করে থাকেন। ১৯৯০ সালে যেখানে তাদের মোট জাতীয় উৎপাদন ছিল হেক্টর প্রতি ২০৩০ কেজি, সেখানে ২০১৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় হেক্টর প্রতি ২০৮৩ কেজি

ইন্দোনেশিয়া

ইন্দোনেশিয়ার জাভার গ্যামবুং এ অবস্থিত চা এবং সিনকোনা গবেষণা কেন্দ্র ১৯৮৫ সালে TRI 2024 এবং TRI 2025 নামক দুটি জনপ্রিয় ক্লোন অবমুক্ত করে। বর্তমানের সকল চা গাছই গ্যামবুং এর ধারাবাহিক ক্লোন থেকে উৎপন্ন, যেমন জিএমবি নং ১, ২, ৩, ৪, ৬, ৭ এবং ৯ ইত্যাদি। বর্তমানে Blister blight রোগ প্রতিরোধী GMB7 ক্লোন হচ্ছে মোট ক্লোন গাছের ৬০ শতাংশ

তাদের জাতীয় উৎপাদন ১৯৯০ সালে ছিল হেক্টর প্রতি ১১৮৯ কেজি যা ২০১৪ সালে হয়েছে হেক্টর প্রতি ১১৭৪ কেজি।

চীন

Chinese Academy of Agricultural Science (CAAS) এর ব্রিডিং এন্ড কাল্টিভেশন বিভাগ নতুন নতুন চা জাতের নির্বাচন এবং জার্মপ্লাজম সংগ্রহে অগ্রাধিকার দেয়। গোয়াংডং চা গবেষণা প্রতিষ্ঠানে দুটি জনপ্রিয় ভ্যারাইটি তৈরি করা হয়েছে, যাদের নাম ইং হং নং-২ (আসামিকা – চায়না) এবং জিন হং – একটি মুক্ত পরাগায়িত শংকর। হেক্টর প্রতি তাদের উৎপাদন ছিল ২২৫০ কেজি তবে উলং চায়ের কিছু ভ্যারাইটি ৩০০০ কেজি পর্যন্ত উৎপাদনশীল। গোয়াংজু চা গবেষণা কেন্দ্রে দুটি ভ্যারাইটি উৎপাদন করা হয়েছে যাদের নাম গুই হং-৩ (Guihong 3) এবং গুই হং-৪ (Guihong 4) । আরেকটি ভ্যারাইটি সবুজ চায়ের জন্য উৎপাদিত হয়েছে যার নাম গুইনি (Guini) । উল্লেখ্য যে, পূর্বোক্ত গুইহং ৩, ৪ থেকে ভালোমানের কালো চা সংগৃহীত হয়। এসকল জাত গড়ে হেক্টর প্রতি ৩০০০ কেজি পর্যন্ত উৎপাদন দিয়ে থাকে। তাদের জাতীয় উৎপাদন ১৯৯০ সালে ছিল হেক্টর প্রতি ৫০৮ কেজি যা ২০১৪ সালে হয় ৭৬৮ কেজি।

জাপান

১৯৯০ সাল পর্যন্ত জাপানের ৯০ শতাংশ চা গাছ ছিল বীজজাত। তখন থেকে বহু ক্লোন তৈরি করা হয়েছে এবং বর্তমানে প্রধান প্রধান এলাকার ৮০ শতাংশ চা গাছই ক্লোন চা। শতকরা ৮৫ ভাগেরও বেশি ক্লোন চা হচ্ছে 'Yabukita' নামক কাল্টিভার। চায়ের বিস্তার অঙ্গজ উপায়েই হচ্ছে। ১৯৯০ সালে তাদের জাতীয় উৎপাদন ছিল ১৫৩৬ কেজি/হেক্টর যা ২০১৪ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে হেক্টর প্রতি ১৭৪৫ কেজি।

জর্জিয়া (সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন)

Bokhtadze এর রিপোর্ট অনুযায়ী রাশিয়ার জর্জিয়াতে অবস্থিত Chovkwa Sub-station তাদের সর্বাধিক জনপ্রিয় ক্লোন নং ২৫৭ এর ফলন হেক্টর প্রতি ৪৬০০ থেকে ৫৪৫০ কেজি (Dey 1971)। এখানে উল্লেখ্য যে জাপান ও জর্জিয়াতে চা চাষ ও প্রস্তুতিতে অন্যান্য দেশের সঙ্গে পার্থক্য রয়েছে। এখানে মাঠের প্রায় সবটাই যান্ত্রিক আবাদি। ফলে ফলন বেশি পাওয়া যায়।

বাংলাদেশ

বাংলাদেশে বিটিআরআই কর্তৃক ১৯৫৯ সালে ক্লোনাল নির্বাচনের মাধ্যমে জাত উন্নয়ন কার্যক্রমের সূচনা ঘটে।

১৯৬৬ সাল থেকে অদ্যাবধি Standard clone. Yield clone এবং Quality clone নামে বিভিন্ন মানের ১৮টি ক্লোন বিটিআরআই কর্তৃক অবমুক্ত করা হয়েছে। যা বিটি১ থেকে বিটি১৮ নামে পরিচিত। মাঠ পর্যায়ে স্বাভাবিক পরিবেশে এদের হেক্টর প্রতি উৎপাদন ক্ষমতা ৩০০০ কেজি থেকে ৪০০০ কেজি, যদিও কোন কোন ক্লোনের ক্ষেত্রে তা ৫০০০ কেজি পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে। বাংলাদেশের গড় জাতীয় চা উৎপাদন ১৯৯০ সালে হেক্টর প্রতি ছিল ৯৬৩ কেজি যা ২০১৫ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হেক্টর প্রতি ১২৭০ কেজিতে দাঁড়িয়েছে।

BT1

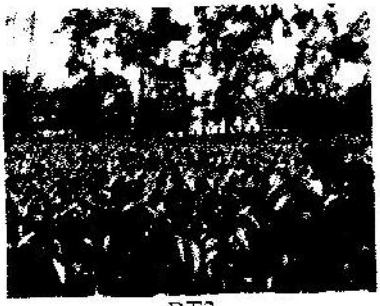

BT2

BT3

BT4

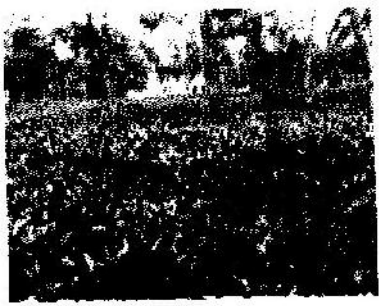

BT5

BT6

BT7

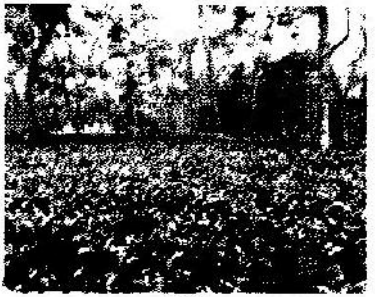

BT8

BT9

BT10

BT11

BT12

BT13

BT14

BT15

BT16

BT17

BT18

এক নজরে বিভিন্ন দেশের জনপ্রিয় ক্লোনসমূহ এবং জাতীয় উৎপাদন-

দেশ	ক্লোন	জাতীয় উৎপাদন (কেজি/হেক্টর)		ফলন (কেজি/হেক্টর) পার্থক্য অর্জন
		১৯৯০	২০১৪	
ভারত	TV1–TV32,UPASI 1-28, TRI 1–4, Biclonal BSS1 – BSS5, Biclonal seed 1 - 14	১৭২৯	১৮৬৫	+১৩৬
শ্রীলংকা	TRI 2000, TRI 3000 এবং TRI তাছাড়া 4000, TRI 5000 (যন্ত্রস্থ)	১০৫৫	১৭২৬	−৭০১
কেনিয়া	TRFK 303/577, TRFK 11/4	২০৩০	২০৮৩	+৫৩
ইন্দোনেশিয়া	GAMBUNG (GMB) সিরিজের ৯টি ক্লোন GMB7 (৬০%)	১১৮৯	১১৭৪	-১৫
চীন	Longjing 43, Longjing Changye, Biyun	৫০৮	৭৬৮	+২৬০
জাপান	YABUKITA (৮৫%)	১৫৩৬	১৮০৭	−২৯১
বাংলাদেশ	BT series - 13 টি অধিকাংশ BT1 এবং BT2	৯৬৩	১২৫০	−২৮৭

সূত্র : Varietal Development of Tea in Banglacesh (Alam, 2002)

স্বাধীনতা পরবর্তী দশকে বাংলাদেশের মাঠ পর্যায়ে নতুন চা -এর আবাদ ছিল মাত্র ১০৪৪ হেক্টর। ১৯৯৩ সন পর্যন্ত ১৩ বছরে আরও ৪১৫৬ হেক্টর নতুন জমি চা চাষের আওতায় আসে। উভয়ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধিতে ক্লোন চায়ের অবদান প্রায় ১০ শতাংশ ছিল ১৯৪৭ সনে দেশভাগের পরবর্তী সময়ে এবং স্বাধীনতা পরবর্তী দশকগুলোতে বাংলাদেশ চা চাষের আওতায় মোট এলাকা, উৎপাদন এবং হেক্টর প্রতি ফলন সম্পর্কে নিচের সারণি থেকে ধারণা পাওয়া যাবে।

বর্তমানে বিভিন্ন উৎস থেকে নির্বাচন এবং ব্রিডিং এর মাধ্যমে প্রাপ্ত সত্তরটি ক্লোন থেকে বাছাইকৃত দুটি ক্লোন অবমুক্তকরণ পূর্ববর্তী যাচাই প্রক্রিয়ায় প্রতিশ্রুতিশীল বিবেচিত হওয়ায় মাঠ পর্যায়ে অবমুক্তকরণের অপেক্ষায় আছে। অবমুক্ত করা হলে আগামী বছরগুলোতে উৎপাদন বৃদ্ধিতে এ ক্লোনগুলো ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। বীজতলা এবং মাঠপর্যায়ে বীজচারা এবং ক্লোনের কিছু তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য নিচের ছকে উল্লেখ করা হল। এ থেকে বীজ বা ক্লোন নির্বাচনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সতর্কতার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যাবে।

পরীক্ষণ স্থল	বৈশিষ্ট্য	বীজ	ক্লোন
বীজতলা	বৃদ্ধি	সহজে বৃদ্ধি পায়, কোন বিশেষ কৌশল অবলম্বনের প্রয়োজন নেই	বীজতলায় বিশেষ কৌশল অবলম্বনের প্রয়োজন হয়।
	অঙ্কুরোদ্গম/ মূলোৎপাদন	মাটি দ্বারা তেমন প্রভাবিত নয়	মাটি দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত
	বিশেষ পরিচর্যা	বাধ্যতামূলক নয়, কারণ বীজে সঞ্চিত খাদ্য থাকে এবং ক্ষত মুকুল ও ক্ষতমূল থাকে।	জরুরি, কেননা মূল সৃষ্টিকারী টিস্যুগুলোর খাদ্য সরবরাহ করা প্রয়োজন হয়।
	বাহ্যিক এবং জিনগত ভিন্নতা	খুব বেশি	অভিন্ন
মাঠ	উপযোগী আবহাওয়া	বিভিন্ন আবহাওয়া উপযোগী	সুনির্দিষ্ট আবহাওয়া উপযোগী
	মাটির ভিন্নতা	সহনশীল	নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের মাটিতেই ভালো জন্মায়
	খরা সহিষ্ণুতা	সহনশীলতার মাত্রা অনেক বেশি	সংবেদনশীল
	বিভিন্ন চাষ প্রণালী	কম প্রভাবিত হয়	যথেষ্ট প্রভাবিত হতে পারে
	বালাই এবং রোগ	ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রভাবিত হয়	সুস্পষ্ট এবং সমানভাবে প্রভাবিত হয়।
	আয়ু	সাধারণত দীর্ঘায়ু	উৎস এবং জেনোটাইপ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন হয়

চাষ প্রণালি এবং প্রক্রিয়াকরণের প্রভাব

উন্নত ক্লোন বা বীজ এবং বিভিন্ন এগ্রোটাইপের ক্ষেত্রে উপযোগী চাষ প্রণালি বা সার ব্যবস্থাপনা এখন পর্যন্ত নির্ধারণ করা যায়নি তবে সাম্প্রতিককালে ফলনে সার ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। সর্বোচ্চ ফলন পেতে হলে বিভিন্ন এগ্রোটাইপ, জাত এবং ক্লোনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাটিতে প্রয়োজনীয় সার প্রয়োগ কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান থাকা জরুরি। তাছাড়া জাতভেদে বালাইয়ের উপদ্রব এবং দমন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কিছু গবেষণা হয়েছে এবং তার ভিত্তিতে সুপারিশের আলোকে বালাই ব্যবস্থাপনা কৌশল নির্ধারণ করা সহজতর হয়েছে।

যদিও প্রতিটি ক্লোনের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতির সুবিধা নির্ধারণ করা হয়েছে, কিন্তু বাণিজ্যিকভাবে এদের প্রয়োগ এখনও করা সম্ভব হয়নি বরং বাগান পর্যায়ে বিভিন্ন ক্লোন একই সাথে প্রক্রিয়াকরণ করে ক্লোন হিসেবে লেবেলযুক্ত করে বিক্রি করা হচ্ছে এবং তা যথেষ্ট লাভজনক হচ্ছে। তবে পৃথকভাবে প্রক্রিয়াকরণ করে বাজারজাত করে অধিক লাভবান হওয়া সম্ভব। এক্ষেত্রে বৃহৎ চা বাগানগুলো উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ক্লোন চা আবাদ করা প্রয়োজন

বাংলাদেশ ক্লোন চা শ্রেণিবিন্যাস	
উৎপাদনের (Yield) উপর ভিত্তি করে –	
গড় উৎপাদন (Average)	২৫০০ – ৩০০০ কেজি/হেক্টর
চলতিমান উর্ধ্ব (Above average)	>৩০০০-৪০০০ কেজি/হেক্টর
উর্ধ্বমান (High)	>৪০০০কেজি/হেক্টর
গুণগতমানের (Quality) উপর ভিত্তি করে – (৫০ মন ধরে)	
নিম্নমান (Below average)	<৩০
মধ্যম গড় (Average)	৩০ থেকে <৩২
চলতিমান উর্ধ্ব (Above average)	৩২ থেকে <৩৪
উৎকৃষ্টমান (Excellent)	৩৪ এর উপরে।
এছাড়াও ক্লোনকে, আদর্শমান ক্লোন (Standard clone) – উৎপাদন ও গুণগতমান চলতিমান উর্ধ্ব	
উচ্চ ফলনশীল ক্লোন (Yield clone) – উৎপাদন উর্ধ্বমান সম্পন্ন এবং সাধারণমান বা চলতি মানউর্ধ্ব উৎপাদন ক্ষমতা।	
মানসম্পন্ন ক্লোন (Quality clone) – উৎকৃষ্ট পেয়ালি মানসম্পন্ন এবং সাধারণমান বা চলতি মানউর্ধ্ব উৎপাদন ক্ষমতা।	

বিটিআরআই উদ্ভাবিত ক্লোন শ্রেণিবিন্যাস	
আদর্শমান ক্লোন (Standard clone) –	বিটি১, বিটি২, বিটি৩, বিটি৫, বিটি৬, বিটি৮, বিটি৯, বিটি১১, বিটি১৩, বিটি১৪, বিটি১৬, বিটি১৭, বিটি১৮ ।
উচ্চ ফলনশীল ক্লোন (Yield clone) –	বিটি১০ এবং বিটি১২ ।
মানসম্পন্ন ক্লোন (Quality clone) –	বিটি৪, বিটি৬, বিটি১৫
সুগন্ধী ক্লোন (Flavoury clone) -	বিটি২

ক্লোন চা উন্নয়নে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক আগামী ১৫-২০ বছর মেয়াদি গবেষণা কার্যক্রমের প্রস্তাবিত সংশ্লিষ্ট রূপরেখা নিচের ছকে উপস্থাপিত হল এটি এক্ষেত্রে লক্ষ্য অর্জনের জন্য অত্র ইনস্টিটিউটের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। কিন্তু সার্বিক সমন্বিত দৃঢ় আগ্রহ ও বস্তুব প্রচেষ্টা থাকলে অর্জন সম্ভব।

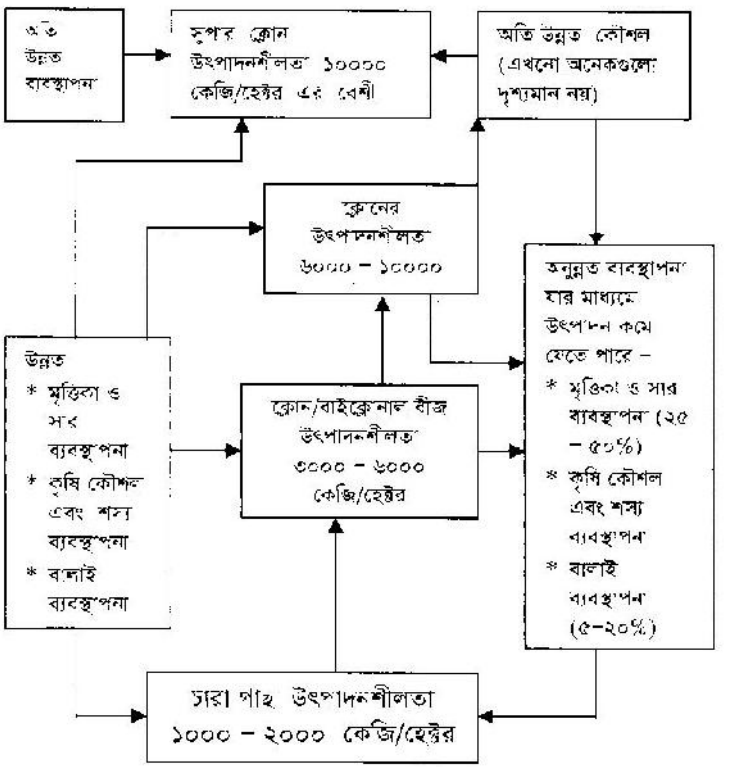

বিটিআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত ক্লোনসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১৯৬৬ সালে পাকিস্তান টি রিসার্চ স্টেশন (বর্তমান বিটিআরআই) কর্তৃক প্রথম যে ক্লোনটি উদ্ভাবিত হয় তার নাম ছিল পিটি-১। দেশ স্বাধীন হলে এর নামকরণ করা হয় বিটি-১। পরবর্তীতে আরও অনেকগুলো ক্লোন বিটিআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত হয়। নিম্নে অতিসংক্ষেপে এদের পরিচিতি দেয়া হল।

ক্লোন	অবমুক্তি সন/ তারিখ	মাতৃ চা গাছের উৎস	হেক্টর প্রতি গড় ফলন (কেজি)		গুণগতমান
			অপরিণত অবস্থা	পরিণত অবস্থা	
বিটি১	১৯৬৬	ভাড়াউড়া চা বাগান সেকশন নং - ৩৯ গাছ নং বি২০১/৩৯	১৬১৪	গড়: ৩২৯৮ সর্বোচ্চ: ৪৬৮৩	তৈরি চা এর গুণগতমান উত্তম
বিটি২	১৯৭৫	রাজঘাট চা বাগান সেকশন নং - ৮	১৮২০	গড়: ৩৬২৭ সর্বোচ্চ: ৪৮৭৪	গুণেমানে উৎকৃষ্ট, সুরভিত (flavoury) স্বীকৃতি-স্বরূপ ১৯৭৯ সালে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীগণ কাজী মাহবুবউল্লাহ ও জেবুন্নেছা ট্রাস্ট এওয়ার্ড ও স্বর্ণপদক পান
বিটি৩	১৯৭৫	রাজঘাট চা বাগান সেকশন নং- ২১	১৪৭৬	গড়: ৩৪৩১ সর্বোচ্চ: ৪৫০৪	গুণগতমান উত্তম
বিটি৪	১৯৮১	ভাড়াউড়া চা বাগান সেকশন নং - ৪৪	১৪১৮	গড়: ২৫৮১ সর্বোচ্চ: ৩৭৫৭	গুণগতমান অতিউত্তম
বিটি৫	১৯৮৭	বিটি-১ ও টিভি-১ শংকর	২০৮৩	গড়: ২৮১১ সর্বোচ্চ: ৪৩১৩	গুণগতমান উত্তম
বিটি৬	১৯৮৮	বিটি-১ ও টিভি-১ শংকর	২১৮৯	গড়: ২৯১৬ সর্বোচ্চ: ৪১০২	গুণগতমান অতিউত্তম
বিটি৭	১৯৯১	বর্মাছড়া চা বাগান (রাজঘাট ডিভিশন) সেকশন নং - ২	১৬৪৬	গড়: ২৭৯০ সর্বোচ্চ: ৪০০৪	গুণগতমান অতিউত্তম

বিটি৮	১৯৯২	ভাড়াউড়া চা বাগান সেকশন নং – ৪৪	২১৪০	গড়: ৩৩১৬ সর্বোচ্চ: ৫৪১০	গুণগতমান উত্তম
বিটি৯	১৯৯৪	দারাগাও চা বাগান বালুছড়া, সেকশন–২	২৭৭৩	গড়: ৩৭৮৪ সর্বোচ্চ: ৪৭৬৩	গুণগতমান উত্তম
বিটি১০	১৯৯৫	নলই চা বাগান সেকশন নং – ১৩	৩৭৩০	গড়: ৪৬০০ সর্বোচ্চ: ৫১৩৬	গুণগতমান অতিউত্তম, উচ্চ ফলনশীল
বিটি১১	১৯৯৯	বিটিআরআই, মণিপুরী জাতের ২০৭/৩৯ জেনারেটিভ ক্লোন ও টিভি-১ ক্লোন এর শংকর	২৫১৫	গড়: ৩৭১৩ সর্বোচ্চ: ৫১৭৯	গুণগতমান উত্তম
বিটি১৩	২০০০	শমশেরনগর চা বাগান, দেওছড়া বহিঃবাগান, সেকশন নং – ১১	১৫০২	গড়: ৩০৮০ সর্বোচ্চ:	গুণগতমান উত্তম
বিটি১৪	২০০২	টিভি-৯ ও বিটি–১ শংকর	১৬৮০	গড়: ৩৪৫০ সর্বোচ্চ:	গুণগতমান উত্তম
বিটি১৫	২০০২	বি টি এস – ১	১৯৩৮	গড়: ৩৭৩৫ সর্বোচ্চ:	গুণগতমান উত্তম
বিটি১৬	২০০৩	শমশেরনগর চা বাগান দেওছড়া বহিঃবাগান, সেকশন নং – ১১	১২৮৮	গড়: ২৬০৪ সর্বোচ্চ:	গুণগতমান উত্তম
বিটি১৭	২০০৩	টিভি-১ ও বিটি–২ শংকর	১৮৩৭	গড়: ৩৮৯৭ সর্বোচ্চ:	গুণগতমান উত্তম
বিটি১৮	২০১০ আনুষ্ঠানিক বিতরণ ২০১৩	অম্মু চা বাগান	১৫৫৭	গড়: ৩৭৭৭ সর্বোচ্চ: ৪৩১৮	গুণগতমান উত্তম

বাংলাদেশ চা-এর বৈশিষ্ট্য

১. উত্তমরূপে প্রস্তুত করা বাংলাদেশ চা-তে আছে যথেষ্ট কড়া, উজ্জ্বল এবং রঙিন লিকার।

২. যদিও বাংলাদেশ চা এর নিজস্ব পৃথক বৈশিষ্ট্যযুক্ত সুগন্ধ নেই কিন্তু আসাম চায়ের মতই এর উজ্জ্বল ও রঙিন লিকার রয়েছে।

৩. রফতানি বাজারে বাংলাদেশের চা ঘাটতি মেটাতে পরিপূরক চা (filler tea) হিসাবেও চাহিদা রয়েছে।

৪. পরিপূরক চা কিন্তু অন্য যেকোন ব্লেন্ডের চায়ের সাথে এমনভাবে মিলে যায়, যাতে সে চায়ের পিয়ালি (কাপের) মান সহসা হেরফের হয় না।

৫. বাংলাদেশে বর্তমানে কোন অর্থোডক্স চা তৈরি হয় না কেবল সিটিসি কালো চা তৈরি করা হয় যাতে সুগন্ধকে প্রাধান্য দেয়া হয় না।

সপ্তম অধ্যায়

উদ্ভিদ জীবপ্রযুক্তি
(Plant biotechnology and tea)

প্রাকৃতিক (natural) অথবা পরিবর্তিত (modified) যেকোন রূপের কোন জীবে যেকোন ধরনের কারিগরি হস্তক্ষেপকে উদ্ভিদ জীবপ্রযুক্তি (Biotechnology) বলে। অর্থাৎ Biotechnology হচ্ছে বায়োলজি এবং টেকনোলজি-এর interaction দ্বারা সৃষ্ট বিভিন্ন প্রকার কৌশল যা living organism বা তার component এর genetic পরিবর্তনের মাধ্যমে জিনগত উন্নয়ন ঘটায় এবং যা মানবকল্যাণে ব্যবহার করা হয়।

জীবপ্রযুক্তির কতিপয় চলমান সংজ্ঞা নিম্নে উল্লেখ করা হলো –

ক) জীবপ্রযুক্তি হলো মানব কল্যাণে বায়োলজিক্যাল এজেন্টসমূহ যথা: অণুজীবসমূহ বা কোষীয় উপাদানসমূহের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার।–U.S. National Science

খ) জীবপ্রযুক্তি হলো প্রাণ রসায়ন, অণুজীববিদ্যা এবং প্রকৌশল বিজ্ঞানের সমন্বিত ব্যবহারের মাধ্যমে অণুজীব, আবাদকৃত টিস্যু/কোষ এবং এদের অংশ বিশেষের সামর্থের প্রযুক্তিগত প্রয়োগ অর্জন করা। –European Federation of Biotechnology

গ) জীবপ্রযুক্তি হলো শিল্পে ব্যবহৃত বিভিন্ন পদ্ধতি এবং এর মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রোডাক্ট এবং পরিবেশের উপর প্রাণরসায়ন, জীববিদ্যা, অণুজীববিদ্যা এবং রাসায়নিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর প্রয়োগ – International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC)

ঘ) জীবপ্রযুক্তি হলো বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলগত নিয়মনীতি প্রয়োগ করে

বায়োলজিক্যাল এজেন্ট দ্বারা বস্তু প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন করে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এবং সেবা প্রদান করা।" The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)

জীবপ্রযুক্তির এসব নানামুখী সংজ্ঞার ভাবসমূহকে একত্রিত করে ১৯৯৬ সালে Smith একটি সমন্বিত সংজ্ঞা প্রদান করেছেন যা হলো –

কোষের বাহিরে ভাইরাস, ব্যাক্টেরিয়ার প্লাজমিড বা অন্যান্য ভেক্টর সিস্টেমে যে কোন উপায়ে উৎপাদিত নিউক্লিক এসিড অণু সংযোজনের মাধ্যমে কৌলি বস্তুর নতুন সংযোগ সৃষ্টি করে তা পোষক জীবে স্থানান্তর করা যেখানে প্রাকৃতিকভাবে তা অনুপস্থিত ছিল অথচ যেখানে এর ধারাবাহিক বংশ রক্ষা করতে সক্ষম।

প্রকৃতিতে স্বতঃস্ফূর্ত জীবপ্রযুক্তির উদাহরণ হচ্ছে গাঁজন প্রক্রিয়ায় অণুজীবের ব্যবহার। যেমন, দুধ থেকে চিজ বা yoghurt প্রস্তুত হওয়া, molasses থেকে ভিনেগার তৈরি ইত্যাদি স্বতঃস্ফূর্ত জীবপ্রযুক্তির উদাহরণ। আবার antibiotic উৎপাদন, যেমন *Penicillium notatum* থেকে *penicillin* প্রস্তুতি Biotechnology-র প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ অধ্যায় বুঝার সুবিধার্থে ইংরেজি টার্মগুলো হুবহু রাখা হয়েছে। কেননা বাংলা প্রতিশব্দগুলো সকলের কাছে বোধগম্য নাও হতে পারে।

বর্তমানে কৃষিতে ক্রমবর্ধমান চাহিদাপূরণ চিরাচরিত ব্রিডিং পদ্ধতি দ্বারা সম্ভব নয়। জীবপ্রযুক্তির বিভিন্ন কৌশল চিরাচরিত এ ব্রিডিং প্রক্রিয়ার চেয়ে অনেক বেশি কার্যকর ও শক্তিশালী। কেননা প্রচলিত সংকরায়ন (conventional breeding) পদ্ধতিতে একটি উদ্ভিদ উন্নয়নে যতটা সময়ের প্রয়োজন হয় biotechnology প্রয়োগ করে সে সময়সীমা অনেক বেশি কমিয়ে আনা সম্ভব। প্রচলিত সংকরায়ন প্রথায় একটি পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদ নিয়ে কাজ করতে হয়, যেখানে biotechnology-র কৌশল দিয়ে উদ্ভিদের cellular বা molecular পর্যায়ে কাজ করা যায়। অর্থাৎ [illegible]-র মাধ্যমে উদ্ভিদের genetic level এ পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব [illegible] উন্নয়ন [illegible] টার্গেটকে specific করেছে। উদ্ভিদ [illegible] engineering এর মাধ্যমে Transgenic [illegible] গ্রহণ করে। কাঙ্ক্ষিত চরিত্রযুক্ত উদ্ভিদ তৈরি [illegible] পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। টিস্যুকালচার পদ্ধতি হচ্ছে [illegible] উদ্ভিদের কোষ বা কলা কালচার করা।

[illegible] genetic engineering [illegible] হচ্ছে কৌলিক [illegible] স্থানান্তর [illegible] পদ্ধতি। উদ্ভিদ, প্রাণী বা অণুজীব [illegible] ফসলি [illegible] স্থায়ীভাবে [illegible] যেখানে [illegible]

জিনের সঠিক প্রকাশ লাভ করানোর পদ্ধতিই হচ্ছে Plant genetic engineering.

Plant tissue culture : Plant tissue culture হচ্ছে এক বিশেষ ধরনের কৌশল, যেখানে উদ্ভিদের সজীব কোষ- কোন ক্ষুদ্র অংশ, যেমন- মূল, কাণ্ড, পাতা অথবা উদ্ভিদের অন্য কোন অংশের কলা বা টিস্যুকে কৃত্রিমভাবে নির্ধারিত পুষ্টি নালন্তর medium- এ জীবাণুমুক্ত ও নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে কালচার করে তাদের বৃদ্ধি, বিকাশ ঘটিয়ে অণুচারা উৎপাদন করা যায়। Tissue culture কে *in vitro* পদ্ধতিও বলা হয়।

টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে উদ্ভিদের যে কোন অঙ্গ যেমন কোষ, মেরিস্টেম, পরাগরেণু, ডিম্বাণু, ভ্রূণ, এমনকি প্রটোপ্লাস্ট কালচার করা সম্ভব যার থেকে ধারাবাহিকভাবে পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদের বিকাশ ঘটাতে পারে। [উদ্ভিদের যে কোন বিভাজনশীল সজীব কোষ থেকে পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদ সৃষ্টির সক্ষমতাকে cellular totipotency বলে (G. Haberland,1902)].

Tissue culture পদ্ধতির উল্লেখযোগ্য সুবিধাজনক দিকগুলো হলো:

* এ পদ্ধতিতে প্লান্টের সজীব অংশকে উপযুক্ত nutrient medium- এ কালচার করা হয় এবং তা থেকে অল্প সময়ে, অল্প পরিসরে এবং অল্প পরিশ্রমে অধিক পরিমাণ অণুচারা উৎপাদন করা যায়।

* এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্ট উদ্ভিদগুলো বংশগতীয় ভাবে অভিন্ন (genetically uniform) থাকে অর্থাৎ কোন উন্নত চরিত্রযুক্ত উদ্ভিদ উৎস থেকে টিস্যু কালচার প্রক্রিয়ায় প্রচুর পরিমাণে একই বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন উদ্ভিদ পাওয়া যায়

* এ প্রক্রিয়ায় সব ঋতুতে অর্থাৎ সারা বছরব্যাপী চারা উৎপাদন করা যায়।

* Callus culture থেকে উন্নত চরিত্রযুক্ত clone তথা উন্নত variety পাওয়া সম্ভব।

* Meristem culture থেকে রোগমুক্ত চারা তৈরি করা যায়

* Tissue culture প্রক্রিয়ায় কোষীয় এবং জিন স্তরে পরিবর্তনের মাধ্যমে বিভিন্ন transgenic উদ্ভিদের উদ্ভাবন করা সম্ভব।

* Protoplast fusion প্রক্রিয়ার দ্বারা উদ্ভিদ প্রজনন পদ্ধতির বিভিন্ন সমস্যা যেমন, অন্তঃ বা আন্তঃগণীয় ও প্রজাতিগত বাধাসমূহ অতিক্রম করে সফল সংকরায়ণ ঘটানো যায়।

Plant tissue culture পদ্ধতির প্রয়োগ

১. **Micropropagation:** উন্নত চরিত্রযুক্ত উদ্ভিদ হতে যে কোন ক্ষুদ্র অংশ

(explant) কৃত্রিম nutrient medium এ culture করে অসংখ্য অনুরূপ অণুচারা উৎপাদনের কৌশলকে micropropagation বলে। বাছাই করা উন্নত চরিত্রবিশিষ্ট genotype এর দ্রুত clonal সংখ্যাবৃদ্ধি micropropagation এর মূল উদ্দেশ্য।

২. **Callus culture:** যে সমস্ত উদ্ভিদ অংশ যেমন- ডিম্বাশয়, ডিম্বক, পরাগধানী, পরাগরেণু, মূল, পাতা, পর্বমধ্য ইত্যাদি হতে স্বাভাবিকভাবে অঙ্গ উৎপাদন করা সম্ভব নয় সেসকল উদ্ভিদ অংশ থেকে সহজেই callus তৈরি ও তা থেকে উদ্ভিদের বিকাশ ঘটানো সম্ভব। Callus culture থেকে একই সময়ে প্রচুর পরিমাণে অণুচারা পাওয়া যায়। এ ছাড়া callus culture এ variation সৃষ্টি হয় যা থেকে উন্নত চরিত্রযুক্ত varient selection করা যায়।

৩. **Somatic embryogenesis:** এ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের স্বাভাবিক সক্ষম দেহকোষ বা কলা থেকে স্বাভাবিক ভ্রূণের ন্যায় অসংখ্য ক্ষুদ্র, সুগঠিত ও দ্বিমেরু বিশিষ্ট (bipolar) ভ্রূণের বিকাশ ঘটানো যায়। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ somatic embryogenesis পদ্ধতিতে বহু সংখ্যক এমব্রিয়ডের উৎপত্তি ও বিকাশ করানো যায়, যার ফলে একই সময়ে প্রচুর সংখ্যক অণুচারা পাওয়া যায়।

- Somatic embryogenesis এর ফলে variation তৈরি হয়, যা থেকে কাঙ্ক্ষিত চরিত্রযুক্ত উদ্ভিদ নির্বাচন করা সম্ভব।
- Bipolar embryo তৈরি হওয়ায় আলাদাভাবে কাণ্ড ও মূল উৎপাদন করার প্রয়োজন পড়ে না কোন হতে somatic embryogenesis-এর মাধ্যমে সৃষ্ট অণুচারায় বীজচারার মত taproot উৎপন্ন হয়।

৪. **Somaclonal variation:** দেহকোষের (somatic cell) tissue culture- এর মাধ্যমে Somaclonal variation তৈরি করা যায় যা exploit করে কাঙ্ক্ষিত varient নির্বাচন করা যায়। যে সমস্ত উদ্ভিদের অযৌন উপায়ে বংশবিস্তার হয়ে থাকে তাদের খুব অল্পসংখ্যক ভ্যারাইটি প্রকৃতিতে বর্তমান, তাদের ক্ষেত্রে somaclonal variation ঘটিয়ে সিলেকশন করা সম্ভব।

৫. **Embryo culture:** Embryoculture এর মাধ্যমে সংকরায়নের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করা যায়। যেসকল ক্ষেত্রে সংকরায়নের পর বীজ তৈরি হয় না বা বীজ তৈরির পূর্বে ঝরে যায়, সে সকল ক্ষেত্রে immature অবস্থায় ভ্রূণ কালচার করে পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদ উৎপাদন করা যায়।

৬. **Anther culture:** Tissue culture পদ্ধতিতে anther culture করে সহজে homozygous diploid লাইন পাওয়া যায়, যা conventional breeding

পদ্ধতিতে অনেক সময় সাপেক্ষ। পরাগধানী কালচার করে haploid লাইন এবং বিভিন্ন মাত্রার প্লয়ডি সৃষ্টি করা সম্ভব।

৭. **Cell culture:** উদ্ভিদের কোন টিস্যু, organ বা কালচারকৃত ক্যালাস থেকে আলাদাকৃত কোন একক কোষ উপযুক্ত nutrient medium এ জীবাণুমুক্ত পরিবেশে কালচার করা হয় এবং তার বৃদ্ধি ঘটানো হয় তাকে cell culture বলে। কোষের নানা রকম পরিবর্তন, জৈব রাসায়নিক ধর্ম, biochemical pathway সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার জন্য cell culture করা হয়। Tea plant ? cell culture করে বিভিন্ন secondary metabolites, nutraceuticals উৎপাদন করা হয় ক্যাটেচিন, carotinoids ও অন্যান্য মেটাবোলাইটস cell culture দ্বারা synthesis করা হয় (Sadripta et al, 1980).

৮. **Protoplast culture:** Protoplast culture করে দুই বা ততোধিক Protoplast এর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা যায় সংযুক্ত Protoplast এর নিউক্লিয়াসগুলো সংযুক্ত হয়ে সংকর কোষ উৎপন্ন করে। উক্ত সংকর কোষ থেকে পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদ তৈরি করা যায় ভিন্ন genom যুক্ত (genetically incompatible) উদ্ভিদ প্রজাতিসমূহের মধ্যে (যেখানে স্বাভাবিক সংকরায়ন সম্ভব নয়) protoplast fusion এর মাধ্যমে স্বাভাবিক সংকর উদ্ভিদ তৈরি করা সম্ভব। Genetic engineering পদ্ধতিতে protoplast fusion প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যের জিন যেমন রোগ প্রতিরোধক, উচ্চ ফলনশীল, খরা প্রতিরোধক, নাইট্রোজেন ফিক্সিং (nitrogen fixing) gene ইত্যাদি স্থানান্তর করে উদ্ভিদের বংশগতিতে উন্নয়ন সাধন করা হয় এছাড়া অঙ্গজ বংশবিস্তারকারী উদ্ভিদের মধ্যে protoplast fusion করে জীনগত ভিন্নতা আনা যায়

৯. **Germplasm সংরক্ষণ:** Tissue culture পদ্ধতিতে উদ্ভিদের germplasm সংরক্ষণ করে পরবর্তীতে তা ফসল উন্নয়নে ব্যবহার করা হয়। *In vitro* পদ্ধতিতে বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদসমূহকে সহজেই সংরক্ষণ করা যায়। জার্মপ্লাজম ব্যাংক তৈরি এবং আন্তর্জাতিক স্তরে জার্মপ্লাজমের অবাধ বিনিময় সহজ হয়। Cryopreservation এবং slow growth preservation জার্মপ্লাজম সংরক্ষণের দুটি উপায়। Cryopreservation হচ্ছে অতি নিম্ন তাপমাত্রায় (-190°C) germplasm সংরক্ষণ করা এবং 4° থেকে -15°C তাপমাত্রায় উদ্ভিদ অংশ সংরক্ষণ করার পদ্ধতি হল slow growth preservation.

১০. **Genetic Engineering:** একটি জীব হতে কোন নির্দিষ্ট জিন বহনকারী ডিএনএ খণ্ড পৃথক করে ভিন্ন একটি জীবে স্থানান্তরের কৌশলকে genetic

engineering বলে এ কৌশলকে recombinant DNA technology বা molecular breeding ও বলা হয়ে থাকে।

১১. **Transgenic plant উৎপাদন :** যে উদ্ভিদে ভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত এক বা একাধিক কার্যক্ষম জিন স্থানান্তর করা হয়েছে তাকে transgenic উদ্ভিদ বলে। ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদে ভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত জিন incorporate করে উন্নত বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় ঘটানো হয়। উদ্ভিদদেহে দু'ভাবে জিন স্থানান্তর করা যায়-Indirect gene transfer বা কোন মাধ্যম/বাহক ব্যবহার করে জিন স্থানান্তর করা এবং Direct gene transfer বা সরাসরি জিন স্থানান্তর। Indirect পদ্ধতিতে *Agrobacterium* নামক ব্যাকটেরিয়ার Ti-plasmid কে জিনের বাহক হিসেবে ব্যবহার করে plant এ জিন স্থানান্তর করা হয়।

Direct পদ্ধতিগুলো হচ্ছে- electroporation, PEG (Polyethelene Glycol), microprojectile bombardment বা gold particle bombardment, microinjection, Sonication ইত্যাদি। Direct পদ্ধতিতে plant tissue তে সরাসরি gene transfer করা যায়। এভাবে insect resistant, herbicide resistant, virus resistant, salt tolerant, drought tolerant উদ্ভিদ উৎপাদন করা যায়।

১২. **Molecular marker:** সফল জিন স্থানান্তরের ক্ষেত্রে কোষে foreign gene সন্নিবেশিত হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য একসেট জিনের সহায়তা নেয়া হয় যাদেরকে বলা হয় marker জিন বা molecular marker। সাধারণত marker gene গুলোকে কাঙ্ক্ষিত জিনের সাথে plasmid বা বাহক DNA–এর সঙ্গে যুক্ত করে দেয়া হয়। Marker ব্যবহারের অন্যতম সুবিধা হল সহজে এবং কম পরিশ্রমে gene transformation নিরূপণ করা যায়।

এছাড়া molecular marker পদ্ধতির মাধ্যমে বিভিন্ন উদ্ভিদ জাত ও বুনো প্রজাতির মধ্যে সম্পর্ক ও variation study করা যায়। Molecular marker technology বিভিন্ন জাত ও wild variety থেকে উপযোগী জিন স্থানান্তর প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করে। Traditional breeding পদ্ধতিতে polygenic চরিত্রগুলো বিশ্লেষণ করা কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ, কিন্তু molecular marker ব্যবহার করে এ সকল চরিত্র খুব সহজেই tagged করা যায়। উদ্ভিদের বিভিন্ন variety-এর মধ্যে জেনেটিক সম্পর্ক নির্ণয়ে molecular marker ভূমিকা রাখে। Molecular marker এর কৌশলগুলোর মধ্যে RAPD, RFLP, ISSR ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

Molecular marker এর মাধ্যমে genotype ও variety গুলোর মধ্যে DNA

level এ genetic relationship study, molecular characterization, genetic diversity analysis, genetic identification ইত্যাদি করা হয়।

টিস্যু কালচার পদ্ধতি

Explant collection
(যে উদ্ভিদের tissue culture করা হবে তা সিলেক্ট করে explant collection করা হয়)

Explant প্রস্তুতকরণ
(প্লান্টের ক্ষুদ্র অংশ যেমন, পাতা, পর্ব, কাণ্ড, মধ্যপর্ব, মুকুল, ইত্যাদি explant হিসেবে ব্যবহার করা হয়)

জীবাণুমুক্তকরণ (Surface sterilization)
(বিভিন্ন sterilizing agent দিয়ে explant গুলো জীবাণুমুক্ত করা হয়)

Inoculation
(উপযুক্ত nutrient media-তে জীবাণুমুক্ত পরিবেশে expant গুলো inoculate করা হয়)

Plant regeneration
(shoot initiation, multiplication, root induction ইত্যাদি ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় অণুচারা regenerate করা হয়)

Hardening / Acclematization
(plant গুলো field এ transfer এর পূর্বে growth room এ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে খাপ খাওয়ানো হয়)

Field transfer
(hardening এর পর plant গুলো field এ transfer করা হয়)

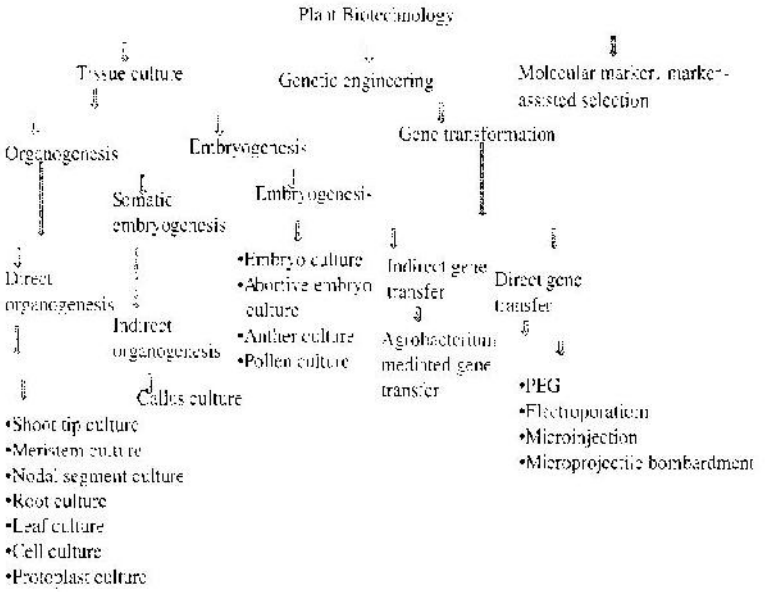

চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধিতে কৌশল হিসেবে জীবপ্রযুক্তির ব্যবহার (Biotechnology used as a tool for Tea crop improvement)

যদিও tea crop improvement প্রক্রিয়ায় convertional breeding পদ্ধতি একটি কার্যকর এবং সুপ্রতিষ্ঠিত মাধ্যম, কিন্তু tea plant এর কিছু প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যগত সীমাবদ্ধতার কারণে চিরাচরিত breeding পদ্ধতিগুলো ধীরগতি সম্পন্ন এবং কখনো কখনো তা অসম্ভব যেমন, tea plant এর perennial nature, self incompatibility, স্বল্প মেয়াদি flowering কাল, flowering এবং fruit bearing এ clonal ভিন্নতা, বীজ পরিপক্কতার দীর্ঘ সময়কাল এবং অল্প বীজ ধারণ, উচ্চমাত্রায় inbreeding depression ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলো traditional breeding পদ্ধতির মূল প্রতিবন্ধকতা। এসকল বাধাসমূহ *in vitro* culture প্রক্রিয়ায় অনেকটা কমিয়ে আনা যায়।

বর্তমান বিশ্বে চায়ের ক্রমবর্ধমান চাহিদা বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা বেড়ে যাওয়ার কারণে চা উৎপাদনকারী দেশগুলো চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি গুণগতমান উন্নয়নের জন্য নতুন নতুন গবেষণা করে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে উচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন এবং উন্নত গুণগত মানের বৈশিষ্ট্যযুক্ত চায়ের জাত চাষাবাদ করে চাহিদা পূরণের চেষ্টা করা হচ্ছে। উন্নত বৈশিষ্ট্যযুক্ত জাত বা

ক্লোন আবাদের মাধ্যমে চায়ের উৎপাদন এবং গুণগত মান বৃদ্ধি করা সম্ভব। কিন্তু conventional প্রক্রিয়ায় একটি improved variety বা ক্লোন হতে vegetative propagation-এর মাধ্যমে একই সময়ে প্রচুর পরিমাণে কাটিং উৎপাদন করা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে conventional propagation পদ্ধতির পাশাপাশি *in vitro* tissue culture প্রক্রিয়ায় চারা উৎপাদন করে চাহিদা পূরণ করা সম্ভব।

Micropropagation: Suitable planting material এর স্বল্পতা এবং কাটিং সংগ্রহ মৌসুম নির্ভর হওয়ায় অঙ্গজ বংশ বিস্তারের (single internode cutting) মাধ্যমে চাহিদা অনুযায়ী/ প্রচুর পরিমাণে চারা উৎপাদন করা সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রে *in vitro* micropropagation পদ্ধতিতে অল্প সময়ে, অল্প পরিসরে সব মৌসুমে এ অণুচারা উৎপাদন করা সম্ভব যা প্রয়োজনীয় সংখ্যক চারার চাহিদা বা ঘাটতি পূরণে সহায়তা করতে পারে। বিশ্বের বিভিন্ন ল্যাবরেটরিতে বিজ্ঞানীগণ চা গাছের *in vitro* regeneration protocol দ্বারা চা গাছের mass propagation নিয়ে কাজ করেছেন (Kato 1986, Mondal 2002)।

Callus culture: চা চাষ প্রক্রিয়ায় conventional vegetative propagation system আদর্শ হলেও multiplication rate খুবই কম এছাড়া কিছু কিছু ক্লোনের ক্ষেত্রে survivality percentage. প্রয়োজনীয় চাহিদার তুলনায় অনেক কম, মাতৃবৃক্ষ স্বল্পসংখ্যক হওয়ার কারণে একটি ক্লোন বিমুক্ত হওয়ার পরপরই একই সময়ে প্রচুর পরিমাণে কাটিং তথা চারা উৎপাদন করা সম্ভব হয় না। *in vitro* callus culture করে একই সময়ে অসংখ্য অণুচারা তৈরি করা যায় এবং এ পদ্ধতিতে উৎপাদনকৃত চারা প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণে ব্যবহার করা যায়। Chen et al (1981) চা গাছের বীজপত্র এক্সপ্ল্যান্ট হতে ক্যালাস কালচার করে প্রচুর পরিমাণে অণুচারা উৎপাদন করেন। Patil et al (2013) *in vitro* grown leaf explant থেকে callus culture করেন। High value product উৎপাদন- এ callus culture গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে

Somatic embryogenesis: Somatic embryogenesis প্রক্রিয়ার দ্বারা কাঙ্ক্ষিত চরিত্রযুক্ত কোন tea clone এর mass propagation করা যায়। এ পদ্ধতিতে একইসাথে অল্প সময়ে অসংখ্য মাতৃগাছের অনুরূপ চারা উৎপাদন করা যায়। Kato (1986) চায়ের (*Camellia sinensis* L. এবং *Camellia japonica* L.) এর cotyledon slice হতে somatic embryo উৎপাদন করেন যা থেকে অসংখ্য অণুচারা তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। উন্নত চরিত্রযুক্ত tea clone হতে somatic embryogenesis প্রক্রিয়ায় প্রচুর পরিমাণে মাতৃগাছের অনুরূপ চারা উৎপাদন করা যায়। এছাড়া somatic embryo হতে উৎপন্ন অনুচারায় বীজ চারার ন্যায় tap root তৈরি হয় সেকারণে embryogenesis প্রক্রিয়ার দ্বারা সৃষ্ট চারার প্রাকৃতিক

পরিবেশে সহজে খাপ খাইয়ে নেয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং এদের সহনশীলতা বেশি হয়।

Embryo culture: চা গাছের incompatible variety গুলোর মধ্যে স্বাভাবিক সংকরায়ন সম্ভব হয় না। এরূপ incompatible cross হতে প্রাপ্ত immature embryo culture করে কাঙ্ক্ষিত সংকর plant regenerate করা সম্ভব। Immature embryo culture অর্থাৎ embryo rescue technique প্রয়োগ করে সংকর চা গাছের regenerate করা হয়েছে (Palni et al 1991, 1993)।

Anther culture: চা highly cross pollinated উদ্ভিদ, কিন্তু উদ্ভিদটিতে self incompatibility এবং উচ্চমাত্রায় inbreeding depression থাকার কারণে homozygous ডিপ্লয়েড line তৈরি করা প্রায় অসম্ভব (Shing 1982)। Tissue culture প্রক্রিয়ায় এন্থার কালচার করে haploid এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে homozygous diploid line উৎপাদন করা সম্ভব। Laskar et al (1993) টোকলাই variety TV1 এবং TV13 হতে anther culture করে haploid line তৈরি করেন।

Cell culture: চা উদ্ভিদ একটি secondary metabolites সমৃদ্ধ উদ্ভিদ (Suzuki & Waller 1988) এবং চায়ের গুণগত বৈশিষ্ট্য যেমন স্বাদ, সুগন্ধ সতেজতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন প্রকার উদ্বায়ী অথবা অণুদ্বায়ী রাসায়নিক উপাদান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এসব উপাদান চায়ের কচি পাতায় উৎপন্ন হয় যা সাধারণত secondary metabolites নামে পরিচিত এবং চায়ের aroma, flavour, taste, liquor colour ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলোর জন্য দায়ী।

চায়ে বিদ্যমান এসকল উপাদান চায়ের গুণগত মান উন্নয়নের জন্য অতি প্রয়োজনীয়। চা উদ্ভিদে কোষ কালচার প্রক্রিয়ায় caffeine, theobromine, theanine, catechin, polyphenol ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার secondary metabolites সনাক্ত এবং উৎপাদন করা হয়েছে। এসকল metabolites এর সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার ধাপগুলো সম্পর্কে সেল কালচার করে সম্যক ধারণা পাওয়া যায় যা চায়ের জাত উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখে। Sudripta et al (2005) tea cell culture এর মাধ্যমে catechin এবং carotenoid উৎপাদন এবং carotenoid এর bio-synthetic pathway বর্ণনা করেন। cell culture এর মাধ্যমে catechin ও carotenoid এর উৎপাদন বৃদ্ধি করতে bio-synthetic pathway গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

Protoplast culture: চায়ের স্বাভাবিক সংকরায়নের শতকরা হার অনেক কম এবং খুব অল্প পরিমাণে বীজ তৈরি হয়। এক্ষেত্রে উন্নত চরিত্রযুক্ত কাঙ্ক্ষিত দুটি প্রজাতির protoplast isolation ও fusion ঘটিয়ে সফল সংকর উদ্ভিদ উৎপাদন

করা যায়। দূর সম্পর্কীয় গণ ও প্রজাতির মধ্যেও সংকরায়ন করা protoplast culture এর মাধ্যমে সম্ভব। চায়ের genetic manipulation এ protoplast culture খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। Nakamura (1983) প্রথম চায়ের পাতা এবং ফুলের petal হতে সম্পূর্ণভাবে protoplast isolation এবং culture করেন।

Germplasm conservation: সাধারণত intact tea seed liquid N_2 এ বা অতি নিম্ন তাপমাত্রায় (-80^{0}C) সংরক্ষণ করা যায় না, তবে embryonic axes নিম্ন তাপমাত্রা সহনশীল এবং তরল N_2 এ সংরক্ষণ করা যায়। Kuranuki & Yoshida (1991) চায়ের germplasm conservation এর জন্য embryonic axes এর cryopreservation প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংরক্ষণ করার কৌশল উদ্ভাবন করেন। এছাড়া Cryopreservation পদ্ধতিতে -190^{0}C তাপমাত্রায় তরল নাইট্রোজেনে চা গাছের meristem, zygotic ও somatic embryo, pollen, protoplast, cell সংরক্ষণ করা যায়। (Kartha 1985, Withers 1985, Bajaj 1987, Palni 1993)

Transgenic tea: Traditional breeding পদ্ধতি দ্বারা চায়ের গুণগত ও উৎপাদনগত মান উন্নয়নের জন্য সাধারণত সিলেকশন ও hybridization technique প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু biotic ও abiotic stress resistant variety উৎপাদন এবং বিভিন্ন specific bioactive constituents যেমন pharmacological, cosmetical বা nutraceutical product সমৃদ্ধ variety উৎপাদন করার জন্য উন্নত breeding technology হিসাবে genetic transformation পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে (Jain 2006)। বিভিন্ন multigenic বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী gene, transgenic technology-র মাধ্যমে চা গাছে incorporate করে কাঙ্ক্ষিত chemical constituents সমৃদ্ধ qualitative clone উদ্ভাবন করা যেতে পারে। (Mondal et al 2001) tea plant (*Camellia sinensis* L) এর somatic embryoতে agrobacterium mediated genetic transformation কৌশল প্রয়োগ করে transgenic tea তৈরির protocol develop করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি Gus-histochemical assayতে 40% positive transient expression পেয়েছেন। এই kanamycin resistant, Gus positive embryoগুলো germinate করে *in vitro* multiplication করা হয়। অতঃপর nptII এবং Gus specific primer এর সাহায্যে PCR analysis করে transgenic nuclear genomeকে নিশ্চিত করা হয়। এসকল transgenic microshoot গুলো Kangra Jat এর seed grown root stock এ micrograft করার পর hardening করে confined field এ লাগানো হয়েছে।

Molecular marker technique: চা গাছের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যায়ন (characterization) সাধারণত morphological traits বিশেষ করে leaf চরিত্র

morphology-র উপর নির্ভর করে করা হয়ে থাকে। তাছড়া conventionally cytological, biochemical analysis এবং protien based marker ব্যবহার করে genetic diversity নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু এ সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলো পরিবেশ দ্বারা পুরোপুরি প্রভাবিত হওয়ায় সঠিক characterization করা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে molecular marker technique tea plant-এর জন্য একটি অত্যন্ত কার্যকর উপায়। Mondal (2000) RAPD marker এর সাহায্যে ২৫টি Indian tea cultivar এবং ২টি ornamental species এর characterization করেন। RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) পদ্ধতি প্রয়োগ করে Kaundun et al (2000) ২৭টি কোরিয়ান, জাপানি এবং তাইওয়ান tea accession এর মধ্যে genetic variation ও relationship পর্যবেক্ষণ করেন। এছাড়া ১৭টি TV clone এর finished product (made tea) এর characterization এবং identification করা হয়েছে (Hemanta et al 2005)। Superior cultivar অর্থাৎ ক্লোনগুলোর proper documentation এবং আন্তর্জাতিক বাজারে এদের identification এর জন্য molecular characterization করা জরুরি।

অষ্টম অধ্যায়

চা এবং মানবস্বাস্থ্য

(Tea and human health)

চীন সম্রাট শেন নাং খ্রিস্টপূর্ব ২৭৩৭ সনে ঘটনাচক্রে প্রথম চায়ের নির্যাস পান করে বিমোহিত হওয়ার পর থেকে বিগত প্রায় ৫০০০ বছর যাবৎ পৃথিবীর মানুষকে 'চা' নামক পানীয় এক কথায় মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছে। এটি এমন একটি পানীয় যা সামাজিক সৌজন্যের প্রতীক এবং শান্তি ও সৌহার্দ্যের বাতাবরণ সৃষ্টি করে মানবসমাজে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করে চলেছে তাইতো বিশ্বজুড়ে প্রতিদিন এক হিসেবে প্রায় সাড়ে তিন মিলিয়ন কাপ চা পান করা হয় বলে জানা যায়। 'চা' দিনের যে কোন সময় পরিবেশনযোগ্য পানীয়। অন্য কোন পানীয় এত সহজে মানুষকে আপন করে নিতে পারে না। এটি বন্ধুত্ব এবং সহমর্মিতারও প্রতীক।

এ বিশ্বজনীন পানীয়টি শুধুমাত্র শারীরিক উপকার সাধন করে তাই নয়, বরং তা মানবিক মূল্যবোধকে জাগ্রত করে, আধ্যাত্মিক, সমাজ-মানস গঠনেও সাহায্য করে। সাম্প্রতিককালে গবেষক, বিজ্ঞানীগণ এবং FAO কর্তৃক পরিচালিত গবেষণায় এটি বেরিয়ে এসেছে যে, চা আসলেই একটি স্বাস্থ্যকর পানীয়, যা প্রাচীনকালেও মানুষ মনে করত। এ অধ্যায়ে চা এর ভেষজ গুণাবলী সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

আধুনিক জীবনে স্বাস্থ্যগত সমস্যা

চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রভূত অগ্রগতি সত্ত্বেও আধুনিককালে মানুষ দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে এসকল রোগের মধ্যে রয়েছে বহুমূত্র, হৃদরোগ এবং ক্যানসার। বর্তমানে মানুষের জীবনযাপন প্রণালি এবং খাদ্যাভ্যাসই মূলত এজন্য দায়ী। এসকল স্বাস্থ্যগত সমস্যা মোকাবেলায় উন্নত বিশ্বের দেশগুলোও হিমশিম খাচ্ছে কমবয়সীরা বর্তমানে ফাস্টফুড, কার্বনেটযুক্ত পানীয়, অত্যধিক

খাবারে অভ্যস্ত এবং সে সাথে ধূমপান এবং মদ্যপানে আসক্ত। তাছাড়া প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে কাজের পরিবেশ এবং দূষণপূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশও দিন দিন মানব-স্বাস্থ্যের উপর মারাত্মক ঝুঁকির কারণ হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে।

মানুষের জীবনযাপন প্রণালি বা স্বভাবের পরিবর্তন একটি সময় সাপেক্ষ ব্যাপার তাই বিজ্ঞানীদের চিন্তাভাবনা হচ্ছে কীভাবে বিদ্যমান জীবনযাপন প্রণালীতেই স্বাস্থ্যঝুঁকি কমানো যায়। গবেষক বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে চা এর রাসায়নিক গুণাবলী আবিষ্কৃত হবার পর মনে করা হচ্ছে চা পানের মাধ্যমেই এ সমস্যার একটি সমাধান পাওয়া যেতে পারে।

স্মরণাতীতকাল থেকেই 'চা'এর ভেষজ/ঔষধী গুণাবলী সম্পর্কে মানুষ জানত। চীনের মনীষী লুয়ু কর্তৃক রচিত আদিতম প্রবন্ধ 'চা চিং' এ উল্লেখ করা হয় যে, যখন কারও গরম লাগে, তৃষ্ণা অনুভূত হয়, হতাশ লাগে, মাথাব্যথা হয়, চোখ ও হাতপায়ে জ্বালাপোড়া করে, ক্লান্তিবোধ হয়, অস্থি-সন্ধিতে ব্যথা হয়, তখন তাঁরা দিনে ৪/৫ বার চা পান করা উচিত। দীর্ঘমেয়াদি চা পানের উপকারিতা সম্পর্কে লুয়ু তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেন যে, –

১. চা পান করলে আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়

২. মনোঃসংযোগ বৃদ্ধি পায়

৩. ক্লান্তি দূরীভূত হয়

৪. অবসাদ দূর করে

৫. চিন্তাশক্তি জাগ্রত হয়

৬. ঝিমানোভাব দূর করে

৭. শরীরকে সতেজ করে এবং

৮. ভাবনা–চিন্তাকে স্বচ্ছ করে।

কনফুসিয়াস–পূর্ব সময়ে চীনা দার্শনিক ও মনীষী চিং-নাং-এর বক্তব্য থেকেও চায়ের গুণাবলী সম্পর্কে জানা যায়। তাঁর মতে– চা মদের চেয়ে ভালো, কারণ তা ক্ষতিকর নয় এবং মানুষকে নেশাগ্রস্ত করে না। আর একটু খোলাসা করে বললে বলা যায়, চা তাতায় কিন্তু মাতায় না।

সাম্প্রতিক সময়ে বিগত শতকের আশির দশকের মাঝামাঝি পানীয় এবং মানব স্বাস্থ্য সম্পর্কে মনোযোগ আকৃষ্ট হয় এবং স্বাস্থ্যের উপর চা এর উপকারী ভূমিকা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা সম্ভব হয়। তার আগে এ সম্পর্কিত গবেষণা শুধুমাত্র অ্যালকেলয়েডেই সীমাবদ্ধ ছিল।

যাহোক, চা এর উপর গবেষণা থেকে চমৎকার ফলাফল পাওয়া যায়। জানা যায় যে, চা এ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট গুণাবলী রয়েছে যা কতিপয় প্রাণঘাতী রোগের বিরুদ্ধে মানবদেহে কার্যকর প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম। এসকল রোগের মধ্যে রয়েছে পৃথিবীব্যাপী দুটি মারাত্মক রোগ যা মানব সমাজের জন্য আতঙ্ক হিসাবে বিরাজমান– ক্যানসার এবং হৃদরোগ। বিষয়টি সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেতে হলে অক্সিডেন্ট এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সম্পর্কে আলোকপাত করা প্রয়োজন

অক্সিজেন ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না। কিন্তু অক্সিজেন আমাদের দেহে কিছু বিষক্রিয়ার সাথেও সংশ্লিষ্ট। ফলে সুস্থ থাকার জন্যে একটা হুমকিস্বরূপও বটে আমরা দেহের ভিতরে অক্সিজেনের বিষক্রিয়া সহ্য করতে পারি কারণ আমাদের দেহের নিজস্ব শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে।

আমাদের দেহের মধ্যে প্রতিনিয়তই বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হচ্ছে, যা বিপাক (metabolism) নামে পরিচিত। অভ্যন্তরীণ স্বাভাবিক বিপাক ক্রিয়ার ফলে অথবা বাহ্যিক বিভিন্ন কারণে অস্থিতিশীল, একক অক্সিজেন পরমাণু তৈরি হয়। বাহ্যিক এসকল কারণের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন প্রকার দূষিত পদার্থ, রাসায়নিক পদার্থ, চাপ, গুরুপাক খাদ্য, ধূমপান, পরোক্ষ ধূমপান, অতি-বেগুনী রশ্মি এবং এমনকি সূর্যরশ্মি। এরকম অক্সিজেন পরমাণুকে বলা হয় মুক্তমূলক বা 'free radicals'। যদিও এসকল মূলক দেহের ভিতরে কিছু উপকারী ভূমিকাও পালন করে, কিন্তু এদের উপস্থিতিতে দেহের কোষ বিনষ্টকরণের হার বৃদ্ধি পায়। এসকল অক্সিজেনমূলকের পরমাণুতে ইলেকট্রনের সংখ্যা স্বাভাবিক থাকে না, তাই এরা জোড় বাঁধার জন্য নতুন ইলেকট্রনগ্রহীতা খুঁজতে থাকে। ফলে আরও নতুন নতুন 'free radicals' তৈরি হতে থাকে

যখন oxidant এর সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়, তখন দেহে বিদ্যমান anti-oxidant এদের প্রশমিত করার জন্য যথেষ্ট হয় না, ফলে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়তে পারে। এর ফলে দেহে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে পারে, যেমন – বুড়িয়ে যাওয়া, ক্যানসার হওয়া বা অন্যান্য।

সৌভাগ্যবশত পরিমাণমতো anti-oxidant গ্রহণের মাধ্যমে এসকল 'free radicals' দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতি অনেকাংশে কমানো সম্ভব। Anti-oxidant একটি ইলেকট্রন প্রদান করে 'free radicals' কে প্রশমিত (neutralize) করার মাধ্যমে এ কাজটি করে 'চা' এ বিদ্যমান পলিফেনল এর মধ্যে অত্যন্ত উৎকৃষ্টমানের anti-oxidant গুণাবলী রয়েছে।

কতিপয় রোগের ক্ষেত্রে anti-oxidant এর ভূমিকা

ক্যানসার: গবেষণায় প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, জারণের ফলে মুক্তমূলকসমূহ দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত কোষসমূহের মাধ্যমেই ক্যানসার সৃষ্টি হয়। এক হিসাবে প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, মানবদেহেও একটি কোষের DNA প্রতিদিন প্রায় ১০,০০০ জারন-আঘাত (oxidative hits) প্রাপ্ত হয়। Anti-oxidant এসকল আঘাতের ফলে ক্ষতির সম্ভাবনা কমিয়ে ক্যান্সারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞানীগণ প্রমাণ পেয়েছেন এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সবুজ চা বা কালো চায়ে বিদ্যমান পলিফেনলসমূহ রাসায়নিক-নিয়ন্ত্রক হিসাবে মুক্ত-মূলকসমূহের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ক্যানসারসহ বহুরোগ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

প্রাথমিকভাবে সবুজ চা এবং পরবর্তীতে কালো চায়ের উপর অর্ধ-শতাধিক পরীক্ষা চালিয়ে এ বিষয়টির প্রমাণ পেয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেস ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. হাসান মুখতার। পরীক্ষার মাধ্যমে একই ফলাফল পান জাপানের ড.ওয়াই হারা এবং ড.সি.এস.ইয়াং, রুটগার বিশ্ববিদ্যালয়, নিউজার্সি।

হৃদরোগ: মুক্তমূলক দ্বারা সংগঠিত জারনের মাধ্যমে দু'ভাবে হৃদরোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়:

১। নিম্নঘনত্বের জারিত লিপো-প্রোটিন (LDL) স্থানান্তরের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি 'atherosclerosis' সৃষ্টির মাধ্যমে। এর ফলে ধমনীগাত্রে চর্বি জমার কারণে ধমনী শক্ত হয়ে যায় এবং কখনো কখনো হার্ট অ্যাটাক হয়। এক্ষেত্রে হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকের সময় তৎক্ষণিকভাবে ক্ষতিসাধন করতে পারে

২। গবেষকগণ প্রমাণ করেছেন যে, ant-oxidant সমূহ রক্ত জমাট বাঁধা বন্ধ করে এবং হৃৎপিণ্ডের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এ উভয় প্রক্রিয়াকে কমিয়ে দেয়। প্রতিদিন ৪-৫ কাপ সবুজ বা কালো চা পান করার মাধ্যমে দুটি দীর্ঘমেয়াদি জটিল হৃদরোগের ঝুঁকি অনেক কমানো যেতে পারে। এ দুটি ঝুঁকি হল রক্তে উচ্চমাত্রার কোলেস্টেরল এবং উচ্চ রক্তচাপ।

চোখের রোগ: মানবদেহে জারন ক্রিয়ার ফলে বুড়িয়ে যাবার সাথে সাথে চোখে হানি পড়ে। প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, উচ্চ মাত্রায় অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট গ্রহণের মাধ্যমে এ সমস্যাটি প্রতিরোধ বা বিলম্বিত করা সম্ভব।

বাতরোগ: প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, বিভিন্ন বাতরোগ যেমন- অর্থ্রাইটিস অ্যান্টি-

অক্সিডেন্ট গ্রহণের মাধ্যমে প্রতিরোধ করা সম্ভব বা উপশম করা সম্ভব। বয়স বাড়ার সাথে সাথে মানুষের দেহের বহুবিধ রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে অথবা বন্ধ হয়ে যায়। অ্যান্টি-অক্সিডেন্টসমৃদ্ধ খাদ্য এই প্রক্রিয়াটিকে আংশিক প্রতিহত করতে পারে।

বহুমূত্র: কিছু সীমিত প্রমাণ রয়েছে যে, বহুমূত্র রোগের ক্ষেত্রে 'চা' প্রাণীদেহে শর্করা সহনশীলতা তৈরিতে সাহায্য করে।

দন্তক্ষয়: চায়ে বিদ্যমান ফ্লুরাইড দাঁতের এনামেলকে দৃঢ় করে এবং দন্তক্ষয় বা দাঁতে গর্ত হওয়া প্রতিরোধ করে। এমনকি প্রতিদিন এক কাপ 'চা' পানের মাধ্যমে মুখের সংক্রমণ এবং দাঁতের গোড়ায় প্লাক তৈরি হওয়া হ্রাস পায়। চা পানে একটি সুন্দর প্রবাদ আছে তা এরূপ– "A cup a day keeps the dentist away".

চর্মরোগ: চায়ের কিছু গুণাবলী আছে যা মানবদেহের রক্ত সংবহনতন্ত্রে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি করার মাধ্যমে ত্বকের সজিবতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। এর ফলে মানুষের বুড়িয়ে যাওয়া প্রতিরোধে ভূমিকা রাখে। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে কসমেটিক কোম্পানিগুলো ত্বকের উপর এরূপ প্রভাব নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

চা এর প্রাণরসায়ন এবং খাদ্যমান মানবদেহে পানির একটি আনন্দদায়ক উৎস

উষ্ণমণ্ডলীয় দেশসমূহের একজন লোকের প্রতিদিন ১.৭ লিটার পানি গ্রহণ করা প্রয়োজন এবং ক্রান্তীয় দেশসমূহের পানির দৈনিক মাথাপিছু চাহিদা দু'লিটার প্রতিদিনের খাদ্যের অংশ হিসাবে প্রায় ক'লিটার পানি আমরা গ্রহণ করে থাকি তাছাড়া শর্করা এবং চর্বির বিপাকের সময়ও দেহে কিছু পানি উৎপন্ন হয়। সুতরাং প্রতিদিন প্রায় এক লিটার বা চার থেকে ছয় গ্লাস পানি গ্রহণ করা আবশ্যক। চা পানের অভ্যাসের মাধ্যমে এ চাহিদা খুব সহজে এবং আনন্দের সাথে পূরণ করা সম্ভব। তাছাড়া চায়ের ক্যালোরি মান (calorific value) নেই বললেই চলে। অন্যান্য পানীয় প্রচুর ক্যালোরিযুক্ত।

পুষ্টি উপাদান

চায়ে শর্করা, আমিষ এবং চর্বির পরিমাণ খুবই কম। অন্যান্য খাদ্যের তুলনায় এসকল পুষ্টি উপাদান নগণ্য পরিমাণে বিদ্যমান। নিম্নের সারণিতে চায়ের কচি ডগায় বিদ্যমান এসকল পদার্থের পরিমাণ উল্লেখ করা হল:

উপাদান		গ্রাম/প্রতি ১০০ গ্রাম শুকনো পাতার ওজন
ক)	ঠান্ডা পানিতে দ্রবণীয়	
i) ফ্ল্যাভেনলস:		
	a) এপিগ্যালোক্যাটিকিনগ্যালেট (EGCG)	৯ - ১৩
	b) এপিগ্যালোক্যাটিকিন (ECG)	৩ - ৬
	c) এপিক্যাটিকিন গ্যালেট (ECG)	৩ - ৬
	d) এপি ক্যাটিকিন (EC)	১ - ৩
	e) গ্যালোক্যাটিকিন (GC)	১ - ২
	f) ক্যাটিকিন (C)	১ - ২
ii)	ফ্ল্যাভেনলস এবং তাদের গ্লাইকোসাইড	৩ - ৪
iii)	লিউকো অ্যানথো সায়ানিনস্	২ - ৪
iv)	ফেনলিক এসিডসমূহ	৪
	উপরোক্ত সর্বমোট পলিফেনলসমূহ	২৭ - ৪০
v)	ক্যাফেইন	৩ - ৪
vi)	অ্যামাইনো এসিডসমূহ	
	a) থিয়ানিন	২
	b) অন্যান্য	২
vii)	শর্করা	৪
viii)	জৈব এসিডসমূহ	০.৫
ix)	উদ্বায়ী যৌগসমূহ	০.০১
x)	অ্যামইনো এসিড	২
খ)	গরম পানিতে দ্রবণীয়	
	i) পলি স্যাকারাইড (শ্বেতসার)	২ – ৫
	ii) আমিষ	১৫
	iii) অ্যাস (অজৈব পদার্থ)	৫
	পানিতে অদ্রবণীয়	
	i) সেলুলোজ	৭
	ii) লিগনিন	৬
	iii) লিপিড	৩
গ)	ঠান্ডা পানিতে দ্রবণীয়	
	i) অ্যামাইনো এসিড	২
	ii) শর্করা	৪
	গরম পানিতে দ্রবণীয়	
	i) পলি স্যাকারাইড (শ্বেতসার)	২ – ৫
	ii) অ্যামাইনো এসিড	২

Black Tea ও Green Tea এর মধ্যে প্রধান পার্থক্য :

একই কচি কিশলয় থেকে black tea ও green tea করা হয়ে থাকে কেবল মাত্র প্রক্রিয়াজাতকরণে পার্থক্য রয়েছে Black tea ও green tea এর মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা হল– কাল উত্তপ্ত কড়াই প্লেটের উপর রেখে গরম বাষ্পচালিত করা হয়। এ সময় চা পাতার এনজাইম অকার্যকর থাকে এবং রোলিং করার সময় বা পরে কোন রাসায়নিক বিক্রিয়া হয় না ; ফলে এরূপ রোস্টিং ও ভাজা পাতার রাসায়নিক গুণাগুণ কচি ও তাজা চা পাতার সম একই গুণাগুণ সমৃদ্ধ থাকে।

ফ্ল্যাভোনয়েডের দৃষ্টিকোণ থেকে যদি কালো চা এবং সবুজ চাকে মূল্যায়ন করা যায় তাহলে নিম্নোক্ত তুলনামূলক ছকটি গ্রহণ করা যায় ।

ফ্ল্যাভোনয়েডসমূহ	শতকরা কঠিন উপাদন হিসেবে চা থেকে প্রাপ্ত পরিমাণ	
	কালো চা (Black)	সবুজ চা (Green)
ক্যাটিকিন	৮	৭০
থিয়াফ্ল্যাভিন	১২	০
থিয়ারুবিজিন (TRs)	৭১	০
ফ্ল্যাভোনলস	১০	১০
পলিমারিক ফ্ল্যাভোনয়েডস	০	২০ (TRs বাদ দিয়ে)

সূত্র: Hilton, 1973; Balentine, 2001

পলিফেনল (Polyphenols)

পলিফেনলসমূহ, বিশেষ করে যাদেরকে ফ্ল্যাভোনয়েড (flavonoids) বলা হয়, খুবই শক্তিশালী অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট হিসাবে কাজ করে। ফ্ল্যাভোনয়েড এ বিদ্যমান রাসায়নিক উপাদান ক্যাটিকিন (Catechins), থিয়াফ্ল্যাভিন (theaflavins), এবং থিয়ারুবিজিনসমূহ (thearubigins) চায়ের প্রধান স্বাস্থ্যকর উপাদান।

ফ্ল্যাভোনয়েডের উপর গবেষণাগারে পরিচালিত অনেকগুলো গবেষণায় চমৎকার ফলাফল পাওয়া গেছে। যেমন –

- Middleton *et al* (1994), এক গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ পান যে, ফ্ল্যাভোনয়েডসমূহ স্তন্যপায়ী প্রাণীদের অসংখ্য এনজাইম বা উৎসেচকের কার্যকারিতা বন্ধ করে দিতে পারে বা প্রভাবিত করতে পারে। এসকল এনজাইম বিপাক-ক্রিয়ার মাধ্যমে কোষ বিভাজন এবং বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে থাকে তাছাড়া রক্তের অনুচক্রিকার জমাটবাঁধা, নির্বিষকরণ (detoxification), জ্বালা-পোড়া এবং রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থায় যে সকল বিপাকক্রিয়া দায়ী, এসকল এনজাইম সেগুলোকে প্রভাবিত করে।

- Wattenberg *et al* (1992) প্রমাণ পান যে, ফ্ল্যাভোনয়েডসমূহ ক্যানসার সৃষ্টির বিভিন্ন ধাপে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার করে। তাছাড়া বিজ্ঞানীরা প্রমাণ পেয়েছেন যে, ফ্ল্যাভোনয়েডসমূহের উল্লেখযোগ্য মাত্রায় ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক এবং ভাইরাস প্রতিরোধী ভূমিকা রয়েছে। পলিফেনলসমূহের বেশিরভাগই উদ্ভিদজাত এবং তাই উদ্ভিদজাত খাদ্যেই এদেরকে পাওয়া যায়। 'চা' গাছটি পলিফেনলের একটি অসাধারণ উৎস বলা যেতে পারে, কেননা শুষ্ক চায়ের নির্যাসের প্রায় চল্লিশ শতাংশই পলিফেনল।

- Balentine (2001) যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগের তথ্যের আলোকে প্রতি ২৪০ মিলিলিটার বিভিন্ন পানীয়ের মধ্যে প্রাপ্ত ফ্ল্যাভোনয়েড এর পরিমাণ বিশ্লেষণ করে দেখান যে, চা হচ্ছে একটি সর্বোত্তম ফ্ল্যাভোনয়েড উৎস।

- বিভিন্ন উদ্ভিদ উৎসে বিদ্যমান (ফ্ল্যাভোনয়েডসমূহের পরিমাণ/প্রতি ২৪০ মি.লি.) Balentine (2001) নিচের ছকের মাধ্যমে দেখিয়েছেন -

উৎস	mg/240 ml (ফ্ল্যাভোনয়েড)
কালো চা	১২০ – ৩০০
সবুজ চা	১০০ – ২০০
লাল পানীয় (Red wine)	৪০ – ১৪০
আপেল/আপেল	৬ – ১৫
সয়াবিন (শুকনো)	৭৬ – ২০৭
পেঁয়াজ	২৮
লেটুস পাতা	১৭

সবুজ চা এবং কালো চায়ে বিদ্যমান ফ্ল্যাভোনয়েডের তুলনামূলক পরিমাণ

ফ্ল্যাভোনয়েডসমূহের নাম	শুষ্ক নির্যাসে বিদ্যমান (%)	
	কালো চা	সবুজ চা
ক্যাটিকিন (Catechins)	৮	৭০
থিয়াফ্ল্যাভিন (theaflavins)	১২	০
থিয়ারুবিজিন (thearubigins)	৭১	০
ফ্ল্যাভোনল (flavonol)	১০	১০
পলিমার ফ্লেভোনয়ড (Polymar flavonoids)	০	২০
সূত্র: Hilton, 1973, Balentine, 2001		

চায়ে বিদ্যমান ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থসমূহ

Stagg and Millin (1975) দেখান যে, চায়ে নিম্নলিখিত ভিটামিনসমূহ বিদ্যমান:

- থায়ামিন (Thiamin)

- রাইবোফ্ল্যাভিন (Riboflavin)
- নিয়াসিন (Niacin)
- ফলিক এসিড (Folic acid)
- প্যান্টোথেনিক এসিড (Pantothenic acid)
- বায়োটিন (Biotin)
- আইনোসিটল (Inositol)

Tirimanna and Wickramasinghe (1975) উল্লেখ করেন যে, চায়ে ভিটামিন 'ই'ও বিদ্যমান। Ching এবং Mohamed (2001) এর সম্প্রতিক আবিষ্কার হচ্ছে প্রতি কেজি কালো চায়ে ১৮৩.৩ মিলিগ্রাম ভিটামিন 'ই' রয়েছে সুতরাং একথাটি নিঃসন্দেহে বলা যায়, যারা অতিমাত্রায় চা পান করেন, তাঁদের জন্য চা ভিটামিনের একটি চমৎকার উৎস হতে পারে তবে অন্যান্য বহুবিধ সাধারণ খাদ্য এবং পানীয়তে যথেষ্ট পরিমাণ ভিটামিন রয়েছে বিধায় 'চা' এক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে না।

খনিজ উপাদানসমূহ (Minerals)

চা খনিজ উপাদানের একটি চমৎকার উৎস। এতে রয়েছে –
–পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, জিংক এবং লৌহ
চায়ে বিদ্যমান বিভিন্ন খনিজ উপাদানের পরিমাণ

খনিজমৌল	এক লিটার চায়ের নির্যাসে বিদ্যমান খনিজ (%)
Al	2.8
Ca	0.2
Cu	0.9
Fe	< 0.002

খনিজমৌল	এক লিটার চায়ের নির্যাসে বিদ্যমান খনিজ (%)
Mg	2.2
Mn	45.8
K	2.3
Na	< 0.05
Zn	0.44

সূত্র: Powell *et al*, 1998

চায়ের একটি বৈশিষ্ট্য হল এতে সোডিয়ামের পরিমাণ খুবই কম এর ফলে উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের জন্য এটি একটি আদর্শ পানীয়।

চায়ের গুণাবলী

কালো চায়ের থিয়াফ্লেবিন, থিয়ারুবিজিন, ক্যাফেইন, এলুমিনিয়াম উদ্বায়ী সুগন্ধি (Volatile flavoury compounds, VFC) উপাদানের মাত্রার উপর কালো চায়ের গুণাগুণ নির্ভর করে। এছাড়া সুগন্ধ (aroma) কালো চায়ের আর একটি অন্যতম গুণ।

দুধ চা

চায়ের সাথে দুধ এবং চিনি মিশিয়ে খাওয়া হয়। দুধ চা খাওয়া যুক্তরাজ্য এবং এর প্রাচীন কলোনী দেশগুলোতে খুবই জনপ্রিয়। এভাবে তৈরি চা পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ। কম ননীযুক্ত দুধ চায়ে বিদ্যমান পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ নিচের ছকে দেখানো হয়েছে:

উপাদান	এক কাপ চায়ে (১৭০ মিলি) বিদ্যমান	প্রয়োজনীয় মাত্রা (%)
শক্তি	৫২ কিলোজুল	০.৭
প্রোটিন	০.৮৯ গ্রাম	২.০
শর্করা	১.২৫ গ্রাম	০.৫
চর্বি	০.৩৬ গ্রাম	০.৫
	খনিজ পদার্থ	
ক্যালসিয়াম	২৯ মিলিগ্রাম	৪
ম্যাঙ্গানিজ	১.৮ মিলিগ্রাম	১১
পটাসিয়াম	৭৮ মিলিগ্রাম	২
জিংক	০.১৮ মিলিগ্রাম	৩
	ভিটামিনসমূহ	
থায়ামিন (B_1)	১৮ μ গ্রাম	২
রাইবোফ্লাভিন (B_2)	৭১ μ গ্রাম	৭
পাইরিডক্সিন (B_6)	১৮ μ গ্রাম	২
ফলেট	৫ μ গ্রাম	৩
	সূত্র : Walker, 1996	

চা-এর উপজাত (Derivatives of tea)

অ্যালকোহলের সাথে চা-পান বিশ্ববাজারে অ্যালকোহল মিশ্রিত পানীয় চা এবং শেরি হিসাবে চা বিক্রিত হয়। শ্রীলংকা চা গবেষণা ইনস্টিটিউট শতকরা ১০ ভাগ অ্যালকোহলযুক্ত একজাতীয় চা-জাত পানীয় উদ্ভাবন করেছে।

অপ্রচলিত চা-পণ্য (Non-conventional tea products)

জাপানে স্বাস্থ্যকর কিছু পণ্য বহুল প্রচলিত, যেগুলো মূলত চা-জাত। যেমন- সবুজ চা থেকে তৈরি 'ক্যাটেকিন পিল'। সদ্য তোলা সবুজ চা-পাতা সেখানে সবজি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সবুজ চায়ের পাউডার থেকে নুডল, চাল এবং রুটি ও টুথপেস্ট তৈরি করে বিক্রি করা হয়। চায়ের নির্যাস এবং ক্যাটেকিন নির্যাস পানীয়তে ব্যবহার করা ছাড়াও চুইংগাম, ল্যাক্সেটিভ, মাউথ-ওয়াশ, ডিওডোরেন্ট, সাবান, প্রসাধনী এবং সান-স্ক্রিন হিসাবে ব্যবহৃত হয়। চা'কে পুনরায় প্রক্রিয়াজাত করে মিষ্টি, জ্যাম এবং জেলি তৈরি করা হয়। চা'কে বালিশে পুরে বালিশ তৈরি করা হয়, গোসলের স্পঞ্জ হিসাবে ব্যবহার করা হয়, মালিশের তেলে ব্যবহার করা হয়, বায়ু-শোধনে এবং স্প্রেতেও ব্যবহৃত হয়।

চায়ে বিদ্যমান পুষ্টিগুণ এবং উপকারী উপাদানসমূহ

চায়ে পাঁচ শতাধিক রাসায়নিক উপাদান রয়েছে। মানবস্বাস্থ্যের জন্য উপকারী যে সকল উপাদান রয়েছে তার মধ্যে রয়েছে ফ্ল্যাভোনয়েড, অ্যামাইনো এসিড, ভিটামিন, ক্যাফেইন এবং পলিস্যাকারাইড। তাছাড়া চায়ে অনেকগুলো অত্যাবশ্যক পুষ্টিমৌল বিদ্যমান। সবুজ চা ভিটামিন-সি সমৃদ্ধ এবং পরিমাণগত দিক দিয়ে তা লেবু (১০০ মিলিগ্রাম/১০০ গ্রাম চা) এবং যকৃতের সাথে তুলনীয় (Stagg & Millin 1975)। কিন্তু কালো চা প্রস্তুতকালে গাঁজন প্রক্রিয়ার সময় এসব ভিটামিনের নব্বই শতাংশই নষ্ট হয়ে যায়। ভিটামিন-বি গ্রুপ সবুজ এবং কালো চায়ে সম-পরিমাণে বিদ্যমান এবং ৯০-১০০% চায়ের নির্যাসে বিদ্যমান থাকে। যা আমরা পান করি। ভিটামিন-ই এবং ভিটামিন-কে এর উপস্থিতির বিষয়টি জানা গিয়েছে।

চা গাছে উচ্চমাত্রার ফ্লোরিন থাকে যা বয়স্ক পাতায় শতশত পিপিএম। চা পানের মাধ্যমে গৃহীত ফ্লোরিন দাঁতের ক্ষয় নিবারণ করে বলে জানা যায়। সোডিয়ামের চেয়ে অনেক বেশি পটাসিয়াম থাকায় 'চা' উচ্চ রক্তচাপে বিশেষ উপকারী। চা ম্যাঙ্গানিজ এবং জিংকের খুবই ভালো উৎস। তবে চায়ে কপার এবং লোহার পরিমাণ অনেক কম। এ সকল তথ্য পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

চায়ে ২৫টি অ্যামাইনো এসিড রয়েছে যার মধ্যে থিয়ানিন এর পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। চায়ে বিদ্যমান ক্যাফেইনের পরিমাণ প্রায় ২.৫%। চায়ে বিদ্যমান মানব স্বাস্থ্যের জন্য সবচেয়ে বেশি উপকারী উপাদান হচ্ছে পলিফেনল। বিভিন্ন চায়ের পরিমাণ ১০-১২% এবং সবুজ চায়ে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। পলিফেনলসমূহের মধ্যে সবচেয়ে উপকারী হচ্ছে ক্যাটিকিনসমূহ

মানবদেহে অত্যাবশ্যক বিভিন্ন পুষ্টিমৌলের চাহিদা পূরণে চায়ের অবদান

মৌল	দৈনিক মাথাপিছু চাহিদা (mg)	শুকনো চা পাতা থেকে নিঃসৃত মৌলের পরিমাণ (%)	১০ গ্রাম চা থেকে প্রাপ্ত প্রতিদিনের গড় পরিমাণ (mg)	চাহিদা পূরণের পরিমাণ (%)
লৌহ	১২ – ১৫	<১০	০.১ – ০.২	<১ – ১.৬
কপার	২ – ৫	৭০ – ৮০	০.৫ – ০.৬	১০ – ৩০
ম্যাঙ্গানিজ	৩ – ৯	৩৩ – ৩৬	৪ – ৮	৬০– ১০০
নিকেল	০.৫ – ০.৫	৫০	০.০৩ – ০.৬	১০ – ২০
অ্যালুমিনিয়াম	১০ – ৫০	১৬ – ১৮	১.৩ – ১.৯	৫ – ২০
পটাসিয়াম	১৫০০– ৩০০০	৯০ – ৯৭	১৪০ – ২০০	৬ – ১৩
আর্সেনিক	০.১ – ০.৩	৩২	০.০০৩ – ০.০০৭	১ – ৭

জিংক	১০ – ১৫	৩৬ – ৫৬	০.২ – ০.৪	১.৩– ৪.০
সেলেনিয়াম/ স্ক্যানডিয়াম	০.০৫ – ০.২০	৪ – ২৪	০.০০২ – ০.০০৪	১.০– ৮.০
ম্যাগনেসিয়াম	২২০ – ৪০০	৪৬ – ৫৩	৬ – ১০	১.৮– ৫.০
ক্যালসিয়াম	৪০০ – ১৫০০	৫ – ৭	২.৫ – ৫.২	০.৩– ১.৩
ফ্লোরিন	০.৫	৫০ – ৬০	০.৩ – ০.৪	৬০ – ৮০
বেরন	১০ – ২০	২৪ – ৩১	০.০৪ – ০.১০	০.৩– ১.০
সালফার	৪২০ – ৩০০০	৫০ – ৬০	৫ – ৮	০.২– ১.৯
ফসফরাস	১২০০ – ২৭০০	২৫ – ৩৫	০৪ – ৫.০	০.১– ০.৫
সোডিয়াম	১ ৬০০– ২৭০০	১০ – ২০	২.৫ – ৪.০০	০.১৫– ০.২৫
লেড	০.৩ – ০.৪	<১০	০.০০০৪– ০.০০০৫	<০.১

সূত্রঃ Stagg and Millin 1975, Takeo – 1983, Chen Z. M. 1990

নবম অধ্যায়

চা গাছের পুষ্টি, মৃত্তিকার উর্বরতা এবং সার ব্যবস্থাপনা
(Nutrition soil fertility and fertilizer management of tea)

ক্লোরিন ছাড়াও আরও ৫টি উপাদান আছে যা কোন কোন উদ্ভিদ গ্রহণ করলে উদ্ভিদের উপকার হয় আবার না হলেও জীবনচক্র সম্পন্ন করতে অসুবিধা হয় না। এসকল উপাদানকে উপকারী উপাদান (beneficial element) বলা হয়। এগুলো হল অ্যালুমিনিয়াম, সোডিয়াম, কোবাল্ট ভ্যানাডিয়াম ও সিলিকন।

তবে অ্যালুমিনিয়ামকে একমাত্র চায়ের জন্য অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি মৌল হিসাবে বিবেচনা করা হয় কারণ যে মাটিতে অ্যালুমিনিয়াম নেই সে মাটিতে চা হয়না। চা গাছের কোন অংশকে বিশ্লেষণ করলে প্রায় ১৬০০ পিপিএম পর্যন্ত অ্যালুমিনিয়াম পাওয়া যায়। তবে এত বিপুল পরিমাণ অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে চা গাছ কি করে তা আজও অজানা রয়ে গেছে।

অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদানগুলো উদ্ভিদ সমভাবে গ্রহণ করে না কোন কোন উপাদান বেশি পরিমাণে এবং কোন কোন উপাদান অল্প পরিমাণে গ্রহণ করে তবে কম বেশি যে পরিমাণেই গ্রহণ করুক না কেন, সব উপাদানই প্রয়োজন। উদ্ভিদের গ্রহণের পরিমাণের উপর নির্ভর করে পুষ্টি উপাদানগুলোকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। যে সকল উপাদান পরিমাণে বেশি গ্রহণ করে সেগুলোকে বলা হয় মুখ্য উপাদান (major or macro element)।

মুখ্য উপাদান মোট ৯টি। যে সকল উপাদান অল্প পরিমাণে গ্রহণ করে সেগুলোকে বলা হয় গৌণ উপাদান (minor or micro element)। গৌণ উপাদান ৭টি। মুখ্য উপাদানগুলোকেও গ্রহণের পরিমাণের পার্থক্যের উপর নির্ভর করে আবার দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন প্রাইমারি (primary) এবং সেকেন্ডারি (secondary) পুষ্টি উপাদান। উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদানের বিভক্তি উল্লেখ করা হল –

পুষ্টি উপাদান			
মুখ্য উপাদান		গৌণ উপাদান	উপকারী উপাদান
প্রাইমারি	সেকেন্ডারি		
		জিংক	অ্যালুমিনিয়াম
কার্বন	ক্যালসিয়াম	ম্যাঙ্গানিজ	সোডিয়াম
হাইড্রোজেন	ম্যাগনেসিয়াম	আয়রন	সিলিকন
অক্সিজেন	সালফার	কপার	কোবাল্ট
নাইট্রোজেন		মলিবডেনাম	ভ্যানাডিয়াম
ফসফরাস		বোরন	
পটাসিয়াম		ক্লোরিন	

উদ্ভিদের শুকনো ওজনের প্রায় ৯০-৯৫% কার্বন, হাইড্রোজেন, এবং অক্সিজেন দিয়ে গঠিত। এ তিনটি ব্যতীত অন্যান্য মুখ্য উপাদান প্রতিটি প্রায় ০.২% এবং গৌণ উপাদান প্রতিটি প্রায় ১০০ পিপিএম এর নিচে প্রয়োজন হয়।

অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদানের উৎস

উদ্ভিদ অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদানগুলোর মধ্যে কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন বায়ু এবং পানি হতে সরাসরি গ্রহণ করতে পারে। ফলে উদ্ভিদের এ তিনটি উপাদানের কোন প্রকার ঘাটতি দেখা দেয় না। তাই এ তিনটি উপাদানকে সার হিসেবে সরবরাহ করতে হয় না। প্রকৃতিতে এ তিনটি উপাদান প্রচুর পরিমাণে সহজলভ্য হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে। তাই এ তিনটি উপাদান ছাড়া অন্যান্য উপাদানগুলো মাটি হতে সংগ্রহ করে। এ তিনটি উপাদান ছাড়া অন্যান্য উপাদানগুলোকে খনিজ উপাদান বা খনিজ পুষ্টিও বলা হয়।

কার্বন (C)

উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য তৈরির সময় পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে বায়ু হতে কার্বন ডাইঅক্সাইড হিসেবে কার্বন গ্রহণ করে থাকে।

হাইড্রোজেন (H)

উদ্ভিদ মাটি হতে শিকড়ের সাহায্যে খাদ্য গ্রহণের সময় পানিতে বিদ্যমান হাইড্রোজেন স্বয়ংক্রিয়ভাবেই গ্রহণ করে থাকে।

অক্সিজেন (O)

পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে বায়ু হতে কার্বন ডাইঅক্সাইড হিসাবে এবং শিকড়ের মাধ্যমে মৃত্তিকায় উপস্থিত পানি হতে অক্সিজেন গ্রহণ করে থাকে।

উদ্ভিদ উল্লেখিত তিনটি উপাদান ছাড়া অন্যান্য উপাদানগুলো মৃত্তিকা হতে সংগ্রহ

করে। মৃত্তিকায় যদি ঘাটতি দেখা দেয় তবে বাহির হতে উপাদানগুলো সার হিসাবে সরবরাহ করতে হয়। চা মৃত্তিকায় নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়ামের ঘাটতি প্রকট। এছাড়া বাগান বিশেষে সালফার এবং অনুখাদ্য জিংক, বোরন, ম্যাঙ্গানিজের ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। আয়রন, কপার, ক্লোরিন ও মলিবডেনামের তেমন কোন ঘাটতি দেখা যায়না। বাংলাদেশের চা মাটিতে প্রচুর পরিমাণে আয়রন এবং অ্যালুমিনিয়াম আছে বিধায় এ দুটি উপাদানের কোন ঘাটতি নেই। তাছাড়া রোগবালাই মাকড় দমনে কপার ফাঙ্গিসাইড এবং সালফার সিঞ্চন করার ফলে কপার, সালফার এবং এমওপি সার প্রয়োগের সময় ক্লোরিন যোগ করা হচ্ছে। ফলে এ তিনটি উপাদানেরও ঘাটতি নেই।

উদ্ভিদের খাদ্য উপাদানের কার্যাবলী ও ঘাটতিজনিত লক্ষণ-

মুখ্য উপাদান (major element)

নাইট্রোজেনের (N) কার্যাবলী

১. নাইট্রোজেন উদ্ভিদের কোষ গঠনে অংশগ্রহণ করে।
২. উদ্ভিদের উপরিভাগে পত্র পল্লব বৃদ্ধি করে।
৩. লিপোপ্রোটিন, ক্লোরোফিল, হরমোন এবং ভিটামিন তৈরিতে সহায়তা করে।
৪. ফসফরাস এবং পটাসিয়ামসহ অন্যান্য পুষ্টি উপাদান গ্রহণ নিয়ন্ত্রণ করে।

ঘাটতিজনিত লক্ষণ

১. নতুন পাতা এবং নতুন কুঁড়ি হলদে রং ধারণ করে।
২. পাতার আকৃতি ছোট এবং কিশলয়ের আকৃতি খর্ব হয়।
৩. পাতা ও কিশলয়ের বৃদ্ধি ধীর/ব্যাহত হয় ফলে উৎপাদন কমে যায়।

ফসফরাসের (P) কার্যাবলী

১. কোষ বিভাজনে অংশগ্রহণ করে এবং শেকড় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।
২. এক কোষ হতে অন্য কোষে শক্তি সঞ্চালন করে।
৩. এনজাইমের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে।
৪. কার্বহাইড্রেট প্রস্তুত এবং সঞ্চালনে সহায়তা করে।
৫. পাতার সাহায্যে অতিরিক্ত প্রস্বেদনে বাঁধা দান করে।
৬. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

ঘাটতিজনিত লক্ষণ

১. বয়স্ক পাতার রং সাধারণ সবুজের চেয়ে অতিরিক্ত গাঢ় সবুজ বর্ণ ধারণ করে এবং পাতার উজ্জ্বলতা নষ্ট হয়।
২. পাতার আকৃতি ছোট এবং কিশলয় সরু হয়।
৩. গাছের শেকড়ের সংখ্যা ও বৃদ্ধি স্বাভাবিকের চেয়ে কমে যায়।

পটাসিয়ামের (K) কার্যাবলী

১. উদ্ভিদের শাখা-প্রশাখা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।
২. অন্যান্য পুষ্টি উপাদান গ্রহণে সহায়তা করে।
৩. উদ্ভিদের শ্বসন ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।
৪. অতিরিক্ত প্রস্বেদন ক্রিয়া ব্যাহত করে।
৫. এনজাইমের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে।
৬. শর্করা প্রস্তুত ও গাছের বিভিন্ন অংশে তা পৌঁছে দিতে সহায়তা করে।
৭. খরা ও ক্ষারজনিত ক্ষতিকর প্রভাব প্রতিরোধের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
৮. উদ্ভিদের রোগবালাই প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে
৯. মৃত্তিকা হতে অন্যান্য পুষ্টি উপাদান গ্রহণে সহায়তা করে।
১০. কার্বোহাইড্রেট ও লিপিড প্রস্তুতে সহায়তা করে।

ঘাটতিজনিত লক্ষণ

১. কিশলয়ের অগ্রভাগ পুড়ে যায়।
২. পাতা ও কিশলয় নীচের দিকে হেলে যায়।
৩. কিশলয় সরু ও শক্ত হয়ে যায়।
৪. গাছের কার্বোহাইড্রেট তৈরির পরিমাণ কমে যায়

ক্যালসিয়ামের (Ca) কার্যাবলী

১. কিশলয়ের অগ্রভাগের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে
২. ক্যালসিয়াম কোষ প্রাচীরের অংশ বিশেষ
৩. উদ্ভিদের বিষাক্ততা কমিয়ে দেয়।
৪. কোষ বিভাজনে অংশগ্রহণ করে
৫. শর্করা জাতীয় খাদ্য সঞ্চালনে সহায়তা করে।
৬. গাছের কাণ্ডকে শক্ত করে।

ঘাটতিজনিত লক্ষণ

১. পাতা নৌকাকৃতি হয়ে যায়।
২. কিশলয়ের অগ্রভাগ বাঁকা হয়ে যায়/ভেঙে যায়।
৩. দুটি পত্রকক্ষের মধ্যবর্তী দূরত্ব কমে যায়।

ম্যাগনেসিয়ামের (Mg) কার্যাবলী

১. ক্লোরোফিল তৈরিতে অংশ নেয়।
২. এনজাইমের বিক্রিয়াকে সহায়তা করে।
৩. গাছের বিভিন্ন অংশে ফসফরাসকে সরবরাহ করতে সহায়তা করে।

৪. মাটি হতে ফসফরাস গ্রহণে সহায়তা করে
৫. কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, লিপিড ও ভিটামিন তৈরিতে অংশগ্রহণ করে।

ঘাটতিজনিত লক্ষণ

প্রাপ্তবয়স্ক ও নিচের পাতার মাঝামাঝি শিরার দিকে ক্লোরোসিস দেখা দেয়।

সালফারের (S) কার্যাবলী

১. কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটিন তৈরিতে অংশগ্রহণ করে।
২. ক্লোরোফিল তৈরিতে সহায়তা করে
৩. নাইট্রোজেন ব্যবহারে সহায়তা করে।

ঘাটতিজনিত লক্ষণ

১. নূতন পাতার রং হলুদ হয়ে যায়।
২. পাতার পার্শ্ব বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, ফলে পাতা সরু হয়ে যায়

গৌণ উপাদান (minor element)

জিংকের (Zn) কার্যাবলী

১. উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে অংশ নেয় এবং হরমোন তৈরি নিয়ন্ত্রণ করে।
২. প্রোটিন তৈরিতে সহায়তা করে।
৩. কিশলয় বাঞ্জিতে পরিণত হতে সহায়তা করে।
৪. ক্লোরোফিল তৈরিতে সহায়তা করে।
৫. উদ্ভিদের বিপাক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।
৬. ফসফরাস ও পটাশ গ্রহণে সহায়তা করে।

ঘাটতিজনিত লক্ষণ

১. পাতার বৃদ্ধি হ্রাস পায়।
২. কিশলয়ের অগ্রভাগে রোসেটি গঠিত হয়।
৩. পাতা কাণ্ডের মত লম্বা ও সরু হয়।
৪. পাতার আকৃতি অসম হয়।
৫. কিশলয় বাঞ্জিতে পরিণত হয়
৬. পাতার কিনারা ঢেউ খেলানো হয়ে যায়।

ম্যাঙ্গানিজের (Mn) কার্যাবলী

১. ক্লোরোফিল গঠনে সহায়তা করে।
২. কার্বন ও নাইট্রোজেন আত্মীকরণে সহায়তা করে।
৩. এনজাইমের জৈবিক কার্যে সহায়তা করে

ঘাটতিজনিত লক্ষণ

১. পাতার শিরার অন্তরবর্তী পত্রকলার রং হালকা সবুজ হয়ে যায় এবং পরে হলুদ রং ধারণ করে
২. সবুজ শিরার সংখ্যা কমে যায়।
৩. পাতায় লাল বাদামি রংয়ের স্পট পড়ে।

লৌহের (Fe) কার্যাবলী

১. কিছু কিছু এনজাইমের অপরিহার্য অংশ।
২. ক্লোরোফিল তৈরিতে অংশ নেয়।
৩. নিউক্লিক এসিড বিপাকে সহায়তা করে।

ঘাটতিজনিত লক্ষণ

১. নূতন পাতায় ক্লোরোসিস দেখা দেয়।
২. পাতার রং হালকা সবুজ হয়ে যায়।

বোরনের (B) কার্যাবলী

১. গাছের বিভিন্ন অংশে কার্বোহাইড্রেট সরবরাহ করে
২. গাছের পানি গ্রহণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
৩. শেকড় বৃদ্ধিতে অংশগ্রহণ করে

ঘাটতিজনিত লক্ষণ

১. কিশলয়ের অগ্রভাগ পুড়ে যায় বা অগ্রভাগ হতে নিচের দিকে মরা শুরু হয়।
২. পাতা মোড়ানো, সরু এবং চামড়ার মত শক্ত হয়ে যায়।
৩. পাতা গাঢ় সবুজ বর্ণ ধারণ করে।

কপারের (Cu) কার্যাবলী

১. এটি এনজাইমের অত্যাবশ্যকীয় অংশ।
২. সালোকসংশ্লেষণ ও শ্বসন ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।
৩. প্রোটিন ও কার্বোহাইড্রেট বিপাকে অংশগ্রহণ করে।
৪. নাইট্রোজেন বিপাকে ভূমিকা রাখে
৫. আয়রন গ্রহণে সহায়তা করে।
৬. ক্লোরোফিল ও ভিটামিন তৈরিতে অংশ নেয়।

ঘাটতিজনিত লক্ষণ

১. পাতা কালচে বর্ণ ধারণ করে।
২. ফারমেন্টেশন হতে সময় বেশি নেয়।
৩. ফারমেন্টেশনের পর পাতার রং উজ্জ্বল বাদামি না হয়ে ধূসর বাদামি হয়।

ক্লোরিনের (Cl) কার্যাবলী

১. কোন কোন এনজাইমের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করে।
২. কার্বোহাইড্রেট বিপাক ত্বরান্বিত করে।
৩. পাতার পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে
৪. গাছের জলীয় অংশের ভারসাম্য রক্ষা করে।

ঘাটতিজনিত লক্ষণ

১. পাতা তামাটে রং ধারণ করে
২. পাতায় wilt, chlorosis, necrosis দেখা দেয়।

মলিবডেনামের (Mo) কার্যাবলী

১. কয়েকটি এনজাইমের উপাদান।
২. অণুজীবের ক্রিয়া বৃদ্ধি করে।

ঘাটতিজনিত লক্ষণ

১. উদ্ভিদের বৃদ্ধি হ্রাস পায়।
২. পাতায় পচন দেখা দেয়।
৩. পাতার আকার ছোট হয়ে যায়

অ্যালুমিনিয়ামের (Al) কার্যাবলী

১. ফসফরাস, পটাশিয়াম ও নাইট্রোজেন গ্রহণে অংশগ্রহণ করে।
২. ফসফরাস ও পটাশ অক্সীকরণ প্রভাবিত করে।
৩. অতিরিক্ত ম্যাগনেসিয়ামজনিত কারণে উদ্ভূত বিষাক্ততা প্রশমিত করে।

ঘাটতিজনিত লক্ষণ

১. চা গাছের বৃদ্ধি হয় না।

চা মৃত্তিকার ভৌত বৈশিষ্ট্য এবং বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের সন্ধিক্ষণ মাত্রা

বুনট	বেলে দোআঁশ, বেলে কাঁদা দোআঁশ
অম্লতা	৪.৫-৫.৮
জৈব কার্বন	১%
নাইট্রোজেন	০.১%
সহজলভ্য ফসফরাস	১০ পিপিএম
সহজলভ্য পটাসিয়াম	৮০ পিপিএম

সহজলভ্য ম্যাগনেসিয়াম	২৫ পিপিএম
সহজলভ্য ক্যালসিয়াম	৯০ পিপিএম
সহজলভ্য সালফার	২০ পিপিএম
সহজলভ্য জিংক	২ পিপিএম
কপার	২ পিপিএম
মলিবডেনাম	২ পিপিএম
বোরন	২ পিপিএম
ক্লোরিন	২ পিপিএম
আয়রন	২০ পিপিএম
এ্যালুমিনিয়াম	৮০ পিপিএম
সি : এন অনুপাত	১০ : ১

পাতা চয়নের ফলে যে পরিমাণ খাদ্যোপাদান মাটি থেকে আহরিত হয়

নাইট্রোজেন	৪%
ফসফরাস	১%
পটাসিয়াম	২৫ পিপিএম
ক্যালসিয়াম	০.৩%
ম্যাগনেসিয়াম	০.১৬%
জিংক	১ পিপিএম
কপার	১ পিপিএম
মলিবডেনাম	১ পিপিএম
বোরন	১ পিপিএম

বিভিন্ন খাদ্যোপাদানের পরিবর্তনীয় গুণক

% ফসফরাস	= % ফসফেট × ০.৪৩
% ফসফেট	= % ফসফরাস × ২.২৯
% পটাস	= % পটাসিয়াম অক্সাইড × ০.৮৩
% পটাসিয়াম অক্সাইড	= % পটাশ × ১.২
% জৈব পদার্থ	= % জৈব কার্বন × ১.৭২
% জৈব কার্বন	= জৈব পদার্থ ÷ ১.৭২
ক্যালসিয়াম অক্সাইড	= ক্যালসিয়াম × ১.৩৪
ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড	= ম্যাগনেসিয়াম × ১.৬৭

সার (Manures and Fertilizers)

উদ্ভিদের দেহের বৃদ্ধি ও এর যথাযথ পুষ্টির জন্য যে সকল সামগ্রীর মধ্যে এক বা একাধিক উদ্ভিদ খাদ্যোপাদান গাছের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় বজায় থাকে তাকেই সার বলে বা জমিতে ফসলের জন্য আবশ্যকীয় খাদ্যোপাদানসমূহের ঘাটতি পূরণ করে উদ্ভিদের ফলন ও পুষ্টিবর্ধনের উদ্দেশ্যে এবং ভূমির হারানো উর্বরতা পুনরুদ্ধার করার উদ্দেশ্যে বাহির থেকে যে সব খাদ্যোপাদান জমিতে প্রয়োগ করা হয় তাকেই সার বলা হয়। অথবা মাটিতে গ্রহণযোগ্য অবস্থায় উদ্ভিদের পুষ্টি সরবরাহ করে এমন যে কোন পদার্থকে সার বলা হয় অথবা যে সকল পদার্থ সরবরাহ করা হলে উদ্ভিদের দৈহিক বৃদ্ধি, পুষ্টি উপাদান, মান এবং পুষ্টি গুণাগুণ বাড়ে তাকে সার বলা হয়। সার প্রয়োগ চা উৎপাদন খরচের একটি প্রধান অংশ।

চা উৎপাদন খরচের ১৫-২০% সার প্রয়োগ বাবদ হয়। চা একটি দীর্ঘস্থায়ী এক ফসলি অর্থকরী শস্য। মৃত্তিকার স্বাস্থ্য, চা গাছের বৃদ্ধি এবং চা উৎপাদন অধিক এবং টেকসই রাখার জন্য চা বাগানে প্রতি বছর নির্দিষ্ট সময়ে সুষম সার প্রয়োগ করতে হয়। সঠিক সময়ে সার প্রয়োগসহ অন্যান্য রুটিন মাফিক কাজ যেমন- প্রুকিং, প্রুনিং, পেস্ট ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সম্পন্ন করা হলে অধিক পরিমাণে টেকসই চা উৎপাদন করা সম্ভব।

সার ৩ প্রকার –

১. **জৈব সার:** সাধারণত জীবদেহজাত সারকে জৈব সার বলা হয়। প্রাকৃতিক উৎস হতে জৈব সার প্রস্তুত করা হয়। উদ্ভিদ ও প্রাণীর গলিত ও পচনশীল দেহাবশেষ, জীবজন্তুর মল-মূত্র প্রভৃতি মাটিতে পচিয়ে যে সার তৈরি করা হয় তাকেই জৈব সার বলে। গোবর একটি উন্নত ও অধিক পরিমাণে সহজলভ্য জৈব সার। এছাড়া অন্যান্য প্রাণীর মল-মূত্র, পোলট্রি ফার্মের বিষ্ঠা, আবর্জনা পচা বা কম্পোস্ট, সবুজ সার, পাতা পচা সার, শুটকি মাছের গুঁড়া, খৈল, হাড়ের গুঁড়া, ফসলের অবশিষ্টাংশ, টি ওয়েস্ট ইত্যাদি সবই জৈব সার।

২. **অজৈব বা রাসায়নিক সার:** কৃত্রিম উপায়ে রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে যে সকল সার কলে-কারখানায় তৈরি করা হয় সে সকল সারকে রাসায়নিক বা অজৈব সার বলা হয়। যেমন- ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি ইত্যাদি।

৩. **জীবাণু সার:** একটি কালচার তৈরি করে সে কালচারে বিভিন্ন প্রকার জীবাণু জন্মিয়ে তা সার হিসাবে জমিতে প্রয়োগ করা হলে সে সারকে জীবাণু সার বলা হয়। যেমন, রাইজোবিয়াম, এজোস্পাইরেলিয়াম, ব্লু-গ্রিন আলজি ইত্যাদি।

সার প্রয়োগের উদ্দেশ্য

১. উদ্ভিদকে বাহির হতে খাদ্যোপাদান সরবরাহ করা ।
২. বিদ্যমান খাদ্যোপাদানের অভাব হলে তা পূরণ করা।
৩. পর্যাপ্ত খাদ্যোপাদানের পরিমাণ সব সময় চলমান রাখা
৪. অধিক উৎপাদন পাওয়ার জন্য
৫. ফসলের মান উন্নয়নের জন্য।
৬. উদ্ভিদের সতেজ ও দ্রুত বৃদ্ধির জন্য

চা'য়ে ব্যবহৃত কয়েক'টি সারের বৈশিষ্ট্য

ইউরিয়া (Urea) - $CO(NH_2)_2$

১. সাদা ও ছোট ছোট দানাদার।
২. বায়ু হতে আর্দ্রতা গ্রহণ করে।
৩. ১ কেজি ইউরিয়া সার এ ৪৬% নাইট্রোজেন আছে।
৪. ১ কেজি ইউরিয়া সার এ ০.৫% আর্দ্রতা বিদ্যমান
৫. বাষ্পে পরিণত হয়ে নাইট্রোজেন উড়ে যায়।
৬. কনভারশন ফেক্টর ১০০/৪৬ = ২.২
(১ কেজি নাইট্রোজেন = ২.২ কেজি ইউরিয়া)।
৭. সমতুল অম্লত্ব-৮০।

নাইট্রোজেন সার-এমোনিয়াম সালফেট

(Ammonium sulphate) – $(NH_4)_2SO_4$

১. সাদা ক্রিস্টাল।
২. বায়ু হতে আর্দ্রতা গ্রহণ করে না।
৩. ১ কেজি এমোনিয়াম সালফেট সার এ ২১% নাইট্রোজেন আছে।
৪. ১ কেজি এমোনিয়াম সালফেট সার এ ২৪% সালফার আছে।
৫. ১ কেজি এমোনিয়াম সালফেট সার এ ০.৫% আর্দ্রতা বিদ্যমান।
৬. নাইট্রোজেন গলে বাষ্পে পরিণত হয় না।
৭. সমতুল অম্লত্ব-১১০ ।
৮. কনভারশান ফেক্টর ১০০/২০ = ৫ ।

ফসফেট সার

রক ফসফেট (Rock Phosphate) - $3Ca_3(PO_4)_2CaF_2$

১. বাদামি পাউডার

২. আর্দ্রতারোধক।
৩. ১ কেজি রক ফসফেট সার এ ২০-৩০% ফসফেট
৪. ১ কেজি রক ফসফেট সার এ ২০-৩০% ক্যালসিয়াম .
৫. ১ কেজি রক ফসফেট সার এ ১-২% আর্দ্রতা বিদ্যমান।
৬. কনভারশন ফেক্টর ১০০/৩০ = ৩.৩।

এসএসপি (Single Super Phosphate) – $Ca(H_2PO_4)_2$+ $2CaSO_4$

১. বাদামি পাউডার।
২. আর্দ্রতারোধক
৩. ১ কেজি এসএসপি সার এ ২০-২১% ফসফেট
৪. ১ কেজি এসএসপি সার এ ২০% ক্যালসিয়াম।
৫. ১ কেজি এসএসপি সার এ ১-২% আর্দ্রতা বিদ্যমান।
৬. কনভারশন ফেক্টর ১০০/২০= ৫ ।

টিএসপি (Triple Super Phosphate) - $Ca(H_2PO_4)_2.H_2O$

১. কাল/বাদামি দানাদার।
২. আর্দ্রতারোধক।
৩. ১ কেজি টিএসপি সার এ ৪৬% ফসফেট।
৪. ১ কেজি টিএসপি সার এ ১২% ক্যালসিয়াম।
৫. ১ কেজি টিএসপি সার এ ১-২% আর্দ্রতা বিদ্যমান।
৬. কনভারশন ফেক্টর ১০০/৪৬ = ২.২।

ডিএপি (Diammonium Phosphate) – $(NH_4)_2HPO_4$

১. বাদামি দানাদার।
২. বায়ু হতে আর্দ্রতা গ্রহণ করে
৩. ১ কেজি ডিএপি সার এ ৪৬% ফসফেট।
৪. ১ কেজি ডিএপি সার এ ১৮% নাইট্রোজেন।
৫. ১ কেজি ডিএপি সার এ ১-২% আর্দ্রতা বিদ্যমান।
৬. কনভারশন ফেক্টর ১০০/৪৬ = ২.২।

পটাসিয়াম সার

পিএস (Potassium Sulphate) - K_2SO_4

১. সাদা/ পিংক দানাদার
২. ১ কেজি পিএস সার এ ৫০% পটাসিয়াম অক্সাইড
৩. তুলনামূলকভাবে অধিক মূল্য

৪. কনভারশন ফেক্টর ১০০/৫০ = ২

এমওপি (Muriate of Potash) - KCl

১. ধূসর সাদা/পিংক দানাদার
২. পানিতে দ্রবণীয়
৩. ১ কেজি এমওপি সার এ ৬০% পটাসিয়াম অক্সাইড
৪. দামে সস্তা
৫. কনভারশন ফেক্টর ১০০/৬০ = ১.৬৬

চুন (লাইম)/সাধারণ চুন

ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড- $Ca(OH)_2$/ ক্যালসিয়াম অক্সাইড- CaO/ ক্যালসিয়াম কার্বোনেট- $CaCO_3$

১. সাদা পাউডার
২. অর্দ্রতারোধক
৩. ১ কেজি চুন এ ৫০-৯০% ক্যালসিয়াম

ডলোমাইট/ ডলোচুন (Dolomite) – $CaMg(CO_3)_2$

১. সাদা পাউডার
২. অর্দ্রতারোধক
৩. ১ কেজি ডলোমাইট এ ৩০% ক্যালসিয়াম অক্সাইড
৪. ১ কেজি ডলোমাইট এ ২০% ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড

জিংক সালফেট (Zinc Sulphate) – $ZnSO_4$

১. আর্দ্রতগ্রাহক
২. সাদা/ধূসর দানাদার
৩. ১ কেজি জিংক সালফেট এ ৩৬% জিংক (মনোহাইড্রেট)
৪. ১ কেজি জিংক সালফেট এ ২০% জিংক (হেপ্টাহাইড্রেট)

সার প্রয়োগ অনুসূচি

উদ্ভিদের জীবন পরিচালনায় ১৬টি অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি গ্রহণ করে থাকে। মৃত্তিকায় বিদ্যমান এবং চা গাছ কর্তৃক আহরিত এসকল পুষ্টি বিভিন্নভাবে ক্ষয় (loss) হয়ে যায় . যেমন- প্রুনিং, টিপিং, প্লাকিং, বৃষ্টির পানির সাথে গড়িয়ে যাওয়া, মাটির নিচে চুইয়ে যাওয়া, বায়ুমণ্ডলে উড়ে যাওয়া ইত্যাদি। এভাবে ক্ষয়ে যাওয়া পুষ্টি পুনরায় সার হিসেবে মাটিতে প্রয়োগ করে ক্ষয় হয়ে যাওয়া পুষ্টি পুনঃভরন করতে হয়। নার্সারিতে চারা উৎপাদনের সময়ও নার্সারিতে বেড তৈরির সময় হতে শুরু করে

সেকশনে চা গাছ যতদিন পর্যন্ত উৎপাদনক্ষম থাকবে ততদিন পর্যন্ত সার প্রয়োগ করতে হয়। এছাড়া ছায়াতরু রোপণের সময়ও সার প্রয়োগ করতে হয়। প্রথম ৫ বছর বয়স পর্যন্ত চা গাছকে অপ্রাপ্তবয়স্ক চা গাছ (young tea) বলা হয়। পাঁচ বছর পেরিয়ে গেলে অর্থাৎ ৬-৪০ বৎসর বয়স পর্যন্ত চা গাছকে প্রাপ্তবয়স্ক চা গাছ (mature tea) বলা হয় এবং ৪০ বছরের উর্ধ্বে বয়স হলে সে সকল চা গাছকে পুরাতন চা গাছ (old tea) গণ্য করা হয়। নিম্নে নার্সারি, চারা রোপণের সময়, মাতৃগাছ, বীজবাড়ি, অপ্রাপ্তবয়স্ক চা গাছে সার প্রয়োগ সুপারিশমালা দেয়া হল –

সার প্রয়োগ সুপারিশমালা – নার্সারিতে সার প্রয়োগ

১. প্রাথমিক বেডে প্রতি বর্গ মিটারে ১৫০ গ্রাম টিএসপি ও ১৫০ গ্রাম ডলোমাইট।

২. সেকেন্ডারি বেডে পলিথিন ব্যাগ ভর্তির জন্য ব্যবহৃত মাটিতে প্রতি ঘন মিটারে ৩০০-৩৫০ গ্রাম টিএসপি ও ১৫০-২০০ গ্রাম ডলোমাইট।

৩. গোবর-পানির মিশ্রণঃ গোবর-পানির অনুপাত ১ঃ৪ ভাল করে পাত্রে মিশিয়ে ২-৩ সপ্তাহ রেখে পচাতে হবে (স্টক সলিউসন) মোটা ছিদ্রযুক্ত ছাকনি বা চটের ঘানি ব্যাগ দিয়ে ছাকতে হবে। স্টক সলিউশন পুনরায় পানির সাথে ১ঃ ৪ অনুপাতে মিশ্রণ তৈরি করে ১৫ দিন অন্তর ২ বার প্রয়োগ করা গেলে চারার বৃদ্ধি ভাল হবে।

৪. ৫০ গ্রাম ইউরিয়া ও ৫০ গ্রাম এমওপি ১৫ লিটার পানিতে মিশ্রণ তৈরি করে ১০০০ চারায় ঝাজরির সাহায্যে ১৫ দিন অন্তর ২ বার প্রয়োগ করলে চারার বৃদ্ধি ভাল হয়

৫. ছায়া সরানোর পর রোপণের জন্য প্রস্তুত চারায় ১–২% ইউরিয়া ও এমওপি সার প্রয়োগ করা হলে পাতার হলুদ রং থাকে না

সার প্রয়োগ পদ্ধতি – চারা রোপণের সময়

১. প্রতি চারার গর্তে ৩০ গ্রাম টিএসপি

২. ২ কেজি গোবর/কম্পোস্ট সার গর্তের উপরিভাগের মাটির সাথে ভালভাবে মিশাতে হবে। তারপর গোবর ও সার মিশ্রিত মাটি গর্তে চারা বসানোর পর চারার চর্তুদিকে দিয়ে রেমিং (হাল্কা দুরমুস) করতে হবে

নিউক্লিয়াস ক্লোন প্লটে সার প্রয়োগ

১. প্রতি হেক্টরে ইউরিয়া ২২৫ কেজি, টিএসপি ১০০ কেজি এবং এমওপি ২০০ কেজি বৎসরে দুবার প্রয়োগ করতে হবে। তবে প্রথম দফায় সম্পূর্ণ টিএসপি সার দিয়ে দিতে হবে।

ছায়াতরু রোপণের সময় সার প্রয়োগ

১. প্রতি গর্তে গোবর ১০-১৫ কেজি

২. খৈল ১-১.৫০ কেজি

৩. টিএসপি ২০০ গ্রাম

ডলোমাইট ১ কেজি ভাল করে মাটির সাথে মিশিয়ে রোপণের সময় পিণ্ডির চারদিকে দিতে হবে।

বীজবাড়িতে সার প্রয়োগ

চারার বয়স	গোবর (কেজি)	খৈল (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমওপি (গ্রাম)
১	৫	০.৫	৫০	৫০	৫০
২	৫	০.৫	১০০	১০০	১০০
৩	১০	১.০	২০০	২০০	২০০
৪	১০	১.০	২০০	২০০	২০০
৫	১০	১.০	৩০০	৩০০	৩০০

প্রয়োগকাল

প্রথম দফা মার্চ/এপ্রিল, যখন মাটির সাথে মিশে যাওয়া বা শোষণের জন্য পর্যাপ্ত আর্দ্রতা থাকে। দ্বিতীয় দফা জুলাই/আগস্ট মাসে প্রয়োগ করতে হবে।

অপ্রাপ্তবয়স্ক চা গাছে সার প্রয়োগ সুপারিশমালা

চারার বয়স	সার মিশ্রণের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)				প্রতি গাছে প্রয়োগমাত্রা (গ্রাম)	গোবর বা কম্পোস্ট টন/হেক্টর
	ইউরিয়া	টিএসপি	এমওপি	মোট		
১ম বছর	১৭৬	৯০	১৬০	৪২৬	৪০	১০
২য় বছর	২০০	১০০	১৮০	৪৮০	৪৫	১০
৩য় বছর	২৬৫	৯০	১৬০	৫১৫	৪৭	৫
৪র্থ বছর	৩০০	১০০	১৮০	৫৮০	৫৩	৫
৫ম বছর	৩৩০	১১০	২০০	৬৮০	৬০	৫

চা চারা রোপণের ৬-১২ মাস পর সার প্রয়োগ করতে হয়। কয়েকবারে যদি ২০-২৫ সে.মি. বা ৮-১০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয় এবং মাটিতে পর্যাপ্ত আর্দ্রতা থাকে তখন সার দিতে হবে। উক্ত অনুপাতে সার মিশিয়ে ৩ দফায় (এক তৃতীয়াংশ করে) এপ্রিল/মে মাসে প্রথম, জুলাই/আগস্ট মাসে দ্বিতীয় ও সেপ্টেম্বর/অক্টোবর মাসে তৃতীয় দফা প্রয়োগ করতে হবে।

প্রাপ্তবয়স্ক চা গাছে সার প্রয়োগ সুপারিশমালা

প্রথম দফা (First split)

প্রাপ্তবয়স্ক চা গাছে হেক্টর প্রতি তৈরি চা উৎপাদনের উপর ভিত্তি করে অনুসূচি করা হয়েছে। প্রতি হেক্টরে ১০০০ কেজি তৈরি চা'কে ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়েছে। হেক্টরে ১০০০ কেজি তৈরি চা উৎপাদিত হলে ৫০ কেজি নাইট্রোজেন, ২০ কেজি ফসফেট এবং ৩০ কেজি পটাশ প্রয়োগ করতে হবে। ১০০০ কেজির উর্ধ্বে ২০০০ কেজি পর্যন্ত প্রতি ১০০ কেজি অতিরিক্ত উৎপাদনের জন্য ৫ কেজি নাইট্রোজেন (প্রায় ১১ কেজি ইউরিয়ার সমান), ১ কেজি ফসফেট (প্রায় ২ কেজি টিএসপির সমান) এবং ৩ কেজি পটাশ (প্রায় ৬ কেজি এমওপির সমান) প্রয়োগ করতে হবে। পটাশ সারের পরিমাণ ২৫০০ কেজি/হে. উৎপাদন পর্যন্ত একই হারে বাড়বে কিন্তু উৎপাদন ২৫০০ কেজি/হে. এর উপরে হলে সারের পরিমাণ আর বাড়বে না। ইউরিয়া সার প্রয়োগের ক্ষেত্রে উৎপাদন ২০০০ কেজি/হে. এর উপরে হলে ৩০০০ কেজি/হে. পর্যন্ত প্রতি ১০০ কেজি অতিরিক্ত উৎপাদনের জন্য ৬ কেজি নাইট্রোজেন (প্রায় ১৩ কেজি ইউরিয়া সমান) প্রয়োগ করতে হবে।

প্রথম দফা (প্রতি হেক্টরে ১০০০ কেজি তৈরি চা উৎপাদন হলে)

প্রয়োগ কাল – মার্চ/এপ্রিল মাসে যখন মাটিতে পর্যাপ্ত আর্দ্রতা সঞ্চয় হবে, কয়েক দফায় ২০-২৫ সে.মি বৃষ্টিপাত হলে সার দেয়ার উপযুক্ত সময় হয়

সারের নাম	পরিমাণ (কেজি)
ইউরিয়া	১১০
টিএসপি	৪৫
এমওপি	৬০

দ্বিতীয় দফা (Second split)

হেক্টর প্রতি যে কোন পরিমাণ উৎপাদনই হোক না কেন অর্থাৎ এক হাজার কেজি বা এক হাজার কেজির উপরে যে কোন পরিমাণ উৎপাদনের জন্য প্রতি হেক্টরে ৬০ কেজি নাইট্রোজেন (১৩২ কেজি ইউরিয়া) এবং ৩০ কেজি পটাশ (৬০ কেজি এমওপি) সার প্রয়োগ করতে হবে। দ্বিতীয় দফায় টিএসপি সার প্রয়োগ করতে হয়না।

সারের নাম	পরিমাণ (কেজি)
ইউরিয়া	১৩২
এমওপি	৬০

প্রয়োগের সময় – জুলাই মাসের শেষের দিকে বা আগস্ট মাসের প্রথম দিকে সার প্রয়োগ করতে হবে।

ফলিয়ার সিঞ্চন (Foliar Spray)

মাটিতে সার প্রয়োগের পাশাপাশি অধিক উৎপাদনের লক্ষ্যে পাতায় স্প্রে করে সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। গৌণ উপাদানের বেলায় মাটিতে প্রয়োগ না করে পাতায় স্প্রে করাই উত্তম। নিম্নে কয়েকটি সারের ফলিয়ার স্প্রে করার পরিমাণ এবং দফা উল্লেখ করা হল।

ইউরিয়া– ৪ কেজি ইউরিয়া ২০০ লিটার পানিতে গুলিয়ে এক হেক্টর জমিতে বৎসরে ২-৩ বার সেপ্টেম্বর-অক্টোবর বা অক্টোবর-নভেম্বর মাসে দেয়া যেতে পারে। অবস্থা বিবেচনা করে ২ কেজি ইউরিয়া ২০০ লিটার পানিতে মিশ্রিত করেও সিঞ্চন করা যেতে পারে।

ইউরিয়া+এমওপি–প্রতিটি সার ২ কেজি করে মোট ৪ কেজি ২০০ লিটার পানিতে মিশ্রণ তৈরি করে এক মাস অন্তর ২/৩ বার সিঞ্চন করা যেতে পারে।

জিংক সালফেট– ১-২ কেজি সার ২০০ লিটার পানিতে মিশ্রণ তৈরি করে এক মাস অন্তর বৎসরে ২ বার প্রয়োগ করা যেতে পারে।

জিংক সালফেট + এমওপি– এক কেজি করে ২ কেজি ২০০ লিটার পানিতে মিশ্রণ তৈরি করে এক মাস অন্তর বৎসরে ২ বার প্রয়োগ করা যেতে পারে।

ডিএপি – ৪ কেজি ২০০ লিটার পানিতে মিশ্রণ তৈরি করে এক মাস অন্তর বৎসরে ২/৩ বার প্রয়োগ করা যতে পারে।

ম্যাগনেসিয়াম সালফেট– ২ কেজি ২০০ লিটার পানিতে মিশ্রণ তৈরি করে এক মাস অন্তর বৎসরে ২/৩ বার প্রয়োগ করা যেতে পারে।

ম্যাঙ্গানিজ – ২ কেজি ২০০ লিটার পানিতে মিশ্রণ তৈরি করে এক মাস অন্তর বৎসরে ২/৩ বার প্রয়োগ করা যতে পারে।

বোরন – ২ কেজি ২০০ লিটার পানিতে মিশ্রণ তৈরি করে এক মাস অন্তর বৎসরে ২/৩ বার প্রয়োগ করা যতে পারে।

ফলিয়ার সিঞ্চন (Foliar Spray) করার সময়কাল ও প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন

১. খুব সকাল অথবা বিকালে স্প্রে করতে হবে।
২. সকাল বা বিকাল ব্যাতীত রোদবিহীন দিনে বা মেঘলা দিনে স্প্রে করতে হবে।
৩. স্প্রিংকেলার জল সেচের কয়েক ঘণ্টা পূর্বে বা কয়েক ঘণ্টা পরে প্রয়োগ করতে হবে।

BANSDOC Library
Accession 15804

৪. গাছে সবুজ পাতা চয়নের মৌসুমে প্রয়োগ করতে হবে।
৫. পাতা চয়নের ১-২ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।
৬. ভেজালমুক্ত সার প্রয়োগ করতে হবে
৭. পরিষ্কার পানিতে মিশ্রণ তৈরি করতে হবে।
৮. সঠিক পরিমাণ সার ও মিশ্রণ তৈরি করতে হবে
৯. আগাছানাশক প্রয়োগ করা হয় এমন সিঞ্চনযন্ত্র ব্যবহার করা যাবে না।
১০. সার ভাল করে পানিতে মিশিয়ে মিশ্রণ তৈরি করতে হবে

সারের কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য করণীয়

যেহেতু সার প্রয়োগে মোট চা পাতা উৎপাদন খরচের ১৫-২০% খরচ হয়, সেহেতু সার প্রয়োগ করা হলে যেন অপচয় না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। ফসলে যে সার প্রয়োগ করা হয় তার মাত্র ৩০-৩৫% সার কার্যকরী হয়। সকল বৈশিষ্ট্য যথাযথ থাকলেও সারের কিছুটা অপচয় হবেই।

১. উৎপাদনের উপর ভিত্তি করে সঠিক পরিমাণ সার মিশ্রণ করতে হবে।
২. সঠিক সার প্রয়োগ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে
৩. সার প্রয়োগের সময় জমিতে পর্যাপ্ত আর্দ্রতা থাকতে হবে যাতে করে সার দেয়ার পরই মাটিতে শোষণ শুরু হয়।
৪. বয়স বা উৎপাদনের ওপর ভিত্তি তৈরি মিশ্রণ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাগানে প্রয়োগ করতে হবে।
৫. সার প্রয়োগের পূর্বে বাগান আগাছামুক্ত করতে হবে।
৬. মাটির ক্ষয়রোধ করতে হবে।
৭. সার প্রয়োগের পূর্বে চুন প্রয়োগ করে অম্লত্ব সংশোধন করে নিতে হবে।
৮. সঠিকভাবে ড্রেন করতে হবে যাতে জলাবদ্ধতা না হয়।
৯. সুষম সার প্রয়োগ করতে হবে।
১০. সঠিক সময়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে।
১১. দফাভিত্তিক সার দিতে হবে।
১২. সার প্রয়োগের পূর্বে রোগবালাই দমন করে নিতে হবে।
১৩. পাতায় যাতে সার না পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
১৪. গাছের গোড়ায় মুষ্টি করে সার দেয়া যাবে না।
১৫. দুই সারি পর পর সমভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে।
১৬. খেয়াল রাখতে হবে খালি জায়গায় বা ড্রেনে যাতে সার না পড়ে।
১৭. ভেজালমুক্ত সার ব্যবহার করতে হবে
১৮. জলাবদ্ধতা আছে এমন এলাকায় সার দেয়া যাবে না।
১৯. সেকশনে অতিরিক্ত আর্দ্রতা থাকলেও সার দেয়া যাবে না

জৈব পদার্থের (Organic matter) কাজ

১. রাসায়নিক সারের কার্যকারিতা বৃদ্ধি ও মাটির গুণাগুণ অক্ষুণ্ন রাখার জন্য মাটিতে জৈব পদার্থ মিশ্রিত করতে হবে।

২. বৃষ্টির ফোঁটা বড় হলেও জৈব পদার্থ ফোঁটার শক্তি কমিয়ে দেয়, ফলে মাটির ক্ষয় কম হয়

৩. জৈব পদার্থ পানিকে ছেঁকে মাটির ভিতরে পরিষ্কার পানি প্রবেশ করতে সহায়তা করে

৪. বৃষ্টির পানির দ্বারা মাটির ক্ষয় কমে যায়

৫. বাতাসের সাহায্যে ক্ষয় কমে যায়।

৬. মাটিতে এক প্রকার অম্ল জাতীয় পদার্থ নির্গত করে মাটির গঠন উন্নত করে।

৭. গাছের শেকড় মাটির গভীরে প্রবেশ করে পুষ্টি ও পানি সংগ্রহ করতে পারে।

৮. মাটিতে বসবাসকারী উপকারী অণুজীবকে খাদ্য সরবরাহ করে।

৯. শীতকালে অতিরিক্ত ঠান্ডা এবং গ্রীষ্মকালে অতিরিক্ত উষ্ণতারোধ করে মাটির তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।

১০. মাটি হতে আর্দ্রতা শুকিয়ে যেতে বাঁধা দেয় ফলে গাছ খরার কবল হতে রক্ষা পায়।

১১. জৈব পদার্থ পচে গাছের সহজলভ্য খাদ্য সরবরাহ করে।

১২. ক্ষতিকর রাসায়নিক বিক্রিয়া ও বিষাক্ততা (বিষক্রিয়া) হতে উদ্ভিদকে রক্ষা করে।

১৩. জৈব এসিড সরবরাহ করে ফলে খনিজ পদার্থ ভেঙে উদ্ভিদের পুষ্টি বেড়িয়ে আসে।

১৪. গাছের খাদ্যভাণ্ডার হিসাবে কাজ করে।

১৫. ফসফরাসসহ সকল পুষ্টিকে প্রাপ্তিযোগ্য করে।

জৈব পদার্থ পাওয়ার উপায়

১. প্রুনিং লিটার, খড়কুটা, কম্পোস্ট।

২. মাল্চ বাড়ি প্রতিষ্ঠা।

৩. গোবর।

৪. কচুরিপানা

৫. খৈল, হাড়ের গুঁড়া ইত্যাদিসহ যে কোন প্রকার উদ্ভিদ বা প্রাণীদেহের অবশিষ্টাংশ।

৬. ছায়াতরু হতে পতিত পত্রপল্লব।

জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি

যদি বৎসরে প্রতি একরে ১,০০০ কেজি (এক টন) করে ১০ বৎসরে ১০,০০০ কেজি (১০ টন) শুকনো জৈব পদার্থ মিশ্রিত করা হয় এবং এ জৈব পদার্থ কোন প্রকারে ক্ষয় না হয় তবে মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ ১% বাড়ে। ঠিক এমনিভাবে যদি প্রতি বৎসর প্রতি হেক্টরে ২,৫০০ কেজি (২.৫ টন) করে ১০ বৎসরে ২৫,০০০ কেজি বা (২৫ টন) জৈব পদার্থ মিশ্রিত করা হয় এবং কোন প্রকার ক্ষয় না হয় তবে ১০ বৎসর পরে প্রতি হেক্টরে জৈব পদার্থের পরিমাণ ১% বৃদ্ধি পায়

জৈব ও অজৈব সারের পার্থক্য

জৈব সার	অজৈব সার
১. খাদ্যোপাদানের পরিমাণ খুব অল্প থাকে বিধায় পরিমাণে অনেক বেশি প্রয়োগ করতে হয়।	১. খাদ্যোপাদানের পরিমাণ বেশি থাকে বিধায় অল্প পরিমাণে প্রয়োগ করতে হয়।
২. জৈব পদার্থে কম বেশি সব ধরণের খাদ্যোপাদান বিদ্যমান আছে।	২. নির্দিষ্ট কয়েক প্রকার খাদ্যোপাদান থাকে
৩. প্রয়োগের কয়েকদিন পর গাছ গ্রহণ করতে পারে।	৩. প্রয়োগের কয়েক ঘন্টা পরই গাছ গ্রহণ করতে পারে
৪. রেসিডিউয়াল ইফেক্ট দীর্ঘদিন বজায় থাকে।	৪. রেসিডিউয়াল ইফেক্ট অল্পদিন বজায় থাকে।
৫. বেশি পরিমাণে প্রয়োগ করা হলেও কোন ক্ষতিকর দিক নেই।	৫. অতিরিক্ত প্রয়োগ করা হলে মাটি ও ফসলের ক্ষতি হয়।
৬. মৃত্তিকার ভৌত ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যের উন্নয়ন করে ।	৬. মৃত্তিকার ভৌত উন্নয়ন করে না।
৭. অণুজীবের সংখ্যা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে।	৭. অণুজীবের সংখ্যা ও কর্মকারিতা বৃদ্ধি করে না।
৮. হরমোনের উপস্থিতির কারণে শেকড় ও কাণ্ডের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে।	৮. অজৈব সারে হরমোন নেই।

বিভিন্ন প্রকার জৈব পদার্থে / জৈব সারে বিদ্যমান পুষ্টি উপাদান

জৈব পদার্থ/জৈব সার	নাইট্রোজেন(%)	ফসফেট(%)	পটাশ(%)
গোবর	০.৩-০.৫	০.০৩	০.০৪
ক্যাটেল ম্যানিউর	০.৯	০.৯	০.৩
এফ ওয়াই এম	০.৫	০.৪	০.৮
কম্পোস্ট (গ্রাম্য)	০.৪-০.৮	০.৩-০.৬	০.৭-১.০
কম্পোস্ট (শহুরে)	১-২	১.০	১.৫
কচুরিপানা	২-৩	১-২	৩-৪
সরিষার খৈল	৫.১-৫.২	১.৮-১.৯	১.১-১.৩
তিলের খৈল	৬.২-৬.৩	২.০-২.১	১.২-১.৩
তিসির খৈল	৫.৫-৫.৬	১.১-১.৫	১.২-১.৩

ফিস মিল	৪.০০-১০.০০	৩-৯	০.৩-১.৯
শুকনো রক্ত	১০-১২	১-১.৫	০.৪-০.৬
গোয়ানো	৭-৮	১১-১৪	২-৩
নাইট সয়েল	১.২-১.৩	০.৮-১.০০	০.৪-০.৫
চা বর্জ্য	৩.৬	০.৬	২.৩
উড এ্যাস	০.১	০.৩	১.০
প্রনিং লিটার	২.৫	০.৫	১.৫
ছায়াতরু পাতা	২.৫	০.৭	০.৯
ধানের খড়	০.৫	০.০৭	০.৬
গুয়াতেমালা ঘাস	১.৬	০.৬	১.৭
নেপিয়র ঘাস	০.৮	০.৪	১.৩
লজ্জাবতী	২.৬	০.৬	১.০

মৃত্তিকায় অম্লত্ব উদ্ভবের কারণ

১. বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে যখন ক্লে খনিজ ক্ষয় হয় তখন খনিজ হতে হাইড্রোজেন আয়ন বেরিয়ে এলে মৃত্তিকায় এসিডিটির উদ্ভব হয়।

২. জৈব পদার্থ পচার পর বিভিন্ন প্রকার জৈব এসিড উৎপন্ন হয় এ জৈব এসিড মাটিতে অম্লত্ব সৃষ্টি করে।

৩. যে কোন প্রকার নাইট্রোজেনজনিত সার প্রয়োগের ফলে মাটিতে অম্লত্ব সৃষ্টি হয়।

৪. ডিএপি সার প্রয়োগ করা হলে মাটিতে অম্লত্ব সৃষ্টি হয়।

৫. এমওপি সার প্রয়োগ করা হলে অম্লত্বের সৃষ্টি হয়

৬. উদ্ভিদ মাটি হতে অন্যান্য উপাদান গ্রহণ করলে মাটিতে অম্লত্বের সৃষ্টি হয়।

৭. হাইড্রোজেন আয়ন ছাড়াও অতিরিক্ত আয়রন ও অ্যালুমিনিয়ামের উপস্থিতি মাটিকে অম্লীয় করে দেয়।

৮. ভূমি হতে উদ্ভূত সালফার ডাইঅক্সাইড ও নাইট্রোজেন অক্সাইড গ্যাস বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের সাথে মিশে পুনরায় যখন এসিড বৃষ্টিরূপে ভূ-পৃষ্ঠে ফিরে আসে তখন মৃত্তিকায় অম্লত্বের সৃষ্টি করে।

চুন প্রয়োগ

মাটির পিএইচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উদ্ভিদের পুষ্টির প্রাপ্যতা মাটির পিএইচ মানের উপর নির্ভর করে। পিএইচ মান বেশি হলে অর্থাৎ অম্লত্ব কম হলে সকল মুখ্য উপাদান এবং একটি মাত্র গৌণ উপাদান মলিবডেনামের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। আবার পিএইচ মান কম হলে অর্থাৎ অম্লত্ব বৃদ্ধি পেলে সকল মুখ্য উপাদান ও মলিবডেনামের প্রাপ্যতা কমে যায় এবং অন্য সকল গৌণ উপাদানের প্রাপ্যতা

বৃদ্ধি পায়। অম্লত্ব যত বাড়ে মৃত্তিকায় ফসফরাসের প্রাপ্যতা তত কমে কারণ ফসফরাস অ্যালুমিনিয়াম ও আয়রনের সাথে বিক্রিয়া করে অপ্রাপ্য আয়রন ফসফেট ও অ্যালুমিনিয়াম ফসফেটে রূপান্তরিত হয়। ক্ষারীয় মাটিতেও একইভাবে বিক্রিয়া ঘটে। মাটির ক্ষারত্ব যত বাড়ে ফসফরাসের প্রাপ্যতা তত কমে। আয়রন ফসফেট ও অ্যালুমিনিয়াম ফসফেটে কেবলমাত্র অপ্রাপ্য হিসাবেই মৃত্তিকায় থাকে না এদুটি যৌগ উদ্ভিদের জন্য বিষাক্ত পদার্থ হিসাবেও কাজ করে।

বাংলাদেশের চা মৃত্তিকার অম্লত্বের বিভাজন

বিক্রিয়া	পিএইচমান
অত্যন্ত তীব্র অম্ল	৪.০ এর নিচে
তীব্র অম্ল	৪ - ৪.৪
মধ্যম অম্ল	৪.৫ - ৫.৫
অল্প অম্ল	৫.৬ - ৬.৭
নিউট্রাল	৭.০

বাংলাদেশ চা মৃত্তিকার অম্লত্বের মাত্রা/পরিমাণ

বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউটে বছরে গড়ে বিভিন্ন বাগানের প্রায় তিন হাজার চা মৃত্তিকা বিশ্লেষণ করে থাকে। বৃহত্তর সিলেট জেলার চা মৃত্তিকা বিশ্লেষণে দেখা গেছে ১৮% মৃত্তিকার পিএইচ মান ৪ এর নীচে অর্থাৎ অত্যন্ত তীব্র অম্লীয়, ৫০% মৃত্তিকার পিএইচ মান ৪.০-৪.৪ এর মধ্যে অর্থাৎ তীব্র অম্লীয়, ২৭% মাটির পিএইচ মান ৪.৫-৫.০ এর মধ্যে অর্থাৎ মধ্যম মানের অম্লীয় এবং মাত্র ৫% মাটির পিএইচ মান ৫.০ উপরে। এতে বুঝা যায় মাত্র ৩২% মাটির পিএইচ মান সন্তোষজনক মাত্রার মধ্যে আছে।

বৃহত্তর চট্টগ্রামের বেশির ভাগ বাগানের মৃত্তিকার পিএইচ মাত্রা ৪.৫-৫.৫ এর মধ্যে বিদ্যমান। অর্থাৎ সন্তোষজনক মাত্রার মধ্যে আছে পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও ও লালমনিরহাট জেলার চা মৃত্তিকার পিএইচ মাত্রা ৪.৫-৫.৫ এর মধ্যে বিরাজমান। বৃহত্তর সিলেটের চা বাগানের মাটির অম্লত্বের তীব্রতা সবচেয়ে প্রকট। সকল চা বাগানে ডলোমাইট প্রয়োগের মাধ্যমে মৃত্তিকার অম্লত্ব সংশোধনের চেষ্টা করা হয়। ডলোমাইট প্রয়োগের মাধ্যমে মাটির অম্লত্ব ৫.০ বা ৫.৫ এর মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। পিএইচ মান ৫.০ এর নিচে নেমে আসলেই ডলোমাইট প্রয়োগ করতে হবে এবং ৫.০ বা ৫.৫ এর উপরে হলে ডলোমাইট প্রয়োগের প্রয়োজন নেই।

চুন সাধারণত চার প্রকার যথা - ক্যালসিয়াম অক্সাইড, ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড, ক্যালসিয়াম কার্বোনেট এবং ডলোমাইট। এ ৪ প্রকার চুনের মধ্যে ডলোমাইটে

ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম আছে। অন্য ৩টিতে একটি খাদ্যোপাদান কেবলমাত্র ক্যালসিয়াম আছে। তাই বর্তমানে চা বাগানে অম্লত্ব সংশোধনের জন্য ডলোমাইট প্রয়োগ করা হয়

মৃত্তিকায় উচ্চ অম্লত্বের প্রভাব

মৃত্তিকার ভৌত বৈশিষ্ট্যকে ক্ষতি করে যেমন, বুনট ও গঠনকে ভেঙে দেয় বিধায় কাদামাটির উৎপত্তি হয়। কাদামাটির উৎপত্তির ফলে উদ্ভিদের শেকড় বৃদ্ধি ব্যহত হয় এবং জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। ফলে উদ্ভিদ প্রয়োজনীয় খাদ্যোপাদান গ্রহণ করতে পারে না।

১. মৃত্তিকার খনিজ পদার্থ ভেঙে ছোট ছোট কণাতে পরিণত হয়।
২. শুকিয়ে গেলে মৃত্তিকা শক্ত হয়।
৩. মৃত্তিকা অভ্যন্তরে বাতাস কমে যায় বিধায় পানি নিষ্কাশন সমস্যা দেখা দেয়।
৪. মৃত্তিকার ক্ষয় বৃদ্ধি পায়।
৫. পানি ধারণ ক্ষমতা কমে গিয়ে গাছ দ্রুত খরা আক্রান্ত হয়।
৬. গাছের পুষ্টি প্রাপ্যতা কমে যায়।
৭. আয়রন ও অ্যালুমিনিয়ামের বিষাক্ততা বেড়ে যায়.
৮. উপকারী অণুজীবের কার্যকারিতা হ্রাস পায়।

চুন প্রয়োগের উপকারিতা

১. অম্লীয় মাটিতে চুন প্রয়োগ করা হলে মৃত্তিকার পিএইচ মান বাড়ে ও এসিডিটি কমে যায়।
২. সঠিকভাবে চুন প্রয়োগ করা হলে মৃত্তিকার উন্নয়নসহ চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধি করে।
৩. সাধারণ চুন প্রয়োগ করা হলে খাদ্যোপাদান ক্যালসিয়াম দেয়া হয় এবং ডলোমাইট প্রয়োগ করা হলে ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম দুটি উপাদান একসাথে দেয়া হয়।
৪. অম্লত্ব হ্রাসের ফলে উপকারী অণুজীবের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়।
৫. অ্যালুমিনিয়াম, আয়রন এবং ম্যাঙ্গানিজের দ্রবণীয়তা কমিয়ে উদ্ভিদকে ক্ষতিকর প্রভাব হতে রক্ষা করে.
৬. ফসফরাস এবং মলিবডেনামের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করে।
৭. জৈব পদার্থের পচনক্রিয়া ত্বরান্বিত করে।
৮. মৃত্তিকার ভৌত অবস্থা ও গঠনের উন্নতি করে, সহজে পানি মৃত্তিকার গভীরে যেতে সাহায্য করে এবং মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে.
৯. চুন এক প্রকার আঠা জাতীয় পদার্থ তাই মাটির ছোট কণাগুলোকে একসাথে বন্ধন তৈরি করে মাটিকে ঝুরঝুরে করে শেকড় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

১০. মৃত্তিকায় পটাসিয়ামের পরিমাণ বেশি থাকলে গাছকে অতিরিক্ত পটাসিয়াম গ্রহণে বাধা দান করে এবং কার্যকরী ভূমিকা নিতে সহায়তা করে।

১১. সকল খাদ্যোপাদান গ্রহণ বৃদ্ধি করে।

১২. চুন প্রয়োগ করা হলে চা গাছের অনেক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

চুন প্রয়োগের সময়কাল

যে মৃত্তিকার মাটি পরীক্ষা করে প্রতি ৩/৪ বৎসর অন্তর অন্তর একবার চুন প্রয়োগ করা হয়। যে বৎসর এলপি বা মিডিয়াম প্রুনিং করা হয় সে বৎসর চুন দেয়া যেতে পারে। প্রতি বছরও প্রয়োগ করা যেতে পারে। এছাড়া নূতন বর্ধিত আবাদি এলাকায় বা মৃত্তিকা পুনর্বাসন এলাকায় জমি প্রস্তুতের পূর্বে পরিমিত চুন প্রয়োগ করে ভাল করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। আবাদি এলাকায় পাতা চয়নের সময় রাসায়নিক সার দেয়ার পূর্বে চুন প্রয়োগ করতে হবে যাতে করে চুন মৃত্তিকার অম্লত্ব কমিয়ে আনতে পারে। চুন রাসায়নিক সার প্রয়োগের ৪-৬ সপ্তাহ পূর্বে প্রয়োগ করতে হয়। তবে রাসায়নিক সারের মত চুন প্রয়োগের সময়ও মাটিতে পর্যাপ্ত আর্দ্রতা থাকতে হবে। তা না হলে চুন মাটির সাথে বিক্রিয়া করবে না। চুন বছরের প্রথম ভাগে মার্চ/এপ্রিল মাসে ৩-৪ বারে ৮-১০ ইঞ্চি বৃষ্টি হওয়ার পর দিতে হয় অথবা বৎসরের শেষ ভাগে সেপ্টেম্বর/অক্টোবর মাসে দেয়া যেতে পারে। ১৫০০ কেজি বা তার চেয়ে অধিক পরিমাণ প্রয়োগ করা হলে বৎসরে দুবার প্রয়োগ করা ভাল। শুকনো মাটিতে নভেম্বর/ডিসেম্বর মাসে চুন প্রয়োগ করা হলে মৃত্তিকা অধিকতর উত্তপ্ত হয়ে যায় বিধায় শুকনো মৌসুমে চুন প্রয়োগ না করাই উত্তম। মৃত্তিকা পুনর্বাসনের সময় প্রথম বছর চুন প্রয়োগের পর ২য় বছর পুনরায় মাটি পরীক্ষা করে প্রয়োজন হলে ২য় বার প্রয়োগ করা যেতে পারে। চুন পানিতে গলে রাসায়নিক সারের মতো এক স্থান হতে অন্য স্থানে যায় না বলে ছিটানোর সময় খুব ভালভাবে ছিটাতে হবে যাতে করে মাটিতে সমভাবে পড়ে। প্রয়োগের সময় প্রতি এক সারি অন্তর অন্তর যেদিন হালকা বাতাস প্রবাহিত হয় এমন দিনে প্রয়োগ করতে হবে। গবেষণাগারে মাটি পরীক্ষা করে প্রয়োজন অনুযায়ী চুন দিতে হবে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রয়োগ করা চা গাছের জন্য ক্ষতিকর। চা বাগানে প্রতি বছর যে সার প্রয়োগ করা হয় তা উৎপাদন খরচের প্রায় ১৫-২০%। তাই সার প্রয়োগের সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে প্রয়োগকৃত সার হতে সর্বোচ্চ উপকার পাওয়া যায়।

চা মাটির বৈশিষ্ট্য দিনদিন পরিবর্তন হচ্ছে, যেমন–

১. জৈব পদার্থের পরিমাণ কমছে।

২. এসিডিটি বাড়ছে।

৩. পুষ্টি উপাদান কমছে।

৪. মৃত্তিকার উৎপাদন ক্ষমতা কমছে।

৫. মৃত্তিকার ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে, সার ব্যবহারের পরিমাণ বাড়ছে।

চায়ে Molecular sulphur এর প্রয়োগ

সালফার মাটির একটি পুষ্টি উপাদান বহুকাল আগে খাদ্যশস্যে সালফার ব্যবহার করে দেখা গেল মাটিতে বা গাছের পাতায় সালফার প্রয়োগের ফলে পাতা আক্রমণকারী মাকড় (spider mite) মারা যায়। অপর দিকে কিছু ফলিয়ার রোগের আধিক্য কমে যায়। এ ফলাফল একজন কীটতত্ত্ববিদকে মাকড় নিধনের উপকরণ হিসেবে সালফার ব্যবহারে উৎসাহিত করে। পাশাপাশি উদ্ভিদ রোগতত্ত্ববিদগণ লক্ষ্য করেন যে, রোগের আধিক্য উল্লেখযোগ্যহারে কমে যায়। তাই এটি একটি ছত্রাকনাশক হিসেবে ব্যবহারের পরামর্শ কার্যকর হতে থাকে। তা হলে বলা যায় সালফার যেমন মাটির পুষ্টি উপাদান বাড়ায় এবং মাকড় বিনাশকারী অপরদিকে এটি একটি ছত্রাকনাশকও।

চায়ে সালফারের ব্যবহার প্রধানত মাকড়নাশক হিসেবে। তবে এখানে উল্লেখ করলে অত্যুক্তি হবে না যে, চায়ের সবুজপাতা সংগ্রহকালেও মাটি থেকে যথেষ্ট পরিমাণ সালফার সবুজ পাতা আহরণের মাধ্যমে কমতে থাকে। শ্রীলঙ্কা ও ভারতের গবেষকগণ প্রমাণ করেছেন প্রতি ১০০ কেজি তৈরি চায়ে সালফার শোষিতের পরিমাণ ০.৫১ কেজি তবে ১০০ কেজি তৈরি চায়ের জন্য উত্তোলিত সালফারের বিপরীতে কমপক্ষে ৩-৪ গুণ সালফার পাতায় বা মাটিতে প্রয়োগ প্রয়োজন। কেননা মৌসুমে মাঠ থেকে leaching loss ও sulphide আকারে সালফার উড়ে যায় এ কারণে চায়ের মাটিতে সালফার প্রয়োগ অত্যাবশ্যকীয়।

চায়ের লাল মাকড় দমনে যেকোন সালফার ৮০ ডব্লিউপি হেক্টর প্রতি ২.২৫ কেজি পাতায় সিঞ্চন করলে সালফারের এ ঘাটতি অনেকটা পূরণ হয়ে যাবে

COMPATIBILITY OF DIFFERENT FERTILIZER

Urea + MOP---	⊠	RP – SSP-------	■
Urea + TSP-----	⊠	RP + MOP------	□
Urea + SSP-----	⊠	RP + DAP------	■
Urea + DAP----	⊠	TSP – MOP-----	□
Urea + RP------	⊠	SSP + MOP----	□

ঢাকা

Fertilizer combination	Mixing
Urea + SOA----	☒
DAP + TSP-----	☐
DAP + SSP-----	☐
DAP + MOP----	☐
DAP + RP-------	■
DAP + SOA----	☒
RP − TSP-------	■
MOP+Zn-------	☐
Mg+B---------	☐
Mg+MOP ----	■
Mn+Bo---------	☐
Urea+Zn--------	☐
Lime + TSP-----	■
Lime + SSP ----	■
Lime − DAP----	■
Lime − Urea----	☒
Lime − SOA----	■
Lime − MOP---	■
Lime RP-----	☒
Mg+Zn ---------	☐
Mg+Mn--------	☐
Mg+DAP ------	☐
Mn Zn ---------	☐

☐ Fertilizer which can be mixed

☒ Fertilizer which may only be mixed shortly before use

■ Fertilizer which can not be mixed (for chemical reasons)

B... DC Library
Accession No.........

দশম অধ্যায়

চায়ের ক্ষতিকর পোকামাকড় ও এদের প্রতিকার
(Harmful insects and mites of tea and their control)

পোকামাকড়ের পরিচিতি

চা বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল ও রফতানি পণ্য। চা গাছ একটি বহুবর্ষজীবী চিরসবুজ উদ্ভিদ। চা গাছ বহুবর্ষজীবী ও একল চাষকৃত উদ্ভিদ হওয়ায় পোকা-মাকড়ের স্থায়ী গৌণ আবহাওয়া ও তাদের বৃদ্ধির জন্য খাদ্য সরবরাহের একটি অন্যতম উৎস হিসেবে ভূমিকা পালন করে। চা উৎপাদনের যেসব অন্তরায় রয়েছে তাদের মধ্যে চায়ের ক্ষতিকারক পোকামাকড় ও কৃমিপোকা অন্যতম। বাংলাদেশ চায়ে এখন পর্যন্ত ২৫ প্রজাতির পতঙ্গ, ৪ প্রজাতির মাকড় ও ১০ প্রজাতির কৃমিপোকা সনাক্ত করা হয়েছে। তন্মধ্যে আবাদি এলাকায় চায়ের মশা, উঁইপোকা ও লাল মাকড় এবং নার্সারি ও অপরিণত চা আবাদিতে এফিড, জেসিড, থ্রিপস, ফ্লাসওয়ার্ম ও কৃমিপোকা মুখ্য ক্ষতিকারক কীট হিসাবে পরিচিত। অনিষ্টকারী এসব পোকামাকড় বছরে গড়ে প্রায় ১০-১৫% শস্য ক্ষতি করে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে ১০০% ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এসব পোকামাকড়ের বিস্তার ও আক্রমণের তীব্রতা অনুসারে এদের মুখ্য অথবা গৌণ কীট বলা হয়। তবে আজ চায়ে যে কীট মুখ্য কাল তা আবার গৌণ হতে পারে। অপরদিকে কোন গৌণ কীট মুখ্য কীটেও পরিণত হতে পারে। ক্ষতিকর এসব পোকামাকড়ের সঠিক দমন পদ্ধতি জানতে হলে এসব কীটপতঙ্গের সঙ্গে কিছুটা পরিচয় থাকা প্রয়োজন।

বৃহৎ অর্থে কীট বলতে সাধারণত বিভিন্ন ধরনের পতঙ্গ, মাকড়, ইঁদুর, পাখি, আগাছা রোগবালাই ইত্যাদি অনিষ্টকারী প্রাণী ও উদ্ভিদ বুঝায়। যে কোন ধরণের ফসল বা শস্য আবাদ করা হোক না কেন এসব ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ ফসল বিনষ্ট করে থাকে

পতঙ্গ (Insects): সাধারণত যে কীটে দু'জোড় পাখা, তিন জোড়া পা এবং দেহ, মাথা, বক্ষ ও উদর এ তিন অংশে বিভক্ত তাদের পতঙ্গ বলে।

মাকড় (Mites): সাধারণত যে কীটের জীবনে প্রাথমিক ধাপে তিন জোড়া ও পর্যায় ধাপে চার জোড়া পা, কোন পাখা থাকে না এবং দেহকে নির্দিষ্ট অংশে বিভক্ত করা যায় না তাদেরকে মাকড় বলে।

কৃমিপোকা (Nematodes): মাটিতে বসবাসকারী অতিক্ষুদ্র, অণুবীক্ষণিক সূতা বা সেমাই আকৃতি প্রাণীকে কৃমিপোকা বলে।

Pest : Any organism that causes damage to man's health, his crops, animals or other possessions. অর্থাৎ বলাই হচ্ছে এমন কোন জীব যা মানুষের স্বাস্থ্য, তার শস্য, পশু বা অন্যান্য কোন সম্পদের ক্ষতি করে।

চায়ের আক্রমণকারী কীটপতঙ্গ, পোকামাকড়ের মধ্যে যে সকল পার্থক্য রয়েছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হল –

	কীটপতঙ্গ/পোকা	মাকড়
Phylum (পর্ব)	সন্ধিপদ- Arthropoda (joint leg)	সন্ধিপদ
Class (শ্রেণি)	কীটপতঙ্গ (Insecta)	মাকড় (Arachnida)
Body segment (দেহখণ্ড)	মাথা, বক্ষ ও উদর এ তিনভাগে বিভক্ত (Head, thorax and abdomen)	দেহে নির্দিষ্ট কোন ভাগ নেই
Legs (পা)	৩ জোড় পা	৪ জোড় পা (অপরিণত বয়সে ৩ জোড়া। Eriophyid মাকড়ে ২ জোড়া পা থাকে)
Wings (পাখা)	২ জোড়া পাখা	পাখা কখনোই থাকে না।
Life cycle (জীবনচক্র)	চার স্তর – (Egg, larva, pupa ও adult)	৩ স্তর (Egg, nymph, adult)

চায়ের অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গের আক্রমণস্থল ও প্রকৃতি

কীটপতঙ্গ/পোকা	চা গাছের আক্রান্ত অংশ	লক্ষণ/উপসর্গ/আক্রান্ত স্থান
কীটপতঙ্গ (Insects)	কচি ডগা, পাতা, পরিণত পাতা, ডাল, কাণ্ড, শেকড়।	পতঙ্গের বিভিন্ন প্রজাতি বিভিন্নভাবে কচিপাতা, ডাল, কাণ্ড ও মূলে আক্রমণ করে থাকে।

মাকড় (Mites)	বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কচিপাতা ও পরিণত পাতার উপর ও নীচের অংশ।	পাতার ক্লোরোফিল অংশ শোষনের ফলে তাম্রবর্ণ ধারণ করে। নীচের দিকে মধ্যশিরা এবং বোটা আক্রমণ করে ও রস শোষণ করে। ফলে পাতা শুকিয়ে যায়, হলুদ বর্ণ ধারণ করে ও পাতা সজীবতা হারিয়ে ফেলে।	
কৃমিপোকা (Nematodes)	চারার কচি শেকড়	পাতা বিবর্ণ/হলুদ বর্ণ ধারণ করে, দুর্বল ও রুগ্ন দেখায় এবং বৃদ্ধি ব্যাহত হয় শেকড়ে গিট তৈরি করে	

এসব পোকামাকড়ের উপযুক্ত দমন পদ্ধতি ও কলাকৌশল জানা অত্যাবশ্যক। চা আবাদিতে বিভিন্ন প্রজাতির সাথী/সম্পুরক উদ্ভিদের চাষাবাদও করা হয়ে থাকে। যেমন- ছায়াগাছ, সবুজসার জাতীয় গাছ, মাটি আচ্ছাদন ফসল ও পুনর্বাসন ঘাস ইত্যাদি এসবও কীটপতঙ্গ এবং পোকামাকড়ের স্থায়ী নিবাসে সহায়তা করে। যথাসময়ে কার্যকর প্রতিকারের অভাবে সম্পূর্ণ ফসলও নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

প্রাদুর্ভাবের নিয়ামক-ভৌত ও জৈব পরিবেশ

যে সব ভৌত ও জৈব নিয়ামক কীটপতঙ্গ ও পোকামাকড়ের বংশবিস্তারে ও স্থায়ীভাবে বসবাসে সহায়তা করে তাদের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. আবহাওয়ার উপাদানসমূহ-যেমন তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, জলীয়বাষ্প, মেঘ, সূর্যকিরণ ইত্যাদি।
২. কৃষিতাত্ত্বিক কার্যক্রম-যেমন ছাঁটাই, ছাঁটাইচক্র, পাতাচয়ন, নালা সংস্কার, ইত্যাদি
৩. ঋতুভেদে প্রাদুর্ভাব।
৪. আবাদি এলাকা-যেমন, টিলা, সমতল ও কুঞ্চি।
৫. চায়ের বিভিন্ন জাত।
৬. চায়ের জৈব পরিবেশ।
৭. একাধিক পোকামাকড়ের একই সময়ে একই গাছে আক্রমণ।
৮. ত্রুটিপূর্ণ সিঞ্চন পদ্ধতি
৯. অপরিকল্পিত উপায়ে বনভূমি উজাড়।
১০. কীটপতঙ্গের সনাক্তি সমস্যা।
১১. অযাচিত/উচ্চমাত্রা বা নিম্নমাত্রায় কীটনাশক সিঞ্চন

চা যেহেতু বহুবর্ষজীবী ও একক চাষকৃত উদ্ভিদ তাই চায়ে আজ যে কীটপতঙ্গ গৌণ আপদ বলে পরিচিত, কাল তা মুখ্য আপদ বলে বিবেচিত ও চা শিল্পের জন্য হুমকি হতে পারে। তবে যাই হোক, সমন্বিত পোকা দমন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই টেকসই ও পরিবেশবান্ধব চা আবাদ সম্ভব যা এখন সময়ের দাবি।

কীটদমনের সর্বপ্রথম নীতি হলো-কীট পরিচিতি। চা আবাদিতে যে সব পোকা-মাকড়/বালাই সচরাচর আক্রমণ করে তাদের আকৃতি, প্রকৃতি ও জৈব প্রক্রিয়া ভিন্ন ধরনের। এদের আক্রমণের ফলে চা গাছের শেকড়, কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা পাতা পল্লব এবং বিভিন্ন অংশে ভিন্ন ধরনের লক্ষণ বা উপসর্গ দেখা দেয়। এসব লক্ষণ বা উপসর্গ সনাক্ত করে পোকামাকড়/আপদ-বালাই পরোক্ষভাবে চিনতে পারা যায়

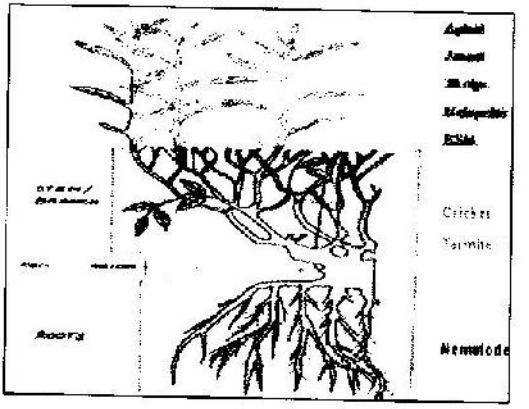

চা গাছে পোকা-মাকড়ের আক্রমণস্থল

কীট আক্রমণের লক্ষণ-নির্ঘণ্ট (Field Key Symptom)

ক্রম নং	আক্রান্ত গাছে আপদলক্ষণ/উপসর্গ	আক্রমণকারী কীট
০১	চা গাছে পরিপক্ক পাতার উপরিভাগ তামাটে রং হয়। পাতার মধ্যশিরায় লাল/বাদামি রং এর ছোট ছোট চিহ্ন দেখা যায়। পাতা বিবর্ণ ও শুষ্ক দেখায়। ক্রমে আক্রান্ত গাছের পাতা ঝরে যায়	লালমাকড়
০২	পাতার নিচের ভাগ বিশেষত মধ্য শিরা বাদামি রং ধার করে। পাতার উজ্জ্বলতা কমে শুষ্ক কর্কের মত বিবর্ণ দেখায়। আক্রান্ত শিরা ফেটে যায় এবং শুকিয়ে যায়। কচি পত্র-বৃন্ত ও ডালের বাকল ফেটে শুকিয়ে যায়।	হলুদ মাকড়
০৩	কচি পাতার উপর ও নিচ অংশ পাটল/লালচে রং হয়ে যায়। পাতার সজীবতা কমে ধোঁয়াটে রং হয়।	পাটল মাকড়

০৪	কচি/পরিণত পাতা বেগুনি রং হয়। পাতার উপরিভাগ চামসিটে হয়ে যায়।	বেগুনী মাকড়
০৫	কচি পাতা হলুদ রং ধারণ করে। পাতার কিনারা রৌদ্র ঝলসানোর মতো দেখায় এবং পাতা কুঁকড়ে নৌকাকৃতি হয়।	জেসিড
০৬	পরিপক্ক পাতার মধ্যশিরার পাশ দিয়ে দুটি নীলাভ সমান্তরাল রেখা দেখা যায়। পাতার উপর সাদা রং এর ছোট ছোট ক্ষতচিহ্ন দেখা যায়।	থ্রিপস
০৭	কচি /পরিণত পাতা কিনারা থেকে এবড়ো থেবড়ো খাওয়ার চিহ্ন দেখা যায়। আক্রান্ত গাছের পাতা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায়।	লুপার ক্যাটারপিলার
০৮	কচি কিশলয় এর পাতা কোকড়ানো ও বিকৃত হয়। কালচে রং এর ছোট পোকা একত্রে গাদি হয়ে থাকে এবং সময়ে সময়ে কাল পিপড়ার আনাগোনা দেখা যায়।	এফিড
০৯	চায়ের ফ্লাশ অর্থাৎ দুটি পাতা ও কুঁড়িতে বাদামি রং এর ছোট ছোট ফোটা বা ক্ষত চিহ্ন দেখা দেয়। কচি পাতা বিবর্ণ হয়। কিশলয় কোকড়ানো এবং ডগা থেকে রস বাহির হয়। ফ্লাশের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়।	হেলোপেল্টিস বা চায়ের মশা
১০	চায়ের ফ্লাশ একত্রে জড়িয়ে চোংগারমতো গুটানো থাকে। বিবর্ণ ও বিকৃত চোংগার মধ্যে লেদা পোকা দেখা যায়।	ফ্লাশওয়ার্ম
১১	পরিণত পাতার কিনারা থেকে গুটানো থাকে। পাতার উপরে কামড়ের বা ফুটা করে খাওয়ার চিহ্ন থাকে	লিফরোলার
১২	চা গাছের কাণ্ড, শাখা-প্রশাখায় মাটির সুড়ঙ্গপথ ভূমি থেকে উপরে উঠতে দেখা যায়। গাছের বাকল ও মজ্জাবধি অন্তঃসারশূন্য দেখা যায়।	উঁইপোকা
১৩	চা নার্সারি বা নতুন আবাদিতে কর্তিত চারা গাছ পড়ে থাকে। কাটা কিশলয়ে দিয়ে ঢাকা মাটির গর্ত দেখা যায়। রাতে ঝি ঝি ডাক শোনা যায়।	উরচুঙ্গা
১৪	চা অঙ্গজ-বিস্তার নার্সারিতে চারা মারা যায়। গাছের বাড়ন কমে যায়। পাতা বিবর্ণ, শুষ্ক ও হলুদ রং ধারণ করে শেকড় জলসিক্ত ও স্ফীত হতে পারে।	নিমাটোড বা কৃমিপোকা

হেলোপেল্টিস, থ্রিপস,

চায়ের ইকোসিস্টেম

চা এর ইকোসিস্টেম হ
জীবিত ও জড়বস্তুর সম
সূর্যালোক, সূর্যালোক ঘন
গতি, তাপমাত্রা ও আর্দ্র

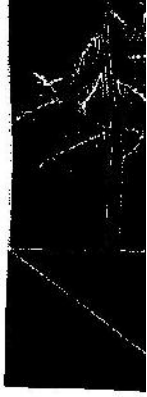

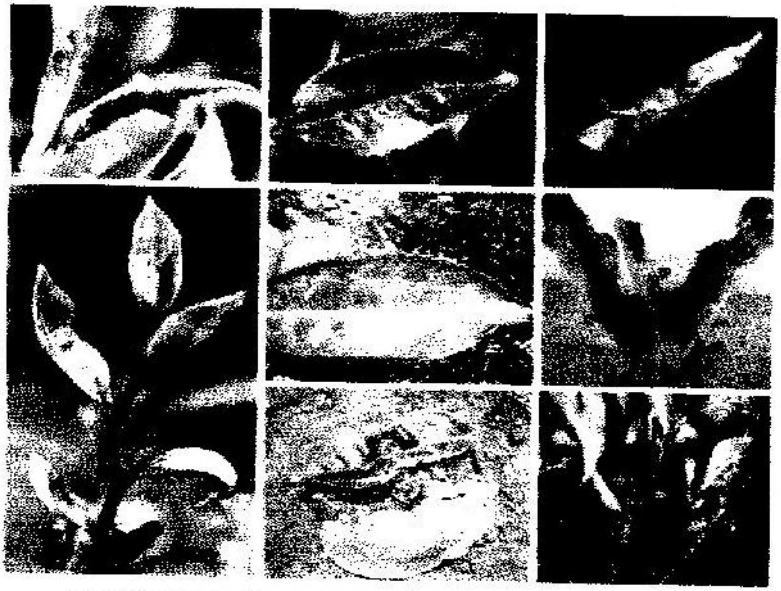

হেলোপেল্টিস, থ্রিপস, জেসিড, স্কেল, ফ্লাস ওয়ার্ম, লাল-মাকড় ও উঁইপোকা আক্রান্ত পাতা

চায়ের ইকোসিস্টেম

চা এর ইকোসিস্টেম হলো এক ধরনের জটিল এগ্রো-ইকোসিস্টেম। বিভিন্ন ধরনের জীবিত ও জড়বস্তুর সমন্বয়ে এ ইকোসিস্টেম গঠিত। জীবন্ত বস্তু ছাড়াও এখানে সূর্যালোক, সূর্যালোক ঘণ্টা, আলোর তীব্রতা, বৃষ্টিপাতের ধরণ, মেঘাচ্ছন্নতা, বায়ুর গতি, তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা ইত্যাদি জড় বস্তুর আওতায় রয়েছে।

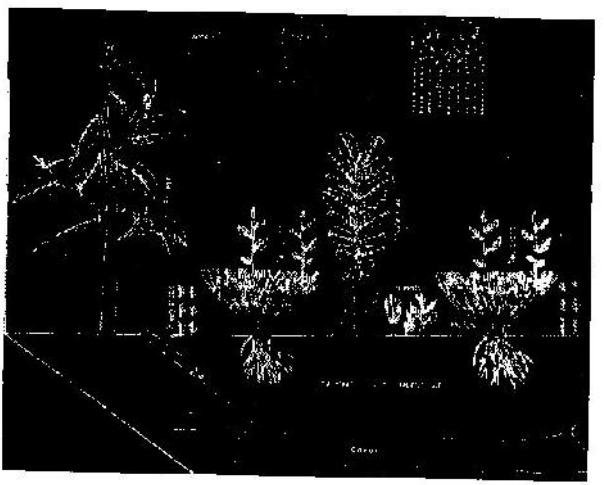

মুখ্য অনিস্টকারী কীটপতঙ্গ

১) চায়ের মশা (Tea mosquito bug, *Helopeltis theivora W.*)

বাংলাদেশ চায়ে মশা একটি গুরুত্বপূর্ণ কীট। এ পোকা বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত, শ্রীলংকা, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া এবং আফ্রিকাতেও বিস্তৃত। চা ছাড়াও এটি কফি, কোকোয়া, এবং কাজুবাদামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অপদ। চা বাগানে এটি 'টি হেলোপেলটিস বা চায়ের মশা' নামে পরিচিত, যদিও মশার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। এটি হেমিপটেরা বর্গের মিরিডি গোত্রের একটি শোষণকারী পোকা। বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের প্রায় সব চা বাগানেই এ পোকার প্রাদুর্ভাব খুব বেশি দেখা যায়। চট্টগ্রামের চা বাগানগুলিতে এ পোকার আবির্ভাব খুব একটা নাই বললেই চলে। তবে পঞ্চগড় অঞ্চলের চা বাগানগুলিতে এ পোকার আক্রমণ পরিলক্ষিত হয়।

হেলোপেল্টিস এর আক্রমণে ১৫% শস্যক্ষতি হয়ে থাকে। চায়ের এ শোষক পোকাটির পুরুষ ও স্ত্রী পোকার নিম্ফ ও পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গ উভয়ই চায়ের কচি ডগা ও পাতার রস শোষণ করে থাকে এবং ফলশ্রুতিতে আক্রান্ত অংশ কালো হয়ে যায়। ব্যাপক আক্রমণে কচি কিশলয় কুকড়ে যায় ও নতুন কিশলয় গজানো বন্ধ হয়ে যায়। হেলোপেল্টিস আক্রান্ত অংশ প্রথমে বাদামি বর্ণের হয় এবং পরবর্তীতে তা কালো হয়ে যায়। তবে এদের আক্রমণ সকালে ও বিকালে তীব্রতর থাকে। মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়া তাদের বংশবৃদ্ধিকে আরও ত্বরান্বিত করে।

হেলোপেল্টিস সাধারণত নরম কাণ্ডে, কচি কিশলয়, পাতার বোঁটা ও মধ্যশিরায় ডিম পাড়ে। এদের ডিমগুলো টেস্টটিউব আকৃতির ও একপাশে দুটি অসমান চুল থাকে। একটি স্ত্রী হেলোপেল্টিস আনুমানিক ৪০-৬০০টি ডিম পাড়ে। তবে ঋতুভেদে এর তারতম্য হয়ে থাকে। ডিম থেকে নিম্ফ বা বাচ্চা জন্ম নেয়। ঋতুভেদে ডিম থেকে বাচ্চা হওয়ার সময়কাল ভিন্ন হয়ে থাকে। তবে শস্য-মৌসুমে ৬-৭ দিন হয়ে থাকে। এরা গড়ে ১ মাস হতে ২ মাস বেঁচে থাকে। গবেষণায় দেখা গেছে একটি বাচ্চা মশা দিনে পাতায় ৮৫-১০৬টি দাগ তৈরি করে থাকে। উপর্যুপরি আক্রমণে সম্পূর্ণ কিশলয় কালো হয়ে কুকড়ে নষ্ট হয়ে যায়।

হেলোপেল্টিস আক্রান্ত ঝুপ/ডট

হেলোপেল্টিস আক্রান্ত ডট ও ওর পাতায় জীবন্ত হেলোপেল্টিস

সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

১) পোকার আক্রমণের সাথে চায়ের জাত একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। হেলোপেলটিস প্রতিরোধী জাত/ক্লোন ব্যবহার করতে হবে। বাংলাদেশের বিটি সিরিজের ক্লোনসমূহ বিশেষ করে বিটি৩, বিটি৪, বিটি৫, বিটি৬, বিটি৯, বিটি১১, বিটি১৩ ও বিটি১৪ এবং ইন্ডিয়ান টিভি১, টিভি৪, টিভি৫, টিভি৬ ও টিভি৯ জাতের ক্লোনসমূহ হেলোপেলটিসের প্রতি যথেষ্ট সংবেদনশীল। এছাড়াও তীনআলী-১৭ জাতের স্থানীয় জাতটিও এ পোকার প্রতি বেশ সংবেদনশীল। তাই নতুন আবাদির জন্য এসব ক্লোন বর্জন করতে হবে। তবে বিটি১, বিটি২, বিটি৭, বিটি৮, বিটি১০, বিটি১২ ও বিটি১৬ জাতের ক্লোনসমূহ তুলনামূলকভাবে হেলোপেলটিস প্রতিরোধী।

২) হেলোপেল্টিস আক্রান্ত সেকশনের ছায়াপ্রদানকারী গাছসমূহের ঘন ডালপালা ছেঁটে দিতে হবে যাতে সেকশনে পর্যাপ্ত আলো বাতাস প্রবেশ করতে পারে। হেলোপেল্টিস যেহেতু আলো সংবেদনশীল পোকা তাই আলো প্রবেশের কারণে তা বিতাড়িত হয়ে যায়।

৩) হেলোপেল্টিস চা গাছ ছড়াও বেশ কিছু বিকল্প পোষকগাছের উপর জীবন ধারণ করে বেঁচে থাকে। হেলোপেল্টিস বিকল্প পোষকসমূহ যেমন : মিকানিয়া, সিনকোনা, কাজুবাদাম, তুলা, বগামেডুলা, কোকোয়া, পেয়ারা, কাঁঠাল, কফি, আম, মিষ্টি আলু, রঙ্গন ও দুরন্ত ইত্যাদি গাছ সেকশনের আশপাশ থেকে অপসারণ করতে হবে।

৪) সেকশন অবশ্যই আগাছামুক্ত রাখতে হবে ও ঘন ছায়াগাছ এর পার্শ্ব ছাঁটাই করতে হবে। নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি করতে হবে। সেকশনের স্যাঁতসেঁতে ভাব দূর করতে হবে।

৫) প্লাকিং রাউন্ড অবশ্যই ৭-৮ দিন অনুসরণ করতে হবে। এতে করে ডিম বিনষ্ট করা সম্ভব।

৬) শুষ্ক মৌসুমে হেক্টর প্রতি ২.২৫ লি. হারে ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি ৫০০ লি. পানিতে মিশিয়ে ৭ দিন অন্তর স্প্রে করতে হবে। স্প্রে অবশ্যই প্লাকিং এর পরের দিন করতে হবে।

৭) বর্ষা মৌসুমে হেক্টর প্রতি ৫০০ মি.লি. হারে সাইপারমেথ্রিন ১০ ইসি অথবা ৭০০ মি.লি. হারে সাইপারমেথ্রিন+কুইনালফস ২৩ ইসি বা ১২৫ গ্রাম হারে থায়োমেথোক্সেম ২৫ ডব্লিউজি বা ৩৭৫ মিলি হারে থায়াক্লোপ্রিড ২৪০এসসি ৫০০ লি. পানিতে মিশিয়ে ৭ দিন অন্তর স্প্রে করতে হবে। ২য় রাউন্ড অবশ্যই

৭ দিনের মাথায় স্প্রে করতে হবে। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চায়ের মশা দমনে ব্যারিয়ার স্প্রেয়িং খুবই ফলপ্রসূ। এক্ষেত্রে প্রথমে সেকশনের বর্ডার এলাকা দিয়ে স্প্রে করতে হবে। চায়ের অনুমোদিত কীটনাশক সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে বিটিআরআই এর ১৩৭নং সার্কুলার অনুসরণ করা যেতে পারে।

২) লাল মাকড় (Red spider mite, Oligonychus coffeae N.)

লাল মাকড় চা আবাদির অন্যতম প্রধান ক্ষতিকর বালাই। এরা একারিনা বর্গের অন্তর্ভুক্ত। আকারে অতিক্ষুদ্র এক ধরনের জীব এদের আকার ০.৫-০.৭ মি.মি পর্যন্ত হয়ে থাকে ও ৪ জোড়া পা থাকে। এদের লার্ভা ও পূর্ণাঙ্গ মাকড় পরিণত পাতার উপর ও নিচ থেকে আক্রমণ করে থাকে। প্রতিটি পাতায় শতাধিক মাকড় ও সহস্রাধিক ডিম পাওয়া যায়। রস শোষণের ফলে পাতার উভয় দিক তাম্রবর্ণ ধারণ করে এবং শুষ্ক ও বিবর্ণ দেখায়। উপর্যুপরি আক্রমণে সম্পূর্ণ পাতা ঝরে যায় ও কিশলয় ক্ষীণ বা লিকলিকে হয়। বাংলাদেশের চায়ে লাল মাকড়ের আক্রমণে ৯.৫৭% শস্য ক্ষতি হয়ে থাকে।

লালমাকড় ও লালমাকড় আক্রান্ত চায়ের পাতা

শেষ মোল্টিং এর পরপরই স্ত্রী মাকড়ের সাথে মিলনের জন্য চারপাশে পুরুষ মাকড়ের আনাগোনা দেখা যায়। মিলনের পর স্ত্রী মাকড় পাতার উপরিভাগে বিশেষকরে মধ্যশিরা বরাবর একক ভাবে ডিম পাড়তে শুরু করে। এরা জীবনে গড়ে ৬০-৭৭টি ডিম পেড়ে থাকে। আবহাওয়া পরিবর্তনের সাথে সাথে অর্থাৎ তাপমাত্রা বৃদ্ধি, থেমে থেমে বৃষ্টি, থেমে থেমে রোদ, আপেক্ষিক আর্দ্রতা ইত্যাদি কারণে লালমাকড়ের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পায়। খরা লাল মাকড়ের প্রাদুর্ভাব মারাত্মকভাবে বাড়িয়ে দেয়।

এদের প্রাদুর্ভাব কমাতে নিম্নলিখিত বিষয়ে দৃষ্টি দিতে হবে -

সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

১) লালমাকড় প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন জাত রোপনে অগ্রাধিকার দিতে হবে ।

২) নিউক্লিয়াস ক্লোন প্লট হতে কাটিং নেয়ার পূর্বেই মাকড়নাশক প্রয়োগ করে প্রাথমিক বেডে কাটিং বসাতে হবে।

৩) মৌসুম শুরুর আগেই মাকড়নাশক সংগ্রহে রাখতে হবে .

৪) মাকড়নাশক অবশ্যই মূল কোম্পানি বা রেজিস্টার্ড ডিলার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

৫) স্প্রেয়িংকালে অবশ্যই পূর্ণবয়স্ক ও কচি পাতার উভয়দিকে সিঞ্চন নিশ্চিত করতে হবে।

৬) এছাড়া ফিস লিফ ও জনম/স্কেল লিফ এলাকায় লালমাকড়ের অন্যতম লুকানোর স্থান। তাই মাকড়নাশক সিঞ্চনকালে অবশ্যই ফিস লিফ ও জনম/স্কেল লিফ টার্গেট করে সিঞ্চন করলে উত্তম ফল পাওয়া যাবে।

৭) বিটিআরআই অনুমোদিত মাকড়নাশক ও তার মাত্রা অনুসরণ করতে হবে। ইচ্ছামাফিক মাত্রা পরিবর্তন করা যাবে না।

৮) আক্রান্ত সেকশনে পর্যাপ্ত ছায়াপ্রদানকারী গাছ লাগাতে হবে। কেননা লালমাকড় উষ্ণ ও শুষ্ক আবহাওয়া পছন্দ করে।

৯) বছরের শুরুতে ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে স্কিফ ও নতুন আবাদি এলাকায় সালফার নামক মাকড়নাশক prophylactic হিসেবে কমপক্ষে ২ রাউন্ড ৬ দিন অন্তর প্রয়োগ করতে হবে। প্রয়োজনে ৩ রাউন্ড সিঞ্চন করা যেতে পারে। এছাড়া এলপি এলাকায় পাতা আসার সাথে সাথে মনিটরিং করে যদি লালমাকড়ের উপস্থিতি দেখা যায় তাহলে prophylactic ব্যবস্থা নিতে হবে

১০) আগাছা লালমাকড়ের বিকল্প পোষক। সেকশনকে অবশ্যই লালমাকড়ের বিকল্প পোষক ও আগাছামুক্ত রাখতে হবে। মিকানিয়া, তুলা, আম, কোকোয়া, পাট, কফি, গাঁদা ফুল, একাশিয়া, বগামেডুলা, ডেরিস, শিরিষ, লেবু, ইউক্যালিপ্টস ইত্যাদি লালমাকড়ের বিকল্প পোষক হিসেবে কাজ করে। তাছাড়া আগাছা পোকামাকড়কে কীটনাশক এর হাত থেকেও রক্ষা করে। তাই প্রথম বৃষ্টিপাতের পর আগাছা যাতে নিয়ন্ত্রণে থাকে সেদিকে নজর দিতে হবে।

১১) আক্রান্ত সেকশনের আশেপাশে বিকল্প পোষক গাঁদা ফুল গাছ ফাঁদ হিসেবে লাগিয়ে আক্রমণ কমানো যায়

১২) দমকা বাতাসে লালমাকড় ছড়ায়। চৈত্র-বৈশাখ মাসে সাধারণত দমকা বাতাস বয়ে থাকে। তাই দমকা বাতাস প্রতিরোধকারী (wind breaker) হিসেবে সেকশনের চারদিকে একসারি নিমজাতীয় ছায়াগাছ উত্তোলন অতীব জরুরি।

১৩) তাছাড়া হালকা বৃষ্টি বা থেমে থেমে রোদ (intermittent sunny day) লাল মাকড়ের প্রাদুর্ভাব বাড়িয়ে দেয়। তাই এসময়ে মাকড়নাশক সিঞ্চন অত্যাবশ্যক।

১৪) বর্ধিত তাপমাত্রা ও কুয়াশাচ্ছন্ন সকাল লাল মাকড়ের প্রজনন ক্ষমতা, ডিমের সুপ্তিকাল, জীবনকাল পরিবর্তন ও বংশবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১৫) আদর্শমাত্রা থেকে নিম্ন pH মানে যেহেতু চা গাছ দুর্বল থাকে তাই pH সংশোধন অত্যাবশ্যকীয়।

১৬) মাকড় নিধনে অবশ্যই পাতার উপর ও নীচে টার্গেট পয়েন্ট রেখে সিঞ্চন নল ও স্প্রে নজল চা গাছের মধ্যে প্রবেশপূর্বক নজল উল্টিয়ে সিঞ্চন করতে হবে অন্যথায় মাকড়নাশকের অপচয় হবে, অপর দিকে কাঙ্ক্ষিত মাকড় দমন হবে না।

১৭) সিঞ্চন সময়কাল অবশ্যই দুপুর রোদে নয়। সকাল ৬-৮ টা এবং বিকেলের পড়ন্ত রোদে ৪-৭টা নিশ্চিত করতে হবে। এ সময় পাতার উপরিভাগে মাকড়ের সর্বোচ্চ সংখ্যা থাকে।

১৯) সেকশনে গবাদি পশুর বিচরণ বন্ধ করতে হবে যা লালমাকড়ের বাহক হিসেবে কাজ করে। চা আবাদিতে প্লাকারদের চলাফেরা লালমাকড়ের আক্রমণানুসারে সাজাতে হবে।

২০) রাস্তার পাশের ঝুপসমূহে ধূলাবালি জমে থাকায় এখানে লালমাকড়ের আক্রমণ বেশি হয়ে থাকে। বিধায় এ সমস্ত ঝুপসমূহে বিশেষ নজর দিতে হবে।

২১) সিঞ্চনকৃত সেকশনকে ২য় রাউন্ড স্প্রে করার পরে অন্য সেকশনকে বিবেচনায় আনতে হবে।

২২) অ্যামোনিয়াম সালফেট, ফসফেট ও পটাশ সার এর ফলিয়ার প্রয়োগ মাকড় দমনে সহায়ক।

২৩) লালমাকড় আক্রান্ত সেকশনে সিনথেটিক পাইরিথ্রয়েড জাতীয় কীটনাশক বিশেষ করে সাইপারমেথ্রিন ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে কারণ সিনথেটিক পাইরিথ্রয়েড লালমাকড়ের প্রজনন ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। ফলে মাকড়ের প্রাদুর্ভাব বেড়ে যায়।

নিম্নে মাকড়নাশকের নাম, মাত্রা ও প্রয়োগ পদ্ধতি উল্লেখ করা হল-

মাকড়নাশকের নাম	মাত্রা (কে.জি./লি./হে.)	প্রয়োগকাল ও পদ্ধতি
Thiovit 80WP/ Kumulus 80WP/ Sulfotox 80WP/Insuf 80WDG অথবা সালফার গ্রুপের যে কোন একটি	২.২৫ কেজি মাকড়নাশক ১০০০ লি. পানিতে মিশাতে হবে	৫ ও দিন অন্তর দুই রাউন্ড স্প্রে করতে হবে। তবে Prophylactic ও পরিবেশের তাপমাত্রা ৩০° সে. এর মধ্যে হলেই কেবলমাত্র বিকেল বেলায় পাতার উভয় দিক সিঞ্চন করতে হবে
Vertemec 1.8EC/Abom 1.8EC	৫০০ মিলি. মাকড়নাশক ১০০০ লি. পানিতে মিশাতে হবে।	Palliative measure হিসেবে ৬-৭ দিন অন্তর দুই রাউন্ড মাকড়নাশক পাতার উভয় দিকে সিঞ্চন করতে হবে
Omite 57EC/Sumite 57EC/Eminite 57EC	১.০০ লি. মাকড়নাশক ১০০০ লি. পানিতে মিশাতে হবে।	Palliative measure হিসেবে ৬-৭ দিন অন্তর দুই রাউন্ড মাকড়নাশক পাতার উভয় দিকে সিঞ্চন করতে হবে।
Zeromite 40EC	১.০০ লি. মাকড়নাশক ১০০০ লি. পানিতে মিশাতে হবে।	Palliative measure হিসেবে ৬-৭ দিন অন্তর দুই রাউন্ড মাকড়নাশক পাতার উভয় দিকে সিঞ্চন করতে হবে।
Danitol 10EC	১.০০ লি. মাকড়নাশক ১০০০ লি. পানিতে মিশাতে হবে।	Palliative measure হিসেবে ৬-৭ দিন অন্তর দুই রাউন্ড মাকড়নাশক পাতার উভয় দিকে সিঞ্চন করতে হবে।
Magister 10EC	৬০০ মি.লি. মাকড়নাশক ১০০০ লি. পানিতে মিশাতে হবে।	Palliative measure হিসেবে ৬-৭ দিন অন্তর দুই রাউন্ড মাকড়নাশক পাতার উভয় দিকে সিঞ্চন করতে হবে
Mite Seavenger 10EC	৫০০ মিলি. মাকড়নাশক ১০০০ লি. পানিতে মিশাতে হবে	Palliative measure হিসেবে ৬-৭ দিন অন্তর দুই রাউন্ড মাকড়নাশক পাতার উভয় দিকে সিঞ্চন করতে হবে
Inteprid 10SC	১.০০ লি. মাকড়নাশক ১০০০ লি. পানিতে মিশাতে হবে।	Palliative measure হিসেবে ৬-৭ দিন অন্তর দুই রাউন্ড মাকড়নাশক পাতার উভয় দিকে সিঞ্চন করতে হবে।
Mitisol 5EC	১.০০ লি. মাকড়নাশক ১০০০ লি. পানিতে মিশাতে হবে	Palliative measure হিসেবে ৬-৭ দিন অন্তর দুই রাউন্ড মাকড়নাশক পাতার উভয় দিকে সিঞ্চন করতে হবে

লালমাকড়ের বিস্তারিত তথ্য বিটিআরআই এর ১২৮নং সার্কুলারে বর্ণিত আছে।

নিম্নে মাকড়নাশকের নাম, মাত্রা ও প্রয়োগ পদ্ধতি উল্লেখ করা হল-

মাকড়নাশকের নাম	মাত্রা (মিলি/লি./হে.)	প্রয়োগকাল ও পদ্ধতি
Thiovit 80WP/ Kumulus 80WP/ Sulfotox 80WP/Insul 80WDG অথবা সালফার গ্রুপের যে কোন একটি	২.২৫ কেজি মাকড়নাশক ১০০০ লি. পানিতে মিশাতে হবে।	৫-৬ দিন অন্তর দুই বার/ত স্প্রে করতে হবে তবে Prophylactic ও পরিবেশের তাপমাত্রা ৩০° সে. এর নিচে হলেই কেবলমাত্র বিকেল বেলায় পাতার উভয় দিকে সিঞ্চন করতে হবে
Vertemec 1.8EC/Abon 1.8EC	৫০০ মিলি. মাকড়নাশক ১০০০ লি. পানিতে মিশাতে হবে।	Palliative measure হিসেবে ৬-৭ দিন অন্তর দুই বার/ত মাকড়নাশক পাতার উভয় দিকে সিঞ্চন করতে হবে।
Omite 57EC/Sumite 57EC/Emimite 57EC	১.০০ লি. মাকড়নাশক ১০০০ লি. পানিতে মিশাতে হবে	Palliative measure হিসেবে ৪-৫ দিন অন্তর দুই বার/ত মাকড়নাশক পাতার উভয় দিকে সিঞ্চন করতে হবে।
Zeromite 40EC	১.০০ লি. মাকড়নাশক ১০০০ লি. পানিতে মিশাতে হবে	Palliative measure হিসেবে ৬-৭ দিন অন্তর দুই বার/ত মাকড়নাশক পাতার উভয় দিকে সিঞ্চন করতে হবে।
Danitol 10EC	১.০০ লি. মাকড়নাশক ১০০০ লি. পানিতে মিশাতে হবে	Palliative measure হিসেবে ৪-৫ দিন অন্তর দুই বার/ত মাকড়নাশক পাতার উভয় দিকে সিঞ্চন করতে হবে।
Magister 10EC	৬০০ মি.লি. মাকড়নাশক ১০০০ লি. পানিতে মিশাতে হবে।	Palliative measure হিসেবে ৬-৭ দিন অন্তর দুই বার/ত মাকড়নাশক পাতার উভয় দিকে সিঞ্চন করতে হবে
Mite Scavenger 10EC	৫০০ মিলি. মাকড়নাশক ১০০০ লি. পানিতে মিশাতে হবে।	Palliative measure হিসেবে ৬-৭ দিন অন্তর দুই বার/ত মাকড়নাশক পাতার উভয় দিকে সিঞ্চন করতে হবে
Inteprid 10SC	১.০০ লি. মাকড়নাশক ১০০০ লি. পানিতে মিশাতে হবে	Palliative measure হিসেবে ৬-৭ দিন অন্তর দুই বার/ত মাকড়নাশক পাতার উভয় দিকে সিঞ্চন করতে হবে
Mitisol 5EC	১.০০ লি. মাকড়নাশক ১০০০ লি. পানিতে মিশাতে হবে	Palliative measure হিসেবে ৬-৭ দিন অন্তর দুই বার/ত মাকড়নাশক পাতার উভয় দিকে সিঞ্চন করতে হবে

লালমাকড়ের বিস্তারিত তথ্য বিটিআরআই এর ১২৮নং সার্কুলারে বর্ণিত আছে।

লাল মাকড়নাশক স্প্রিঞ্চনের সময়কাল

গ্রুপ	রাউন্ড				মন্তব্য
	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	
এ	মার্চ-এপ্রিল	এপ্রিল-মে	মে-জুন	অক্টোবর-নভেম্বর	প্রতি বছর মারাত্মক আক্রমণ হয়।
বি	মার্চ-এপ্রিল	মে-জুন	অক্টোবর	-	প্রতি বছর মাঝামাঝি আক্রমণ হয়।
সি	মার্চ	এপ্রিল	মে	-	প্রতি বছর সামান্য আক্রমণ হয়।

(৩) উঁইপোকা (Termites)

উঁইপোকা মৌমাছির মতো সামাজিক পতঙ্গ। এটি আইসোপটেরা বর্গের পোকা যাকে হোয়াইট অ্যান্টও বলা হয়। চা বাগানে 'উলুপোকা' নামে পরিচিত। ইহা চায়ের অন্যতম মুখ্য ক্ষতিকারক কীট। চা গাছের মরা-পচা বা জীবন্ত অংশ খায়। এরা মাটিতে ও গাছের গুড়িতে ঢিবি তৈরি করে বাস করে। রানী পোকা প্রতিদিন পড়ে ৮৪,০০০ ডিম পাড়ে এবং ২৪-৯০ দিন পরে ডিম থেকে বাচ্চা বের হয়। কেবলমাত্র শ্রমিক শ্রেণিই চা গাছ খেয়ে থাকে। বাংলাদেশে জীবন্ত গাছখেকো ও মরাপচা গাছখেকো দুই ধরনের উঁইপোকাই দেখা যায়।

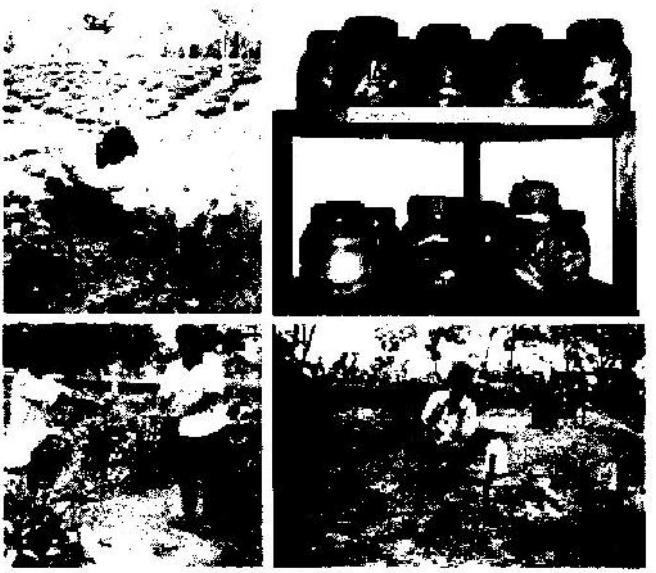

সংগৃহীত উঁইপোকা ও তাদের দমন কৌশল

সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

১. উঁইপোকা প্রতিরোধী জাত/ক্লোন নির্বাচন করতে হবে। মণিপুরি বা মণিপুরি-চায়না হাইব্রিড জাত অথবা বিটি ৪, বিটি ৬, বিটি ৭, বিটি ৮ ও বিটি ৯ ক্লোন উঁইপোকা প্রতিরোধী জাত। বিটি ১০ ও বিটি ১১ ক্লোনদ্বয় উঁইপোকার প্রতি বেশ সংবেদনশীল।

২. তিন বছরের প্রুনিং চক্র (লাইট প্রুনিং-ডীপ স্কীফ-লাইট স্কীফ) উঁইপোকার প্রার্দুভাব কমাতে সাহায্য করে

৩. খাবার ফাঁদ যেমন- মরা বাঁশের খণ্ড, নরম কাঠ, বগামেডুলা ব্যবহার করে উঁইপোকার আবির্ভাব সনাক্তকরণ ও ধ্বংস করা।

৪. উঁইপোকার রানী সংগ্রহ করে মেরে ফেলতে হবে। এতে বংশবৃদ্ধি ব্যাহত হবে।

৫. বেশ কিছু উপকারী পোকা আছে যারা উঁইপোকা ধরে খায়। এদেরকে চা আবাদিতে সংরক্ষণ করতে হবে।

৬. হেক্টর প্রতি ১.৫ লিটার হারে ইমিডাক্লোপ্রিড ২০০ এসএল/রিজেন্ট ৫০ এসসি অথবা ১০ লিটার হারে ক্লোরপাইরিফস ২০ ইসি ১০০০ লিটার পানিতে মিশিয়ে আক্রান্ত গাছের গোড়ায় ভালভাবে স্প্রে করতে হবে।

(৪) জেসিড (Jassid, Empoasca flavescence)

জেসিড বা সবুজ মাছি নার্সারি ও অপরিণত চায়ের অন্যতম অনিষ্টকারী কীট। আবাদি এলাকায় ছাঁটাই উত্তর নতুন কিশলয়ে এদের আক্রমণ পরিলক্ষিত হয়। এরা চায়ের পাতার রস শুষে নেয়। আক্রান্ত পাতা নৌকাকৃতি ধারণ করে ও কিনারা শুকিয়ে যায়। কম ছায়াযুক্ত স্থানে এ পোকার আবির্ভাব বেশি পরিলক্ষিত হয় পরবর্তীতে রিম ব্লাইট রোগের আক্রমণ দেখা যায়।

সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

১. আক্রান্ত সেকশনে পর্যাপ্ত ছায়াপ্রদানকারী গাছ লাগাতে হবে।
২. সেকশন অবশ্যই আগাছামুক্ত রাখতে হবে।
৩. প্লাকিং রাউন্ড অবশ্যই ৭-৮ দিন অনুসরণ করতে হবে।
৪. হেক্টর প্রতি ৫০০ মি.লি. হারে সাইপারমেথ্রিন ১০ ইসি ৫০০ লি. পানিতে মিশিয়ে ৭ দিন অন্তর স্প্রে করতে হবে। কচি ডগা ও কচি পাতার নিচে স্প্রে করতে হবে।

(৫) এফিড (Aphid, *Toxoptera aurantii*)

এদেরকে জাবপোকাও বলা হয়। নার্সারি ও অপরিণত চায়ের অন্যতম অনিষ্টকারী কীট। আবাদি এলাকায় ছাঁটাইউত্তর নতুন কিশলয়ে আক্রমণ পরিলক্ষিত হয়। দলবদ্ধভাবে বিভিন্ন বয়সের এফিড চায়ের কচি ডগা ও কচি পাতার রস শোষণ করে। তাই বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। এদের অবস্থানের পাশাপাশি কালো পিঁপড়া দেখা যায়। ডিসেম্বর-মার্চ মাস পর্যন্ত এ পোকার আক্রমণ তীব্র থাকে।

এফিড আক্রান্ত কচি শুট

সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

১. নার্সারিতে হাত বাছাই উত্তম পদ্ধতি।
২. আবাদিতে প্লাকিং রাউন্ড অবশ্যই ৭-৮ দিন অনুসরণ করতে হবে।
৩. বায়োকন্ট্রল এজেন্ট হিসেবে লেডি বার্ড বিটল ব্যবহার করেও এফিড কমানো যায়।
৪. হেক্টর প্রতি ৫০০ মি.লি. হারে সাইপারমেথ্রিন ১০ ইসি ৫০০ লি. পানিতে মিশিয়ে ৭ দিন অন্তর স্প্রে করতে হবে কচি ডগা ও কচি পাতার নিচে স্প্রে করতে হবে

(৬) থ্রিপ্স (Thrips, Scirtothrips dorsalis)

থ্রিপ্স অতিক্ষুদ্র বাদামি রংয়ের পোকা নার্সারি ও অপরিণত চায়ের অন্যতম অনিষ্টকারী কীট। নার্সারি ও স্কিফ এলাকায় এদের আক্রমণ বেশি পরিলক্ষিত হয়। আবাদি এলাকায় ছাঁটাইউত্তর নতুন কিশলয়েও এদের আক্রমণ দেখা যায়। অপ্রস্ফুটিত কুঁড়িতে ক্রমাগত রস শোষণের ফলে পাতার উপরিভাগের মধ্যশিরার দু'পার্শ্বে দুটি লম্বা শোষণ রেখা দেখা যায় যা কুঁড়ি প্রস্ফুটিত হলে দৃশ্যমান হয়। খরার কারণে এদের আক্রমণ আরও প্রকট হয়।

থ্রিপস ও থ্রিপস আক্রান্ত পাতা

সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

১. আক্রান্ত সেকশনে পর্যাপ্ত ছায়াপ্রদানকারী গাছ লাগাতে হবে।

২. সেকশন অবশ্যই আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

৩. বায়োকন্ট্রল এজেন্ট হিসেবে লেডি বার্ড বিটল ও মাকড়শা ব্যবহার করেও থ্রিপ্স দমন করা যায়।

৪. আবাদিতে প্লাকিং রাউন্ড অবশ্যই ৭-৮ দিন অনুসরণ করতে হবে।

৫. হেক্টর প্রতি ৫০০ মি.লি. হারে ইন্টাপ্রিড ১০ এসসি বা ৩০০ মি.লি. হারে এডমায়ার ২০০ এসএল বা ১.০০ লি. হারে কুইনালফস ২৫ ইসি ৫০০ লি. পানিতে মিশিয়ে ৭ দিন অন্তর ২ বার স্প্রে করতে হবে। কচি ডগা ও কচি পাতার নিচে স্প্রে করতে হবে।

(৭) ফ্লাশওয়ার্ম (Flushworm, *Laspeyresia leucostoma*)

এরা মথ জাতীয় পতঙ্গের অপরিণত দশা। দেখতে লেদা পোকার মত দু'টি পাতা ও একটি কুঁড়িকে গুটিয়ে পাটি-সাপটার মত মোড়ক তৈরি করে। মোড়কের ভিতরে থেকে কচি কিশলয় কুড়ে কুড়ে খায়। নার্সারি ও অপরিণত চা ও আবাদি এলাকায় ছাঁটাইউত্তর নতুন কিশলয়ে এ সমস্যা ব্যাপক।

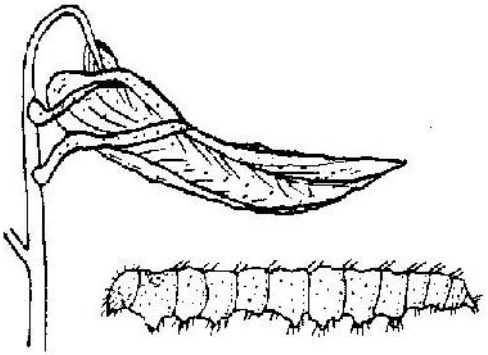

ফ্লাশ ওয়ার্ম

সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

- হাত বাছাই উত্তম পদ্ধতি। হাত বাছাই করে মেড়ক অংশটি বিনষ্ট করলে কীড়াটি মারা যাবে।
- এদের দমনে কোন কীটনাশক ব্যবহার না করাই ভাল। তবে আক্রমণ বেশি হলে ৫০০ মিলি হারে সাইপারমেথ্রিন ১০ ইসি বা ৫০০ মি.লি. হারে ইন্ডাক্রিড ১০ এসসি বা ৩০০ মি.লি. হারে এন্ডমায়ার ২০০ এসএল ৫০০ লি. পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। তবে নিম বীজের নির্যাস ব্যবহার করেও ভাল ফল পাওয়া যায়।

(৮) আঁশ পোকা (Scale insect)

বাংলাদেশে চায়ে আঁশ পোকা (Scale insect) একটি উল্লেখযোগ্য কীট। এটি চা গাছ, ছায়াবৃক্ষ আক্রমণ করে থাকে। এমনকি তুলা, কাঁঠাল, লেবু, জাম্বুরা, পেয়ারা, গোলাপ গাছও সমানভাবে আক্রমণ করে থাকে। এ পতঙ্গটি coccidae পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো বিভিন্ন বর্ণের এবং বিভিন্ন আকৃতির মোম জাতীয় আবরণ নিঃসৃত করে এবং সে আবরণের নিচে বাস করে। শোষক অঙ্গ (rostrum) দ্বারা গাছের রস শোষণ করে খায়। চা বাগানে আঁশ পোকার অসংখ্য প্রজাতি আছে তবে কয়েকটি প্রজাতি ক্ষতিকর বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

আঁশ পোকাগুলো ক্ষুদ্রাকৃতির কচি কাণ্ডে বা পাতার নিচের দিকে মধ্যশিরা বরাবর ঝাঁকবেধে বাস করে। পরিণত স্ত্রী পোকাগুলো ডিম্বাকার, সচরাচর উত্তল, অস্পষ্টভাবে খণ্ডায়িত এবং শল্কপত্র বা মাছের আঁশের মতো। জীবনচক্রে প্রথমবার পূর্ণতাপ্রাপ্ত মথগুলোতে ব্যবহার উপযোগী পা থাকে এবং এসকল পায়ের সাহায্যে এরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এদেরকে crowler বলা হয়। পরবর্তী মথগুলো স্থির,

শোষক অঙ্গদ্বারা গাছের রস শোষে খায়। পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী পতঙ্গগুলোর পাখা থাকে না। তবে পুরুষ পতঙ্গগুলোর পাখা থাকে। পুরুষ পতঙ্গ অতিশয় ক্ষুদ্র ও নরম। আঁশপোকা বাংলাদেশ চায়ে একটি অনিয়মিত ক্ষতিকারক পোকা কিন্তু আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে এবং রাসায়নিক কীটনাশকের ক্রমব্যবহারে নির্ভরতার কারণে পতঙ্গটি মুখ্য ক্ষতিকারক পোকা হিসেবে দেখা দিচ্ছে।

এদের দমনে কৌশল অবলম্বন করতে হয়। পোকার দেহের চারদিকে মোমজাতীয় পদার্থের আবরণ এবং অধিকাংশই পাতার নিচের দিকে অবস্থান করায় কীটনাশক দ্বারা এদের বিনষ্ট করা কষ্টসাধ্য। তাই এদের দমন করতে কমপক্ষে ২ রাউন্ড সিস্টেমিক কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে তবে পাতার নিচের দিকে ও কচি কাণ্ডে টার্গেট পয়েন্ট নির্ধারণ করতে হবে। জৈবিক নিয়ন্ত্রণ এবং তেল জাতীয় পদার্থের প্রয়োগ (যা শ্বসনে ব্যাঘাত ঘটায়) অধিক কার্যকরী।

স্কেল ইনসেক্ট আক্রান্ত চা সেকশন

স্কেল ইনসেক্ট আক্রান্ত ডেরিস রোবাস্টা ছায়াগাছ

(৯) উরচুঙ্গা (Cricket, *Brachytrypes portentosus*)

নার্সারি ও অপরিণত চা আবাদিতে উরচুঙ্গা একটি বড় সমস্যা। মুখে শক্ত ও ধারালো দাঁত আছে। সামনের পা জোড়া খাঁজকাটা, চ্যাপ্টা কোদালের মত। পায়ের এ অবস্থার কারণে ছোট চা-চারাকে ধরে সহজেই কেটে ফেলে। এরা নিশাচর পতঙ্গ। মাটিতে গর্ত করে থাকে এবং সন্ধ্যার পর বের হয়ে আসে ও চা চারা কেটে ফেলে।

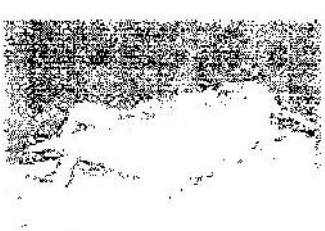

উরচুঙ্গা

সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

- এটি দমনে নার্সারি ও অপরিণত চা আবাদি এলাকার উরচুঙ্গার গর্তগুলো সনাক্ত করে গর্তের মুখে দু' চা চামচ পোড়া মবিল দিয়ে চিকন নলে পানি ঢেলে দিতে হবে। উরচুঙ্গা গর্ত থেকে বের হয়ে আসলে লাঠি বা পায়ের আঘাতে মেরে ফেলতে হবে।

(১০) লুপার ক্যাটারপিলার (*Biston suppressaria* Guen.)

লুপার ক্যাটারপিলার (*Biston suppressaria* Guen.) উত্তর-পূর্ব ভারতের চা আবাদিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পাতা খেকোপোকা যা মারাত্মক শস্যক্ষতি করে থাকে। দক্ষিণ ভারত, শ্রীলংকা, ইন্দোনেশিয়া ও বাংলাদেশেও এ পোকার আবির্ভাব দেখা যায়। লুপার ক্যাটারপিলার মথের অপরিণত দশা (Larval stage)। ইহা লেপিডপটেরা বর্গের জিওমেট্রিডি গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। ইহা চা গাছ ছাড়াও হুয়াতরু ও সবুজ শস্যের একটি ক্ষতিকারক কীট। আগে এটি দশের চায়ের মুখ্য ক্ষতিকারক পোকা ছিল না। এ পোকার অপরিণত দশাই চা গাছের পাতা ও কুড়ি খেয়ে ফেলে। বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলের কিছু চা বাগানে ১৯৬৩ সালে এ পোকার ব্যাপক আক্রমণ দেখা দিয়েছিল। পরবর্তীতে ভ্যালি সার্কেলগুলোর বিভিন্ন চা বাগানে প্রায়ই বিক্ষিপ্তভাবে এ কীটের আক্রমণ দেখা যেত। সম্প্রতি অনেক চা বাগানে লুপার ক্যাটারপিলারের আক্রমণ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে পূর্বে যেখানে এ পোকাটি অজ্ঞাত ছিল। বর্তমানে ২০০৫, ২০০৬, ২০০৮, ২০০৯ ও ২০১০ সালে যথাক্রমে দিনারপুর চা বাগান, বৃন্দাবন চা বাগান, জঙ্গলবাড়ি চা বাগান, জেরিন চা বাগান এবং পঞ্চগড়ের স্যালিলান চা বাগানে লুপার ক্যাটারপিলারের মারাত্মক আক্রমণ দেখা যায়। অনুমিত হচ্ছে ভবিষ্যতে চা শিল্পের জন্য এটি মুখ্য ক্ষতিকারক কীট হিসেবে গণ্য হতে পারে।

সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

পূর্ণাঙ্গ মথ দেখতে সূক্ষ্ম কালো দাগ বিশিষ্ট ধূসর বর্ণের। মাথা হলুদাভ বাদামি এবং থোরাক্স ও পেটে হলুদ দাগ আছে। সামনের পাখাতে একটি হলুদ ও মাঝখানে ঢেউ খেলানো ব্যান্ড আছে। সামনের ও পিছনের উভয় পাখাতে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু হলুদ দাগ রয়েছে। পুরুষ মথের পাখার বিস্তার ৪০-৫০ মি.মি. এবং স্ত্রী মথের পাখার বিস্তার ৬০-৭০ মি.মি.। সাধারণত পুরুষ মথ স্ত্রী মথের তুলনায় ছোট হয়ে থাকে এবং চিরুণির মতো শুং (antennae) থাকার কারণে তাদেরকে সহজেই আলাদা করা যায়। পরিণত ক্যাটারপিলার দেখতে পিছনে ও পার্শ্বে সবুজাভ সাদা রেখা সমৃদ্ধ ধূসর বাদামি বর্ণের এবং বাদামি মাথা বিশিষ্ট। এর পেটের ৬ষ্ঠ খণ্ডে একটি পা এবং পিছনের অংশে দৃঢ়ভাবে ধরার জন্য এক জোড়া ক্লাসপার আছে। এদের প্রধান বৈশিষ্ট্য চলার সময় লুপ তৈরি করে চলে।

ক্ষতির প্রকৃতি

অপরিণত ক্যাটারপিলার কচি পাতার কিনারা ছিদ্র করে এবং পরে কিনারা বরাবর খেতে থাকে। এটি আকারে যত বড় হতে থাকে পাতা খাওয়ার পরিমাণও তত বাড়তে থাকে। এক সময় মধ্যশিরা বাদে সম্পূর্ণ পাতাই খেয়ে ফেলে। পূর্ণবয়স্ক ক্যাটারপিলার পরিণত পাতা খেতে শুরু করে এবং আক্রমণ ব্যাপক হলে পুরো গাছটি পাতাবিহীন হয়ে পড়ে।

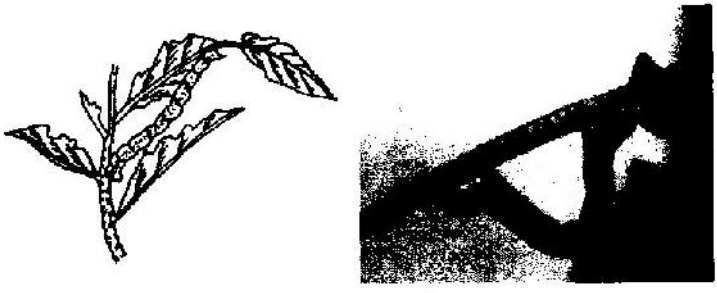

লুপাড় ও লুপাড় আক্রান্ত পাতা

জীবন বৃত্তান্ত

লুপার ক্যাটারপিলার পূর্ণাঙ্গ রূপান্তর প্রদর্শন করে। ক্যাটারপিলারের জীবনচক্র চারটি দশাতে সম্পন্ন হয়। এগুলো হল- ডিম, শুককীট, মুককীট ও পূর্ণাঙ্গ মথ। পূর্ণাঙ্গ মথ পরিস্ফুটন দিনই মিলিত হয় এবং পরবর্তী রাতেই ডিম পাড়া শুরু হয় যা ৩-৫ দিন চলমান থাকে। পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী মথ গুচ্ছাকারে ডিম পাড়ে। প্রতিটি গুচ্ছে ২০০-৬০০টি ডিম থাকে। ডিমগুলো গলাকার ও নীলাভ-সবুজ রঙের যা এক গুচ্ছ লোম দ্বারা ঢাকা থাকে এবং ডিম ফোটার পূর্বে গাঢ় বাদামিবর্ণ ধারণ করে। ডিম পাড়ার সাধারণ স্থান হলো চা গাছের আশেপাশে ছায়াগাছের কাণ্ড। কাছাকাছি বাঁশবাড়ি হলে ডিম পাড়ার পরবর্তী স্থান। ডিমের সুপ্তিকাল ৭-১০ দিন।

সদ্য ফোটা শুককীট গাঢ় বাদামি রঙের এবং দেহের পার্শ্ব ও পিঠ বরাবর সবুজাভ-সাদা রেখা থাকে। সক্রিয় খাদ্য গ্রহণের পর তারা ধূসর বাদামি বর্ণ ধারণ করে। লার্ভার সময়কাল প্রায় ৩ সপ্তাহ। এ দশায়ই চায়ের পাতা খেয়ে ক্ষতি করে থাকে। মুককীটায়নের পূর্বে ক্যাটারপিলার চা গাছের নিচে মাটির ভেতরে ঢুকে যায় এবং ২৫-৫০ মি.মি নিচে মুককীটায়ন সম্পন্ন করে। মুককীট দেখতে বাদামি বর্ণের যার সামনের প্রান্তের কিনারা দুটি করাতের ন্যায় এবং দেহের পিছেনের প্রান্তে ক্রিমাস্টার থাকে। মুককীটের সময়কাল গ্রীষ্মকালে প্রায় ৩-৪ সপ্তাহ এবং শীতকালে ১০-১২ সপ্তাহের বেশি। উৎপাদন মৌসুমে এদের জীবনচক্র প্রায় ৮-১০ সপ্তাহে সম্পন্ন হয়। বছরে ৪-৫টি জেনারেশন হয়ে থাকে।

আবির্ভাবের সময়

লুপার ক্যাটারপিলারের আক্রমণ বর্ষার পূর্বে অর্থাৎ মার্চ থেকে জুনে বেশি দেখা যায়, বর্ষায় কিছুটা কমতে থাকে এবং শীতের সময়ে অর্থাৎ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে আবার আক্রমণ দেখা যায়। পূর্ণাঙ্গ মথ মার্চ-জুলাই এবং সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে বিক্ষিপ্তভাবে পাওয়া যায়। অধিকন্তু, বিভিন্ন আবহাওয়ার আওতায় বিভিন্ন স্থানে মথ ও ক্যাটাপিলারের আবির্ভাবের সময় ভিন্ন রকম হয়ে থাকে। পোকাটি ছায়াতরু থেকে কিংবা চা গাছ থেকে স্থানান্তরের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে থাকে।

বিকল্প পোষক

পোকাটি বহুভোজী। ছায়াতরু যেমন-বগামেডুলা, সাদা কড়ই, শীল কড়ই, কালো কড়ই, শিরিষ, কালো শিরিষ, ডেরিস, জারুল, অড়হর, কাঠ বাদাম এবং প্রায়েট্রপিস নামক সবুজ শস্য লুপার ক্যাটারপিলারের বিকল্প পোষক হিসেবে কাজ করে।

দমন কৌশল

১. যান্ত্রিক/পরিচর্যাগত পদ্ধতি

ক) **হাত বাছাই:** লুপার দমনে হাত বাছাই উত্তম পদ্ধতি। আক্রমণ কম হলে ক্যাটারপিলার হাত দিয়ে সংগ্রহ করে মেরে ফেলা যায়। শীতকালে প্রুনিং সময়ে বিশেষ করে যে সমস্ত সেকশন ফর্কিং করা হয় সেখান থেকে কোকুন সংগ্রহ করা যেতে পারে।

খ) **পূর্ণাঙ্গ মথ ধ্বংস করা:** উৎপাদন মৌসুমের শুরুতে অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসের দিকে পূর্ণাঙ্গ মথ চা গাছ, ছায়া গাছ বা চা এলাকা সংলগ্ন অন্যান্য গাছ বিশেষ করে বাঁশ ঝাড়ে পাখা প্রসারিত করে বিশ্রামরত অবস্থায় থাকে। এরূপ মথের উপস্থিতি দেখা গেলে এ সময় বাঁশের মাথায় ঝাড়ু বেধে পিটিয়ে এদেরকে মারা যেতে পারে।

গ) **ফাঁদ ব্যবহার:** হলুদ ফাঁদ ক্যাটারপিলারের মথকে আকৃষ্ট করে থাকে। তাই হলুদ ফাঁদ ব্যবহার করে পূর্ণাঙ্গ মথ দমন করা যায়। ফ্লোরোসেন্ট আলোকফাঁদ ব্যবহার করেও এ মথ দমন করা যেতে পারে। পূর্ণাঙ্গ মথ পরিস্ফুটনের মৌসুমে এগুলোকে তৈরি করা যেতে পারে। এই ফাঁদগুলো পোকার উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ এবং দমনের মাধ্যম হিসেবে খুবই উপকারী।

ঘ) **বিকল্প পোষক কমানো:** লুপার ক্যাটারপিলারের বিকল্প পোষক যেমন-ছায়াগাছ, বগামেডুলা, সাদা কড়ই, শীল কড়ই, কালো কড়ই, শিরিষ, কালো শিরিষ, ডেরিস, জারুল, অড়হর, কাঠ বাদাম এবং অপরিণত চায়ে রোপণকৃত প্রায়েট্রপিস নামক সবুজ শস্য থাকলে সেখানে নজর দিতে হবে।

২. জৈবিক দমন

জৈবিক দমন বলতে চায়ের বালাই দমনে কিছু প্রাকৃতিক শত্রু যেমন-প্রিডেটর, প্যারাসিটয়েড, এবং প্যাথোজেনসমূহকে সহ্য সীমায় রেখে সংরক্ষণ করাকে বোঝায়। লুপার ক্যাটারপিলার হাইমেনোপটেরা ও ডিপটেরা বর্গের অসংখ্য প্যারাসাইট এবং কিছু প্রিডেটর যেমন-*Reduviid* bug দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে। লুপার ক্যাটারপিলারের ৪র্থ ও ৫ম ইন্সটার লার্ভার মৃত্যু *Apanteles* নামক প্রজাতির প্যারাসিটয়েডের কারণে হয়ে থাকে। *Bacillus thuringiensis* নামক প্যাথোজেন ব্যবহার করেও এ ক্যাটারপিলার দমন করা যায়। লুপার ক্যাটারপিলারের জৈব দমন এজেন্ট ব্যাকুলোভাইরাস নামক এক ধরনের ভাইরাস ব্যবহার করে পরিবেশবান্ধব পোকা ব্যবস্থাপনা করা যায়। নিউক্লিয়ার পলিহেড্রোসিস ভাইরাসের মাস সলিউশন চায়ের লুপার ক্যাটারপিলার দমনে বেশ ফলপ্রসূ যা পরিবেশের উপর এমনকি তৈরি চায়ের গুণগতমানে কোন প্রভাব ফেলে না (জ্যু, ১৯৮১)।

৩. রাসায়নিক দমন

রাসায়নিক স্প্রে অপরিণত ক্যাটারপিলার দমনে বেশ কার্যকরী কিন্তু পরিণত ক্যাটারপিলার দমনে তেমন কার্যকরী নয়। আক্রমণ বেশি হলে ৫০০ মি.লি হারে বিপকর্ড ১০ ইসি/ডেসিস ২.৫ ইসি/ কুইনালফস ২৫ ইসি অথবা ২.২৫ লি. হারে ডাইমেথিয়ন ৪০ ইসি এর যে কোন একটি ৫০০ লি. পানিতে মিশিয়ে সম্পূর্ণ গাছ ও মাটিতে সিঞ্চন করতে হবে। সিঞ্চন অবশ্যই পড়ন্ত বিকেলে করা উচিত। তবে সন্তোষজনক দমনের জন্য ৭ দিনের মধ্যে অবশ্যই ২য় দফা সিঞ্চন করা বাঞ্ছনীয়। চা গাছের উপরের এবং মাঝের ক্যানোপির কচি ও পরিণত পাতায় সিঞ্চন করতে হবে। অবশ্যই পাতা চয়নের পর পরই সিঞ্চন করতে হবে।

(১১) কৃমিপোকা (Nematode, *Meloidogyne sp.*)

কৃমিপোকা নার্সারির প্রধানতম পেস্ট। এরা মাটিতে বাস করে। এরা আকারে অতিক্ষুদ্র ও আণুবীক্ষণিক। দেখতে সূতা বা সেমাই আকৃতির। কচি শেকড়ের রস শোষণ করে। ফলে শেকড়ে গিট তৈরি হয়। আক্রমণে চারা দুর্বল ও রুগ্ন হয়। পাতা হলুদ ও বিবর্ণ দেখায়। চারার বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

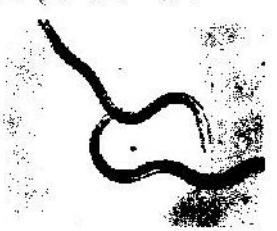

কৃমিপোকা

সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

১. ৬০-৬৫° সে. তাপমাত্রায় নার্সারির মাটি তাপ দিয়ে পুড়িয়ে এ কৃমিপোকা দমন করা যায়।
২. গাছ প্রতি ২৫০ গ্রাম হারে নিম কেক প্রয়োগ করেও ভাল ফল পাওয়া যায়।
৩. এছাড়া প্রতি ১ ঘনমিটার মাটিতে ফুরাডান ৫ জি ১৬৫ গ্রাম হারে অথবা ফারটেরা ০.৪ জি .....হারে অথবা রিজেন্ট ৩ জিআর .....প্রয়োগ করে কৃমিপোকা দমন করা যায়
৪. নার্সারির মাটিতে গুয়াতেমালা ও সাইট্রোনেলা গাছ লাগিয়ে পর্যায়ক্রমে ভালপিং করে মাটিতে নেমাটোডের সংখ্যা সন্ধিক্ষণ মাত্রার নিচে রাখা সম্ভব।

কীটতত্ত্ব বিভাগ নিয়ে দুটি কথা

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি বৃহত্তর সিলেট জেলার শ্রীমঙ্গলে ১৯৫৭ খ্রি. স্থাপন করা হয় Pakistan Tea Research Station (PTRS)। যা বর্তমানে বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (BTRI) নামে পরিচিত. প্রাথমিকভাবে ৩টি বিভাগ নিয়ে PTRS এর কার্যক্রম শুরু হয়। বিভাগ ৩ টি যথাক্রমে-

1. Chemistry-Meteorological Division
2. Agronomy-Botany Division
3. Plant Protection Division

জনাব খোরশিদ আকবর Plant Protection Division এ ২০.৬.১৯৫৯ খ্রি. Plant Pathologist পদে যোগদান করেন এবং Plant Protection এর বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। তৎকালীন Plant Protection Division এর অধীনে Entomology ও Plant Pathology নামে দুটি শাখা অন্তর্ভূক্ত ছিল। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত জনাব খোরশিদ আকবর বিভাগটি পরিচালনা করেন। ১৯৭০ সাল থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত উক্ত বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন জনাব মীর আহমদ আলী।

১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠানটি পূর্ণাঙ্গ ইনস্টিটিউটে রূপান্তর করে বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (BTRI) নামকরণ করা হয়। ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত Plant Protection নামেই বিভাগের কার্যক্রম চালু থাকে। এ সময় ১৯৭৪ সালে জনাব ডি.এল.সানা PSO পদে উক্ত বিভাগে যোগদান করেন এবং বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন বিশ্বের সমসাময়িক গবেষণার সাথে তাল রেখে ১৯৭৫ সালে Plant Protection Division এর নাম পরিবর্তন করে Pest Management নামকরণ করা হয়। ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত জনাব ডি.এল.সানা বিভাগীয় দায়িত্ব ছাড়াও পরবর্তীতে Associate Director পদ পর্যন্ত অলংকৃত করেন। জনাব ডি.এল. সানা অবসরে গেলে ১৯৯০ সালে বিভাগের দায়িত্ব পুনরায় অর্পিত হয় প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

জনাব মীর আহমদ আলী এর উপর। তিনি ১৯৯২ সাল পর্যন্ত বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন। এ সময় জনাব মীর আহমদ আলী অবসরে গেলে ১৯৯৩ সালে প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এম. ইকরামুল হক উক্ত বিভাগের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৯৫ এর প্রথম দিকে তিনি অবসরে গেলে SSO জনাব মাইনউদ্দীন আহমেদ চা বোর্ডের আদেশে উক্ত বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। ১৯৯৬ সালের এপ্রিল মাসে ড. মায়নুল হক উচ্চ শিক্ষা শেষে দেশে ফিরে এলে তিনি বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ১৯৯৮ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত Pest Management নামেই বিভাগটির কার্যক্রম চালু থাকে।

কাজের প্রকৃতি ও গুরুত্ব বিবেচনা করে চা বোর্ডের নির্বাহী আদেশে ১৯৯৮ সালে Pest Management Division কে Entomology ও Plant Pathology নামে ২টি পূর্ণাঙ্গ বিভাগে উন্নীত করা হয়। এ সময় Dr. Mainuddin Ahmed, Entomology Division এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। Entomology Division কীটপতঙ্গ, মাকড় ও নিমাটোড আধিক্য ও তাদের সমন্বিত দমন কৌশল নিয়ে কাজ করে থাকে। ১৯৯৮ সাল থেকে ২০১১ এর ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত Dr. Mainuddin Ahmed, Entomology Division এর দায়িত্ব পালন করেন পরবর্তীতে ১৭ অক্টোবর ২০১১খ্রি. হতে বিটআরআই-এর পরিচালক এর দায়িত্বে আসেন।

একাদশ অধ্যায়

কীটনাশক ও তৈরি চায়ে কীটনাশকের রেসিডিউ
(Pesticides and their residues in finished tea)

চায়ের পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণে কীটনাশক সমন্বিত পেস্ট ব্যবস্থাপনার অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে চায়ে কীটনাশকের ব্যবহার শুরু হয় ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে। তখন প্রথম উদ্ভাবিত কীটনাশক ডিডিটি চায়ের মশা এবং উইপোকা দমনে ব্যবহার করা হতো। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সরকার পেস্টিসাইডের বিষাক্ততা থেকে মুক্ত রাখতে বেশ কিছু বালাইনাশকের ক্রয়, বিক্রয় ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে, যেমন – হেপ্টাক্লোর, ক্লোরডেন, ডাইএলড্রিন, এলড্রিন, এনড্রিন, ডাইক্রোটোফস, মিথাইল ব্রোমাইড, ফসফামিডন, মনোক্রোটোফস, ডাইক্লোরোভস, ডিডিটি এবং লিন্ডেন যা 'ডার্টি ডজন' নামে পরিচিত। এসব নিষিদ্ধ কীটনাশক বাংলাদেশের চায়ে ব্যবহার না করতে বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে

চায়ে ব্যবহৃত বিভিন্ন কীটনাশকের মধ্যে অর্গানোক্লোরিন থেকে শুরু করে ৩য় জেনারেশন কীটনাশক যেমন- সিনথেটিক পাইরিথ্রয়েড পর্যন্ত ব্যবহার করা হচ্ছে। বর্তমানে চায়ের পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণে রিপকর্ড, ডেসিস, টাফগর, ম্যালাথিয়ন, ক্যাল্লিসো, ওমাইট, ম্যাজিস্টর, মাইট এক্সাভেঞ্জার, জিরোমাইট, সালফার, এবম, টলস্টার, ফুরাডান, ডার্সবান, এডমায়ার, রিজেন্ট ইত্যাদি কীটনাশক ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

বাংলাদেশের চায়ে কীটনাশকের ব্যবহার বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং এবং বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহযোগিতায় নিয়ন্ত্রণ ও নিশ্চিত করে থাকে চায়ের পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে অনুমোদিত কীটনাশক ও প্রয়োগ মাত্রা অনুসরণ করা উচিত।

বাংলাদেশ চায়ে বিটিআরআই কর্তৃক অনুমোদিত কতিপয় কীটনাশকের নাম ও প্রয়োগমাত্রা

কীটপতঙ্গের নাম	কীটনাশকের রাসায়নিক নাম	কীটনাশকের বাণিজ্যিক নাম	হেক্টর প্রতি প্রয়োগমাত্রা
লাল মাকড় স্কারলেট মাকড় পার্পল মাকড় পিংক মাকড়	প্রোপারজাইট এবামেকটিন সালফার প্রোপারজাইট + এবামেকটিন হেক্সিথায়াজক্স ফেনাজাকুইন	ওমাইট ৫৭ ইসি এজম ১.৮ ইসি কুমুলাস ৮০ ডিএফ এনার্জি ৮০ ডব্লিউজি জিরোমাইট ৪০ ইসি মাইট এক্সটেন্ডার ম্যাজিস্টার	১.০০ লি./১০০০লি. পানিতে ০.৫ লি./১০০০ লি. পানিতে ২.২৫কে./১০০০লি. পানিতে ২.২৫কে./১০০০লি. পানিতে ১.০০ লি./১০০০ লি. পানিতে ০.৫ লি./১০০০ লি. পানিতে ০.৬ লি./১০০০ লি. পানিতে
হেলোপেলটিস এফিড, জেসিড থ্রিপস, ফ্লাসওয়ার্ম	ম্যালাথিয়ন ডাইমেথোয়েট ফেনভালিরেট সাইপারমেথ্রিন ডেল্টামেথ্রিন ল্যামডা সাইহ্যালোথ্রিন থায়াক্লোপ্রিড ডাইমেথয়েট+সাই পারমেথ্রিন ডেলটামেথ্রিন+ ট্রায়াজোফস	ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি ডাইমেথিয়ন ৪০ ইসি সুমিসিডিন ২০ ইসি রিপকর্ড ১০ ইসি বাইজ ১০ ইসি ডেসিস ২.৫ ইসি ডেকর্ড ২.৫ ইসি ক্যারাটে ২.৫ ইসি ক্যালিপসো ২৪০এসসি জব্বার ৪৫ ইসি রেক্সটার ৩৬ ইসি	২.২৫ লি./৫০০ লি. পানিতে ২.২৫ লি./৫০০ লি. পানিতে ২.২৫ লি./৫০০ লি. পানিতে ০.৫ লি./৫০০ লি. পানিতে ০.৫ লি./৫০০ লি. পানিতে ০.৫ লি./৫০০ লি. পানিতে ০.৫ লি./৫০০ লি. পানিতে ০.৫ লি./৫০০ লি. পানিতে ০.৩৮ লি./৫০০ লি. পানিতে ০.৫ লি./৫০০ লি. পানিতে ০.৫ লি./৫০০ লি. পানিতে
উইপোকা	ক্লোরপাইরিফস ইমিডাক্লোপ্রিড ক্লোরপাইরিফস + সাইপারমেথ্রিন ফিপরোনিল	ডার্সবান ২০ ইসি হেমলক ২০ ইসি এডমায়ার ২০০ এসএল মুক্তি ২০০ এসএল কিংক্লোরোপিড ২০ এলএফ নাইট্রো ৫০৫ ইসি র‍্যাডনিল ৫০ এসসি রিজেন্ট ৫০ এসসি	১০.০ লি./১০০০ লি. পানিতে ১০.০ লি./১০০০ লি. পানিতে ১.৫ লি./১০০০ লি. পানিতে ১.৫ লি./১০০০ লি. পানিতে ১.৫ লি./১০০০ লি. পানিতে ৪.০ লি./১০০০ লি. পানিতে ১.৫ লি./১০০০ লি. পানিতে ১.৫ লি./১০০০ লি. পানিতে
কৃমিপোকা	কার্বোফুরান ফিপরোনিল রাইন্যাক্সিপির	ফুরাডান ৫ জি রাজফুরান ৫ জি ফিপ্তার ৩ জিআর ফার্টেরা ০.৪ জি	১৩৫ গ্রাম/১ ঘনমিটার মাটিতে ১৩৫ গ্রাম/১ ঘনমিটার মাটিতে ১৩৫ গ্রাম/১ ঘনমিটার মাটিতে ৭০ গ্রাম/১ ঘনমিটার মাটিতে

২০১৫ সালে বাংলাদেশে বিভিন্ন ফসলে মোট ৩৩,৩৭১.৬০ টন কীটনাশক পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যান্য ফসলের ন্যায় বাংলাদেশ

চায়েও এসব কীটনাশকের ব্যবহার দিন দিন বেড়েই চলছে। দশ বছরের (২০০৬-২০১৫) এক জরিপে দেখা গেছে যে, ২০০৬ সালে বাংলাদেশ চায়ে ব্যবহৃত বিভিন্ন কীটনাশকের মধ্যে থায়োডান, ইথিয়ন, রিপকর্ড, ওমাইট এবং ফুরাডান এর ব্যবহার ছিল যথাক্রমে ৩০,৭৫০ লিটার, ৫,৫০০ লিটার, ৫,০০০ লিটার, ১৮,৬৫০ লিটার এবং ১,৪০০ কেজি। উল্লেখ আবশ্যক যে, চায়ে ২০১০ সালে থায়োডান এবং ২০১১ সালে ইথিয়ন এর ব্যবহার বন্ধ হয়ে যায়। তবে ২০১৫ সালে অন্যান্য কীটনাশক যেমন– টাফগর ২৫,৫৪০ লিটার, রিপকর্ড ১৫,৫০০ লিটার, রাইনেট ১০,৪০০ লিটার, একিস ২০,৬৬০ লিটার, ডেসিস ৩৫,৫০০ লিটার, ক্যারাটে ১৫,৫০০ লিটার, কার্বোসো ১৫,৫০০ লিটার এবং ফুরাডান ১৫,৫০০ কেজি ব্যবহৃত হয়েছে। দশ বছরে সকল কীটনাশকের ব্যবহার প্রায় ২.৫ থেকে ৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে

চা যেহেতু একটি খাদ্য/পানীয় সামগ্রী, তাই তৈরি চায়ে এসব বালাইনাশকের প্রভাব মানব দেহের জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে। বাংলাদেশে উৎপাদিত চা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে পশ্চিম ও পূর্ব ইউরোপিয়ান দেশসমূহে এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে রফতানি হয়ে থাকে। আমদানিকারক দেশসমূহও তৈরি চায়ে পেস্টিসাইডের রেসিডিউ সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন বর্তমান বিশ্বে তৈরি চায়ে পেস্টিসাইড রেসিডিউ মাত্রা প্রধান ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে চায়ের উৎপাদন ও রফতানির ক্ষেত্রে আমেরিকার ইনভায়রনমেন্টাল প্রটেকশন এজেন্সি (ইপিএ), ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, ফুড এন্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন (এফএও) এর কোডেক্স কমিশন, ওর্য়াল্ড হেল্‌থ অর্গানাইজেশন (ডব্লিউএইচও) জার্মান ল, জাপানসহ অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থা কিছু বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে। অর্থাৎ তৈরি চায়ে সর্বোচ্চ রেসিডিউ মাত্রা (এমআরএল) নির্ধারণ করে দিয়েছে

চা খাদ্য সামগ্রী বিধায় আবাদি চা'তে পাতা চয়নের পরেই কেবলমাত্র কীটনাশক স্প্রে করা যেতে পারে বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউটের একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, চা আবাদিতে কীটনাশক স্প্রে করার পর কমপক্ষে ৭-৮ দিন অপেক্ষাকাল বিবেচনায় নিলে তৈরি চায়ে কীটনাশকের বিষকণা সহনশীল মাত্রার আওতায় থাকে যা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত এমআরএল এর মাত্রা অতিক্রম করে না। তাই চা আবাদিতে কীটনাশক স্প্রে করার কমপক্ষে ৭ দিন পর পাতা চয়ন করতে হবে অন্যথায় তৈরি চায়ে কীটনাশকের অসহনীয় বিষকণার মাত্রা শরীরের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের আর্থিক সহায়তায় গবেষণার মাধ্যমে বিভিন্ন

কীটনাশকের নিরাপদ পাতা চয়ন কালও নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে। গবেষণালব্ধ ফলাফল বিভিন্ন দেশি-বিদেশি কর্মশালায় উপস্থাপিত হয়েছে ও জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। ২০০৯ সালে বিশ্বখাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) ইন্টার-গভর্নমেন্টাল গ্রুপ (আইজিজি) কর্তৃক আন্তর্জাতিক এমআরএল নির্ধারণের লক্ষ্যে রিং টেস্টের জন্য বিশ্বের আন্তর্জাতিক মানের ১১টি ল্যাবরেটরির মধ্যে বিটিআরআই এর রেসিডিউ ল্যাবরেটরিকে নির্বাচন করা হয়েছে

বর্তমানে এ ল্যাবরেটরি বছরে প্রায় ২০০টি চায়ের নমুনার রেসিডিউ বিশ্লেষণ করতে সক্ষম ইতোমধ্যে চা বাগানসমূহ, চা বিপণন কোম্পানি, কীটনাশক বিপণন কোম্পানিসমূহ এ সুবিধা পেয়ে আসছে। বিভিন্ন চা বাগান যেমন- ডানকান ব্রাদার্স, ফিনলে, ইস্পাহানি, কাজী এন্ড কাজী এবং আবুল খায়ের গ্রুপ, একমি বেভারেজ লিমিটেডসহ অনেক চা বিপণন কোম্পানি প্রদত্ত তৈরি চায়ের অসংখ্য নমুনা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশ্লেষিত চায়ের কোন নমুনাই ইপিএ, কোডেক্স কমিশন/খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন/ইইসি, জাপান এবং জার্মান ল কর্তৃক নির্ধারিত সর্বোচ্চ রেসিডিউ মাত্রা (এমআরএল) অতিক্রম করেনি তাই বলা যায় বাংলাদেশের চা এখনও অতি নিরাপদ।

বালাইনাশক অবশেষ (Pesticide Residue)

তৈরি চায়ে বালাইনাশকের অবশেষ বলতে মাঠ পর্যায়ে পোকামাকড় ও রোগবালাই দমনে যে কীটনাশক ব্যবহার করা হয় তার অবশেষ কতটুকু তৈরি চায়ে থেকে যায় তা বুঝায়।

চা গাছে বিভিন্ন সময় কীটপতঙ্গ ও রোগ-বালাইয়ের আক্রমণ হয়। সে কারণে সময় সময় বিভিন্ন বালাইনাশক প্রয়োগ করা হয় তাই কারখানায় তৈরি চা'তে বালাইনাশকের কিছুটা উপস্থিতি থাকাই স্বাভাবিক। এ উপস্থিতিকে বালাইনাশক অবশেষ বা Pesticide Residue বলা হয়। চা একটি পানীয় বিধায় এর পুরোটাই মানব শরীরে গৃহীত হয় তাই তৈরি চা'তে বালাইনাশকের উপস্থিতি মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকরও বটে। কিছুদিন পূর্বেও বাংলাদেশের চা পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপীয় বিভিন্ন দেশে এবং মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রফতানি করা হত। সেসব দেশের ভোক্তারা তৈরি চায়ে কীটনাশকের উপস্থিতির ব্যাপারে খুবই সচেতন এরই প্রেক্ষাপটে EPA/ Codex Alimentarious/ FAO/ WHO, জার্মান Law ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান চা উৎপাদন এবং বিপণনে বালাইনাশক অবশেষের উপস্থিতির উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে। উল্লেখ্য যে কীটনাশক/বালাইনাশককে একই অর্থে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

যেহেতু বাংলাদেশ FAO কর্তৃক বালাইনাশকের বিস্তৃতি এবং ব্যবহারের উপর প্রণীত আইন কানুনে (Code of conduct) স্বাক্ষরদানকারী একটি দেশ, সেহেতু এটি FAO কর্তৃক সংজ্ঞায়িত IPM অনুযায়ী বালাইনাশকের বিধিমালা মেনে চলতে সচেষ্ট। যাতে পরিবেশবান্ধব ন্যূনতম– বালাইনাশকের ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। তাছাড়া বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে বেশ কিছু বালাইনাশক নিষিদ্ধ করেছে যা নিচের সারণিতে উল্লেখ করা হলঃ

"Dirty Dozens" এর আওতায় নিষিদ্ধ	সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ
হেপ্টাক্লোর (Heptachlor)	ডাইসালফোটন (Disulfoton)
ক্লোরডেন (Chlordane)	মিথাইল প্যারাথিয়ন (Methylpharathion)
ডাইএলড্রিন (Dieldrin)	ফসমেট (Phosmate)
অলড্রিন (Aldrin)	বিএইচসি এন্ড এইচসিএইচ (BHC & HCH)
এনড্রিন (Endrin)	মেফোসফোলান (Mephosfolan)
ডাইক্রোটোফস (Dicrotophos)	
মিথাইল ব্রোমাইড (Methylbromide)	
ফসফামিডন (Phosphamidon)	
মনোক্রোটোফস (Monocrotophos)	
ডাইক্লোরভস (Diclorvos)	
মিথামিডোফস (Methamidophos)	
ডিডিটি (DDT)	
লিনডেন (Londane)	
ইথাইল প্যারাথিয়ন (Ethylparathion)	
২, ৪, ৫-টি (2, 4, 5-T)	
ক্যামফিক্লোর (Campheechlor)	
ক্লোরডিমিফর (Chlordimefor)	
পরথেন (Perthane)	

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তৈরি চা'য়ে কীটনাশকের অবশেষ নির্ধারিত মাত্রার চেয়ে কমই থাকে। এদেশের চা বাগান মালিক/ব্যবস্থাপকগণ কীটনাশক সিঞ্চনে সব সময় আর্থিক দিক বিবেচনায় রাখেন। বাগান মালিক বা ব্যবস্থাপকগণ বিটিআরআই এর পরামর্শও যথেষ্ট আমলে নিয়ে থাকেন। তাছাড়া এদেশের আবহাওয়া, বাতাসের গতিবেগ, সূর্যকিরণ, বৃষ্টিপাত, আপেক্ষিক আর্দ্রতা, তাপমাত্রা, কীটনাশকের ভৌত রাসায়নিক ধর্ম ও তৈরির ধরণ অবশেষ হিসেবে থাকায় সহায়ক নয়।

এছাড়া কীটনাশকের বাষ্পীয় চাপ (vapour pressure), Log Kow এর মান এবং উদ্ভিদের বহিঃত্বক থেকে ধাপাদের পরিমাণও অবশেষকে নিঃশেষ হতে সহায়ক ভূমিকা রাখে। আরও বিস্তারিতভাবে বলা হয় যে, বাংলাদেশে বহুল ব্যবহৃত EC

formulation কীটনাশক সহজেই উদ্ভিদের পানির কণার সাথে মিশে গিয়ে কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এমনকি প্রখর রোদ ও আলোর তীব্রতা কীটনাশকের কার্যক্ষমতা কমাতে সহায়ক।

চা ফসলের বৃদ্ধির ধাপ, বৃদ্ধির হার, দুটি পাতা একটি কুঁড়ির গায়ে মোমের স্তর, বহিঃস্তর, এমনকি চা গাছের ঊর্ধ্ব, মধ্য ও নিম্ন canopy কাঠামোও কীটনাশক অবশেষের মাত্রা ক্ষীণ পর্যায়ে নিতে অগ্রণী ভূমিকা রাখে।

আশার কথা যে, আমরা পানি ও চাঁকে একসাথে প্রায় ৮০°–৯০° সে. তাপমাত্রায় ফুটিয়ে নির্যাস বা লিকার তৈরি করে পান করে থাকি। এত উচ্চ তাপেও কীটনাশকের অবশেষ নিঃশেষ হতে থাকে

LD_{50} মান

LD_{50} হচ্ছে এমন একটি মান যা বালাইনাশকের বিষাক্ততা বা কার্যক্ষমতা নির্ধারণে ব্যবহৃত হয়। গবেষণাগারের উপযুক্ত পরিবেশের আওতায় পরীক্ষাধীন কীটপতঙ্গ ও রোগবালাইসমূহের উপর মধ্যমস্তরের একটি মাত্রা প্রয়োগে ৫০% পরীক্ষাধীন জীবসংখ্যা (test organism) মারা গেলে সে বালাইনাশকের কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়; পরীক্ষাধীন জীবের দেহের ওজনের প্রতি কেজিতে কত মিলিগ্রাম অর্থাৎ mg/kg হিসাবে বিষাক্ত দ্রব্যটির পরিমাণ বের করা হয়। LD_{50} মান যত বেশি হয়, বালাইনাশক ততই নিরাপদ হয়, অন্যভাবে বলা যেতে পারে LD_{50} মান যত কম হয়, যৌগটি ততবেশি বিষাক্ত হয়।

বালাইনাশকের প্রকারভেদ

প্রকারভেদ	মান mg/kg (দেহের ভর অনুসারে)	
	LD_{50} (মৌখিক)	LD_{50} (ত্বকীয়)
অত্যধিক বিষাক্ত	1-50	1-2000
উচ্চমাত্রায় বিষাক্ত	51-500	201-2000
মধ্যম বিষাক্ত	501-5000	2001-20000
সামান্য বিষাক্ত	>5000	>20000

অবশেষমুক্ত চা তৈরি করার কৌশল

১. বালাই আক্রান্ত এলাকা পরিদর্শন।
২. বালাই সম্পর্কে জীবতাত্ত্বিক তথ্য।
৩. যথাযথ বালাইনাশক নির্বাচন।
৪. বালাইনাশকের যথাযথ মিশ্রণ তৈরি।
৫. বালাইনাশকের উপযুক্ত মাত্রা নির্ধারণ।
৬. বালাইনাশক প্রয়োগের উপযুক্ত সময় নির্বাচন।

৭. বালাইনাশকের যথাযথ প্রয়োগকৌশল।
৮. বার বার স্প্রে করা থেকে বিরত থাকা।
৯. বালাইনাশকসমূহকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা।
১০. যত কম সম্ভব ঠান্ডা আবহাওয়ায় বালাইনাশক প্রয়োগ।

বালাইনাশকের কার্যক্ষমতা হ্রাসের কারণসমূহ

১. আবহাওয়ার প্রভাব
২. সূর্যালোকের প্রখরতা
৩. প্রতি ঘন্টায় বায়ুর গতিবেগ (km/h)
৪. বৃষ্টিপাত (mm)
৫. আর্দ্রতা (%)
৬. তাপমাত্রা (C^0)
৭. বালাইনাশকের উপাদান
৮. বালাইনাশকের ভৌত-রাসায়নিক গুণাবলী

বালাইনাশকের ভৌত গুণাবলী নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর নির্ভর করে –

১. বাষ্প চাপের উপর।
২. কীটনাশকের Partitioning ক্ষমতার উপর
৩. বহিঃত্বকের মধ্য দিয়ে ব্যাপনের ফলে উদ্ভিদের দেহে প্রবেশের উপর।

বালাইনাশকের ইতিবাচক রাসায়নিক গুণাবলী ইহার অবশেষ মাত্রার পরিমাণ নিম্নলিখিত উপায়ে সহজে হ্রাস করে

১. জল বিয়োজন (Hydrolysis)
২. জারণ (Oxidation)
৩. সালোক বিভাজন (Photolysis)

বালাইনাশকের অবশেষ মাত্রা শস্যের নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর নির্ভর করে

১. বৃদ্ধির পর্যায়ের উপর
২. বৃদ্ধির হারের উপর
৩. পত্র-পল্লবের প্রকৃতির (বহিঃত্বকের গাঢ় মোমের আবরণ, রোম ইত্যাদি) উপর।
৪. ক্যানোপির আকৃতির উপর।

রাসায়নিক অবশেষের উপর ক্ষতির প্রভাব

ছিটানোর যথাযথ কৌশল এবং সময়ের উপর বালাইনাশকের কার্যকরিতা নির্ভর করে। পত্র-পল্লবের মধ্যে বালাইনাশকের স্বল্প উপস্থিতি দ্রুত বালাইনাশে কার্যকর ভূমিকা রাখে যা শস্য সংগ্রহের কিছুদিন পূর্বে প্রয়োগ করা হয়।

বালাইনাশক ছিটানোর পরবর্তী জলবায়ুর উপাদান যা বালাইনাশকের উপস্থিতিকে প্রভাবিত করে

১. বায়ুপ্রবাহ
২. বৃষ্টিপাত
৩. তাপমাত্রা
৪. আপেক্ষিক আর্দ্রতা
৫. মৃত্তিকা এবং পত্র-পল্লবে ক্রিয়াশীল পরিবর্তনশীল আবহাওয়া।

বালাইনাশক যৌগের ভৌত-রাসায়নিক ধর্মাবলী

১. উদ্বায়িতা (Volatility)
২. পাতার বহিত্বক দ্বারা পাতার কলায় প্রবেশ এবং পরবর্তী বিপাক ক্রিয়া, পানিতে দ্রবণীয়তা।
৩. সালোক বিভাজন, জারণ এবং জলবিয়োজনের মাধ্যমে রাসায়নিক ধর্ম পরিবর্তনশীলতা।

গঠন (Formulation)

প্রায়ই বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে বালাইনাশকের উপস্থিতি নিম্নলিখিত ক্রম অনুযায়ী হ্রাস পায় –

UL deposit <emulsion deposits <wettable powder deposits <dusts.

স্টিকার বা অ্যাডজুভেন্টসমূহ পাতার উপর অবশেষ সৃষ্টি বা জমা হওয়াকে ত্বরান্বিত করতে পারে। তাছাড়া দানাদার বালাইনাশকের উপাদানের আকৃতি বাষ্পমোচনের হারকে প্রভাবিত করে –

চায়ের বালাইনাশক অবশেষ জরিপ, ১৯৯২-৯৩

ক্রমিক নং	দেশ	নমুনা সংখ্যা		ক্ষতিকর বালাইনাশক
		বিশ্লেষিত	নিরূপণ	
১।	আর্জেন্টিনা	৩	-	
২	ভারত			
	আসাম	৪৫	২৭	ইথিয়ন + ডাইকোফল
	দার্জিলিং	১৬	১৫	ডাইকোফল (ইথিয়ন)
	দক্ষিণ ভারত	৯	৯	ডাইকোফল + ইথিয়ন +
	মোট(ভারত)	৭০	৫১	কুইনালফস এবং এন্ডোসালফান-ফস মিথাইল

৩	বাংলাদেশ	১১	৬	--
৪	ব্রাজিল	৪	০	-
৪।	চীন	১০	৪	ডাইকোফল
৫	ইন্দোনেশিয়া	১৩	২	--
৭।	কেনিয়া	৬৩	২	--
৮।	মালাউয়ি	৫	০	--
৯।	মরিশাস	৫	০	--
১০	শ্রীলংকা	১৫	৩	--
১১।	তানজানিয়া	৪	০	-
১২	ভিয়েতনাম	৮	২	ডিডিটি
১৩।	জিম্বাবুয়ে	৫	০	--
	মোট	২১৬	৭০	--

বাংলাদেশীয় চায়ে বালাইনাশক অবশেষ জরিপ

বালাইনাশক	নমুনা সংখ্যা	বালাইনাশক মাত্রা		
		সর্বনিম্ন	গড়	সর্বোচ্চ
ব্রোমোপ্রোপাইলেট (নিওরন ৫৩০ ইসি)	৪	১৬	৩৩	৭৩
এন্ডোসালফেন (থায়োডন ৩৫ ইসি)	২	১৩	১৯	২৫

তৈরি চায়ে mg/kg (পিপিএম) EPA, Codex Commission, EEC/EU এবং German Law থেকে প্রাপ্ত কতিপয় বালাইনাশকের MRL

টেকনিক্যাল নাম	EPA	Codex Comm	EEC/EU	German Law	মন্তব্য
Dicofol	৪৫	৮	০.১	২	ব্যবহার করা হয় না
Ethion	১০	৫	২ (প্রস্তাবিত ০.১)	-	ব্যবহার করা হয় না
Sethion	১০	৫	২ (প্রস্তাবিত ০.১)	-	ব্যবহার করা হয় না
Bromopropylate	-	৫	-	০.১	সীমিত ব্যবহার
Dimethoate	-	-	০.২	-	সীমিত ব্যবহার
Endosulfan	-	২৪	৩০	৩০	ব্যবহার করা হয় না
Fenvalerate	-	-	০.১	-	সীমিত ব্যবহার
Cypermethrin	-	-	০.১	-	সীমিত ব্যবহার
Deltamethrin	-	-	৫	০.১	সীমিত ব্যবহার
Chlorpyrifos	-	-	০.১	-	সীমিত ব্যবহার
Propargite	-	-	০.১	-	সীমিত ব্যবহার
Malathion	-	-	০.১	-	সীমিত ব্যবহার

বিটিআরআই এ বিদ্যমান বিশ্লেষণ সুবিধা (Analytical facilities)

বর্তমানে বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউটে একটি আধুনিক এবং সুসজ্জিত পেস্টিসাইড রেসিডিউ ল্যাবরেটরি স্থাপিত হয়েছে এবং সুপ্রশিক্ষিত গবেষক/বিজ্ঞানীগণ তার দায়িত্বে রয়েছেন। বিভিন্ন বালাইনাশকের আন্তর্জাতিকমানের বিশ্লেষণ এখানে সম্ভব এ সকল বালাইনাশকের মধ্যে রয়েছে অরগানোক্লোরিন, অরগানোফসফেট, কর্বামেট, পাইরিথ্রয়েড এবং অশ্রেণিবিন্যস্ত গ্রুপের কিছু বালাইনাশক। এসকল বিশ্লেষণের ফলাফল মাঠ এবং ল্যাবরেটরিতে অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হয়েছে। চা শিল্প ইতোমধ্যে এ থেকে উপকৃত হতে শুরু করেছে। এই সুবিধা এখন চা শিল্পের জন্য উন্মুক্ত। তারা এখন সম্পূর্ণ সুবিধা নিয়ে আন্তর্জাতিক পেস্টিসাইড এমআরএল রেগুলেশন (International Pesticide MRL Regulation) এর পরিপূর্ণ স্বীকৃতি অর্জনের মাধ্যমে চা রফতানিতে প্রত্যয়ী হতে পারেন।

বাংলাদেশীয় চা উৎপাদক এবং ব্যবসায়ীগণের ভূমিকা

চা একটি উদ্দীপক পানীয়। উন্নত বিশ্বে চা-পানকারী জনগোষ্ঠী স্বাস্থ্য সম্পর্কে খুবই সচেতন। তারা তাদের খাদ্যে কীটনাশক বা বালাইনাশকের উপস্থিতির জন্য ক্ষতি সম্পর্কে সজাগ। এমনকি আমাদের দেশীয় চা-পানকারীগণ এ ব্যাপারে বর্তমানে আগের চেয়ে অনেক বেশি সচেতন। অর্গানিক খাদ্যের প্রতি তাঁরা ঝুঁকছেন। মধ্যপ্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যে অনেক দেশে আমাদের দেশ থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে চা রফতানি হয়। চায়ের এ সকল সচেতন গ্রাহক সম্পর্কে আমাদের সজাগ থাকতে হবে। কাজেই আমাদের উৎপাদক এবং ব্যবসায়ীগণকে মাঠপর্যায়ে এবং কারখানাপর্যায়ে চায়ের গুণগতমান বজায় রাখা সম্পর্কে সচেতন হতে হবে যাতে চায়ের ব্যবসা হোঁচট না খায়। তাঁরা বিটিআরআই-এ যোগাযোগ করে বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধার সদ্ব্যবহার করে লাভবান হতে পারেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

চা গাছের রোগ-বালাই ও দমন পদ্ধতি
(Tea diseases and their control measures)

প্রাপ্তবয়স্ক, অপ্রাপ্তবয়স্ক কিংবা চারা অবস্থায় চা-গাছ বিভিন্ন রোগ-বালাই দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে। সাধারণত ছত্রাক ও শৈবাল জাতীয় জীবাণু দ্বারা চা-গাছের রোগসমূহ সংগঠিত হয়ে থাকে। রোগের প্রাদুর্ভাব সব সময় সমানভাবে হয় না। অনেক সময় ব্যাপক আকার ধারণ করে চায়ের প্রভূত ক্ষতিসাধন করে থাকে। সাধারণত পোকা-মাকড়ের ক্ষতি দৃশ্যমান। কিন্তু রোগবালাইয়ের ক্ষতি কখনো কখনো চোখে পড়ে না। তাই এদের গুরুত্ব কম দেয়া হয় এবং অনেক সময় এদের ক্ষতির মাত্রাও নিরুপণ করা যায় না। সঠিক জ্ঞান থাকলে প্রতিটি রোগের লক্ষণ (symptom) দেখে এদের চিহ্নিত করা যায়। আক্রান্ত রোগটি চিহ্নিত করতে পারলে তা দমন করা সহজ হয় ও এদের ক্ষতি থেকে গাছকে বাঁচানো এবং শস্য ক্ষতি এড়ানো সম্ভব হয়। চায়ের রোগবালাইয়ের কারণে প্রায় ১০-১৫% চায়ের ফলন কমে যায়। বাংলাদেশে চায়ে ২২টি রোগবালাই সনাক্ত করা হয়েছে। আবহাওয়ার তারতম্যের কারণে বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রোগবালাই এর প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। এদের প্রাদুর্ভাব বাগান হতে বাগানে, সেকশন হতে সেকশনে ভিন্নতর হতে পারে। এমনকি একই গাছের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন প্রকার রোগবালাই দ্বারাও আক্রান্ত হতে পারে। আক্রমণের অবস্থান অনুযায়ী চায়ের প্রধান প্রধান রোগবালাইয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও প্রতিকার নিম্নে বর্ণনা করা হল।

ক) চা গাছের প্রধান প্রধান রোগ-বালাই

সাধারণত বিভিন্ন রোগজীবাণু গাছের বিভিন্ন অঙ্গ আক্রমণ করে থাকে। বাংলাদেশের আবহাওয়ায় যে সমস্ত রোগজীবাণু চা গাছের গোড়া থেকে কচি কিশলয় পর্যন্ত বিভিন্ন অঙ্গ আক্রমণ করে রোগ সৃষ্টি করে থাকে তাদেরকে গাছের অবস্থান ভেদে তিনভাগে ভাগ করে বিভিন্ন অংশের প্রধান প্রধান রোগবালাইসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে উল্লেখ করা হল-

পাতা ও গাছের অগ্রভাগের রোগ-বালাই

১) গল ডিজিজ বা গুটি রোগ
২) ডাই ব্যাক বা আগা মরা রোগ
৩) ব্লাকরট বা পাতা পচা রোগ
৪) ব্রাউন ব্লাইট বা বাদামি পাতা পোড়া রোগ
৫) গ্রে লিফ স্পট বা পাতায় ধূসর ক্ষুদ্র দাগ এবং
৬) ব্লিস্টার ব্লাইট বা পাতার ফোঁসকা রোগ।

ডালপালা ও গাছের মধ্যভাগের রোগ-বালাই

১) রেড রাস্ট বা লাল মরিচা রোগ
২) ব্রাঞ্চ ক্যাঙ্কার বা ডালপালার ক্ষত রোগ
৩) হর্স হেয়ার ব্লাইট এবং
৪) থ্রেড ব্লাইট রোগ ইত্যাদি।

গোড়া ও গাছের নিম্নভাগের রোগবালাই

১) চারকোল স্ট্যাম্প রট বা অংকার রোগ
২) কলার রট বা গোড়া পচা রোগ
৩) ভায়োলেট রুট রট বা বেগুনি শেকড় পচা রোগ এবং
৪) পারপল রুট রট ইত্যাদি।

১) পাতা পচা বা ব্ল্যাক রট (Black rot)

ব্ল্যাক রট রোগ চা আবাদি এলাকায় পাতা চয়নতলের নিম্নভাগের পরিণত পাতাসমূহে আক্রমণ করে। *Corticium invisum* (Petch.) এবং *C. theae* নামক ছত্রাক দ্বারা এ রোগ সংগঠিত হয়। মে, জুন এবং জুলাই মাসে মাঠে এ রোগ বেশি দেখা যায়। প্রবল বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত ও পাতা চয়নকারীদের ব্যবহৃত কাপড় এবং ঝুড়ির মাধ্যমে এ রোগের বিস্তার ঘটে। অত্যধিক ছায়া, আর্দ্র ও স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া এবং প্রুনিং এর সময় গাছের উপর রেখে যাওয়া প্রুনিং লিটার ইত্যাদি এ রোগের প্রাদুর্ভাবের জন্য সহায়ক।

এ রোগের কারণে পাতাগুলো প্রথমে হালকা বাদামি রং ধারণ করে ও ক্রমশ রং পরিবর্তিত হয়ে কাল হতে থাকে। পাতার মাঝের অংশ ও কিনারা ধূসর বাদামি বর্ণে পরিণত হয়। ভেজা অবস্থায় কাল দেখা যায়। কোন কোন সময় মরা পাতা ছত্রাকের মাইসেলিয়াম এর সাহায্যে ডালের সঙ্গে ঝুলে থাকে বা পাতার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। **প্রতিকার:** রোগের জীবাণু সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস না হলে প্রত্যেক বছরেই এ রোগ দেখা দিতে পারে। এরূপ অবস্থায় গাছ দুর্বল হয় এবং পাতার উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায়।

প্রতিকার হিসাবে প্রথমে রোগাক্রান্ত গাছগুলো চিহ্নিত করতে হবে। যতটুকু সম্ভব আক্রান্ত পাতাগুলো হাত দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। আক্রান্ত পাতাগুলো পুড়িয়ে বা গর্তে পুতে ফেলা উত্তম। প্রুনিং এর সময় প্রুনিং লিটারগুলোও সতর্কতার সাথে সরিয়ে অন্যত্র পুড়িয়ে বা গর্তে পুতে ফেলা উচিত। রাসায়নিক প্রতিকার হিসেবে হেক্টর প্রতি ৭৫০ গ্রাম নোইন ৫০ ডব্লিউ পি (কার্বেন্ডাজিম জাতীয়) অথবা ২.৮ কেজি কুপ্রাভিট ৫০ ডব্লিউ পি (কপার জাতীয়) ছত্রাকনাশক ১,০০০ লিটার পানিতে মিশিয়ে পুরো গাছে ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। পুরোপুরিভাবে এ রোগের প্রতিকারকল্পে ১৫ দিন অন্তর ২/৩ বার উক্ত ছত্রাকনাশক ভালভাবে প্রয়োগ করতে হবে রোগাক্রান্ত এলাকায় প্রয়োজনাতিরিক্ত ছায়া গাছ ছাঁটাই করে কমিয়ে দেয়া ভালো। নালা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সেকশন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। পরপর ২/৩ বছর এভাবে ব্যবস্থা নিলে এ রোগ নির্মূল করা সম্ভব হয়।

২) ডাই ব্যাক বা আগা মরা রোগ (Die back)

সাধারণত সব বয়সের চা গাছ এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। তবে নার্সারি ও মাতৃবৃক্ষে (mother bush) আক্রমণ করলে ক্ষতির পরিমাণ বেশি পরিলক্ষিত হয়ে থাকে চয়নকৃত এলাকায় নিয়মিত পাতা চয়ন করা হয় বলে এ রোগ এসব এলাকায় কম হয়। চারা বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক গাছকে আক্রমণ করলে অনেক সময় গাছ বাঁচানো কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। মাদার বুশকে আক্রমণ করলে কাটিং এর পরিমাণ কমে যায় *Colletotrichum gloeosporioides* (Penz.) নামক ছত্রাক দ্বারা এ রোগ সংগঠিত হয়। জুলাই - অক্টোবর মাসে এ রোগ বেশি দেখা যায়। প্রবল বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত, শিশির, কীটপতঙ্গ ইত্যাদির মাধ্যমে এ রোগের বিস্তার ঘটে। মাটিতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ সারের অভাব, জলাবদ্ধতা, অত্যধিক ছায়া, আর্দ্র ও স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়া এ রোগের প্রাদুর্ভাবের জন্য সহায়ক।

এ ছত্রাকের আক্রমণে প্রথমে কচি ডগায় ছোট ছোট বাদামি দাগ পড়ে। আস্তে আস্তে দাগগুলো বড় হতে থাকে ও হলুদাভ হয়। পরবর্তীতে এ দাগ আক্রমণের স্থান থেকে উপর ও নিচে (১- ১.৫) উভয় দিকে বর্ধিত হয়ে ধূসর বাদামি বা কালো রং ধারণ করে। এ কালো দাগ ক্রমশ আক্রান্ত কিশলয়ের নিচের দিকে বৃদ্ধি পেতে থাকে। বাড়ন্ত মুকুল (axillary bud) প্রস্ফুটিত হতে পারে না। ফলে বাড়ন্ত মুকুল (axillary bud), পাতাসমূহ ও ডালপালা আস্তে আস্তে সজীবতা হারিয়ে শুকিয়ে যায় এবং মারা যায়। গাছের বা ডালের আগা হতে গোড়ার দিকে ক্রমশ আক্রান্ত ডাল-পালাগুলো মারা যায় বিধায় এ রোগকে ডাই ব্যাক বা আগা মরা রোগ বলা হয়

প্রতিকার: প্রাথমিক পর্যায়ে এ রোগ দমনের সঠিক ব্যবস্থা না নিলে রোগের প্রাদুর্ভাব দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। রোগের আক্রমণ দেখা মাত্রই রোগ সংগঠিত হওয়ার অনুকূল নিয়ামকসমূহ প্রতিরোধে ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। রোগাক্রমণ অল্প এলাকায়

হলে এবং সম্ভব হলে আক্রান্ত অংশের সামান্য নিচে ধারালো চাকু দিয়ে কেটে রোগাক্রান্ত অংশটি অপসরণ পূর্বক প্রতি লিটার পানিতে ২.৮ গ্রাম পরিমাণ কুপ্রাভিট ৫০ ডব্লিউপি ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। আক্রান্ত এলাকা বেশি হলে হেক্টর প্রতি ৭৫০ গ্রাম নোইন ৫০ ডব্লিউপি (কার্বেন্ডাজিম জাতীয়) অথবা ২.৮ কেজি কুপ্রাভিট ৫০ ডব্লিউ পি ছত্রাক নাশক ১০০০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ভলভাবে সিঞ্চন করতে হবে। সফলভাবে এ রোগ দমনার্থে ১৫ দিন পর দ্বিতীয়বার উক্ত ছত্রাকনাশক সিঞ্চন করা বাঞ্চনীয়।

৩) লাল মরিচা রোগ (Red rust)

অপ্রাপ্ত অথবা প্রাপ্ত বয়স্ক সব বয়সের চা গাছ এ রোগদ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। *Cephaleuros parasiticus* (Karst.) নামক শৈবাল দ্বারা এ রোগ সংগঠিত হয়। ইহা চায়ের একমাত্র শেওলা জাতীয় রোগ। বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করে মধ্য মার্চ থেকে মধ্য এপ্রিলে এ রোগ দেখা যায়। অক্টোবর মাস পর্যন্ত এ রোগের প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হয়। বৃষ্টিপাত, শিশির, ঝড়োবাতাস, সেচশনে গবাদি পশুর অবাধ চলাচল এবং বৃষ্টির পানি বা স্প্রিংকলার জাতীয় সেচ ইত্যাদির মাধ্যমে একস্থান হতে অন্যস্থানে অথবা একগাছ হতে অন্যগাছে এ রোগ বিস্তার লাভ করে। মাটিতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ সারের অভাব, জলাবদ্ধতা, অপর্যাপ্ত নালা ব্যবস্থা, অত্যধিক আগাছা, খরা ও অপর্যাপ্ত ছায়া ব্যবস্থা এ রোগ বিস্তারের জন্য দায়ী। বগামেডুলা নামক অস্থায়ী ছায়া গাছও এ রোগে আক্রান্ত হয় বিধায় অন্যতম পোষক হিসাবে কাজ করে।

সাধারণত এক বছরের অধিক বয়স্ক ডালে এ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। রোগাক্রান্ত ডাল বা কান্ডের উপর লাল/কমলা রংয়ের চুলের মত অঙ্গানু সৃষ্টি হয়। তখন এর আক্রান্ত এলাকাগুলো মরিচার মত দেখায় বিধায় একে লাল মরিচা রোগ বা রেড রাস্ট বলা হয়। আক্রান্ত কান্ডের পাতাগুলো হলুদ-সবুজের ছোপ ছোপ (Variegated leaf) অবস্থায় প্রকাশ পায়। পাতায় হলুদ-সবুজের (Variegated) অবস্থা দেখলেই প্রাথমিকভাবে বোঝা যায় লালমরিচা রোগের লক্ষণ। আসলে এরূপ হওয়ার কারণ হল রেড রাস্ট আক্রান্ত চা গাছ ক্লোরোফিল দিয়ে গাছের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান পাতা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না। অপরদিকে পাতাও পর্যাপ্ত সালোকসংশ্লেষণ পদ্ধতিতে খাদ্য উৎপাদন করতে পারে না। তাই পাতায় হলুদ-সবুজ এ ছোপ ছোপ দাগ দেখা যায়।

প্রতিকার: মৌসুমের প্রথম বৃষ্টিপাতের পর এ রোগের লক্ষণ বেশি দৃশ্যমান হয়। অপ্রাপ্ত বয়স্ক চা গাছ এলাকায় বগামেডুলা নামক অস্থায়ী ছায়া গাছ এ রোগের

অন্যতম। পোষক বিধায় দু'বছর বয়সের পূর্বেই বগামেড়ুলা চা আবাদি হতে কেটে সরিয়ে ফেলা উচিত। কেননা এখান থেকে চা-তে রোগটি বিস্তার লাভ করতে পারে। এ রোগ গাছকে অত্যন্ত দূর্বল করে ফেলে বিধায় পর পর কয়েক বছর কোন এলাকায় এ রোগের আক্রমণ পরিলক্ষিত হলে পরবর্তী বছর সে এলাকায় রোগ সংগঠিত হওয়ার পূর্বে অনুকূল নিয়ামকসমূহের প্রতিরোধ জরুরি।

আক্রান্ত এলাকায় অনুমোদিত মাত্রায় সুষম সার প্রয়োগ করতে হবে। ছায়াপাছবিহীন স্থানে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ছায়াগাছ রোপণ করা উচিত এবং সেই সাথে নালা ব্যবস্থা উন্নত ও পরিষ্কার করে জলাবদ্ধতা দূর করা প্রয়োজন। রোগ আক্রান্ত এলাকায় হেক্টর প্রতি ২.৮ কেজি কুপ্রাভিট ৫০ ডব্লিউ পি অথবা যে কোন ৫০% কপার জাতীয় ছত্রাক নাশক ১০০০ লিটার পানিতে মিশিয়ে গাছের কাণ্ড ও শাখা প্রশাখায় ভালভাবে সিঞ্চন করতে হবে। সফলভাবে এ রোগ দমনার্থে ১৫ দিন অন্তর আরও ২/৩ বার উক্ত ছত্রাকনাশক সিঞ্চন করতে হবে। আক্রান্ত সেকশনে পরবর্তী মৌসুমে আক্রমণের প্রাদুর্ভাব কমানোর জন্য আগস্ট থেকে অক্টোবর মাসে ১৫ দিন অন্তর ২ বার হেক্টর প্রতি ৭৫০ গ্রাম নোইন ৫০ ডব্লিউ পি ছত্রাক নাশক ১০০০ লিটার পানিতে ভালভাবে মিশিয়ে সিঞ্চন করতে হবে।

৪) ব্রাঞ্চ ক্যান্কার বা ডাল-পালার ক্ষত রোগ (Branch canker)

বাংলাদেশে চায়ের কাণ্ড রোগের মধ্যে *Macrophoma theiocola* (Siemaszko.) নামক ছত্রাক দ্বারা সংগঠিত ব্রাঞ্চ ক্যান্কার রোগ সচরাচর দেখা যায়। সব বয়সের গাছেই কমবেশী এ রোগের আক্রমণ পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে পুরনো প্রায় সকল গাছের শাখা প্রশাখা, কাণ্ড ও গোড়ায় এ রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে। জীবাণুটি একটি উন্ড প্যারাসাইট (Wound parasite) প্রকৃতির ছত্রাক যে কোন ক্ষতের মাধ্যমে ছত্রাকটি গাছের মধ্যে প্রবেশ করে। আক্রান্ত অংশে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয় এবং ধীরে ধীরে ক্ষতটি বড় হতে থাকে। বাকলের নিচে শক্ত কাঠ আক্রান্ত হয়ে শুকিয়ে যায়। গাছের গোড়ায় এ রোগের আক্রমণ তীব্র হলে শীঘ্রই গাছ মারা যায়।

তীব্র খরা, ছায়াবিহীন অবস্থা, শিলা বৃষ্টি, প্রুনিং এর সময় ক্ষত সৃষ্টি হওয়া, আগাছা দমনের সময় দা-কোদাল প্রভৃতির দ্বারা গাছের গোড়া বা কাণ্ডে ক্ষত সৃষ্টি হওয়া এ রোগ সংক্রমণের প্রধান উৎস। বৃষ্টির পানি, পিঁপড়া, উইপোকা এবং প্রুনিং দা ইত্যাদির মাধ্যমেও এ রোগের জীবাণু বিস্তার লাভ করে থাকে।

ক্যানকার রোগ আক্রমণের ফলে কাণ্ড বা গোড়ার আক্রান্ত স্থানে এক বিশেষ ধরনের ক্ষতের সৃষ্টি হয়। ক্ষতস্থানটি গোলাকার কা'লস বেষ্টিত থাকে। আক্রান্ত স্থানের বাকল শুকিয়ে ঈষৎ কাল রং ধারণ করে। কিনারায় হতে ক্যালাস সৃষ্টি হয়ে পুনরায় স্বাভাবিক হতে থাকে। অনেক সময় ক্ষতের উপর ক্যালাস বৃদ্ধি অস্বাভাবিক হয়ে অল্প সময়ে আক্রান্ত অংশকে সম্পূর্ণ ঢেকে ফেলে কিন্তু রোগটি ভিতরে থেকে যায় ও ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। আক্রান্ত ডালপালাসমূহ দূর্বল হয়ে পড়ে এবং গাছটি একসময় মারা যায়।

প্রতিকার: রোগ সংগঠিত হওয়ার পূর্বে রোগ অনুকূল নিয়ামকসমূহের প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন শিলায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় এবং প্রুনিং উত্তর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অনুমোদিত কপার জাতীয় ছত্রাকনাশকের যে কোন একটা ছত্রাক নাশক সিঞ্চন করতে হবে। আক্রমণ তীব্র আকার ধারণ করলে আক্রান্ত স্থানের ৫ সে.মি নিচে কিয়দাংশ অপসারণপূর্বক কাটা স্থানে ছত্রাকনাশক এর পেস্ট তৈরি করে ব্রাশ দ্বারা প্রলেপ দিতে হবে। এছাড়া মৌসুমে সিস্টেমিক ছত্রাকনাশক যেমন এমিষ্টার ৩২.৫ এসসি হেক্টর প্রতি ৭৫০ মি.লি হিসেবে অথবা নোইন ৫০ ডব্লিও পি ৭৫০ গ্রাম হিসেবে ১০০০ লিটার পানিতে মিশিয়ে গাছের ডালপালায় ভালোভাবে সিঞ্চন করতে হবে।

৫) হর্স হেয়ার ব্লাইট (Horse hair blight)

চা গাছের মধ্য ক্যানোপি রোগসমূহের মধ্যে হর্স হেয়ার ব্লাইট একটি ভয়ানক রোগ। *Marasmius equicrinus* (F. Muell.) নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়ে থাকে। পূর্নবর্ধিত ও বয়স্ক চা গাছের এটি একটি সাধারণ রোগ। এ রোগ বর্ষজীবী প্রকৃতির। যদি সঠিকভাবে এ রোগকে নিয়ন্ত্রণ করা না হয় তাহলে একই সেকশনে অথবা একই গাছে এটি বছরের পর বছর সতেজ থাকে এবং স্থায়ীত্ব লাভ করে। সাধারণত রোগ বিস্তারের অনুকূল নিয়ামকসমূহ হল গাছের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, অত্যধিক ছায়া, স্যাঁতসেঁতে অবস্থা, সেকশনের কুঞ্চি অঞ্চল, অতি নিকটে বাঁশঝাড়ের অবস্থান, প্রুনিং এর সময় আবর্জনাসমূহ চা গাছের উপর রাখা, নিম্নমানের নিষ্কাশন ব্যবস্থা, ইত্যাদি। সাধারণত জুন মাস থেকে আগস্ট মাসে যখন উষ্ণ, আর্দ্র ও স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া বিরাজ করে তখন এ রোগের জীবাণু সক্রিয় হয়ে ওঠে। এ রোগের জীবাণুর বিশেষত্ব হচ্ছে যে, এটি কোন স্পোর উৎপন্ন করে না। প্রবল বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টির ফোঁটা, বাতাসবাহিত বৃষ্টির পানি, প্রুনিং লিটার, কৃষি যন্ত্রপাতি, চা পাতা চয়নকারীর ব্যবহৃত ঝুঁড়ি, কাপড় এবং গবাদি পশুর অবাধ চলাচল ইত্যাদির মাধ্যমে এ রোগ বিস্তার লাভ করে।

হর্স হেয়ার ব্লাইট রোগের লক্ষণসমূহ সনাক্ত করা কঠিন, তবে বাহ্যিক দৃষ্টিতে আক্রান্ত চা গাছগুলো খুব দূর্বল এবং সতেজহীন মনে হয়। খুব গভীরভাবে লক্ষ্য করলে আক্রান্ত চা গাছের উপর আক্রমণকারী ছত্রাকের উজ্জ্বল কালো বর্ণের সূত্রক বা কর্ড দেখা যায়। যেহেতু ছত্রাকগুলোকে একত্রে হর্স হেয়ারের মত মনে হয় সে কারণে এ জীবাণু দ্বারা সৃষ্ট রোগকে হর্স হেয়ার ব্লাইট রোগ বলা হয়। ছত্রাকের এ সূত্রক বা কর্ডগুলো আক্রান্ত চা গাছের কাঠামোতে ছড়িয়ে পড়ে এবং ডালাপালাকে জালের মত জড়িয়ে ফেলে। ফলশ্রুতিতে, আক্রান্ত গাছের সক্রিয় সালোকসংশ্লেষণ হ্রাস পায়।

প্রতিকার: আক্রান্ত সেকশনের আশেপাশে জঙ্গল থাকলে তা পরিষ্কার করা উচিত। যে সব সেকশনের ছায়াতরু অপসারণ করা সম্ভব নয় সেগুলোর শাখা-প্রশাখা বর্ষার প্রারম্ভেই ছাঁটাই করে পাতলা করে দেয়া যেতে পারে। প্রুনিং এর পর প্রুনিং লিটার কখনোই চা গাছের উপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা উচিত নয়। আক্রান্ত সেকশনে চা গাছের উপর পতিত ছায়াতরুর পাতা, আবর্জনা, প্রুনিং এর পর আবর্জনাসহ ভেতর থেকে ছত্রাক সূত্রক বা কর্ডসমূহকে অপসারণ করলে এ রোগের আক্রমণের তীব্রতা অনেকাংশে কমে যায়। যেসব সেকশনের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ভালো নয়, সেসব সেকশনে এ রোগের অক্রমণ বেশি হয়। তাই সেকশনের ভূমির বন্ধুরতা অনুযায়ী নালা তৈরি করে পানি নিষ্কাশন অবস্থা উন্নত করা প্রয়োজন। হেক্টর প্রতি ১০০০ লিটার পানিতে ৭৫০ গ্রাম এমকেজিম ৫০ ডব্লিউ পি (কার্বেন্ডাজিম) মিশিয়ে ১৫ দিন পরপর ২-৩ বার সিঞ্চন করলে সুফল পাওয়া যায়।

৬) চারকোল স্টাম্প রট বা অঙ্গার রোগ (Charcoal stump rot)

বাংলাদেশ চায়ে গাছের গোড়া ও শেকড় পচা রোগের মধ্যে চারকোল স্টাম্প রট রোগটিই প্রধান। গাছের গোড়া ও শেকড়ের মধ্যে *Ustulina deusta* (Hoffm.) নামক ছত্রাক দ্বারা এ রোগ হয়ে থাকে। যে কোন বয়সের বা জাতের চা গাছ এবং ছায়াগাছকে এ জীবাণু আক্রমণ করতে পারে। গাছের গোড়া ও শেকড়ে এ রোগ আক্রমণ করে থাকে বিধায় রোগাক্রান্ত গাছ বাঁচানো খুবই কষ্টসাধ্য। সঠিক সময়ে দমনের ব্যবস্থা না নিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আক্রান্ত গাছ মরা যায়। এ রোগ মাটিবাহিত বিধায় খুব দ্রুত আশে-পাশের গাছগুলোও আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এমনকি সমস্ত সেকশন এ রোগের আক্রমণে পড়তে পারে।

অত্যধিক স্যাঁতসেঁতে অবস্থা, ছায়া ও অত্যধিক আর্দ্রতাযুক্ত পরিবেশ রোগের আক্রমণের প্রধান উৎস বলে বিবেচিত। বর্ষা মৌসুমের সময় বা পরে রোগের আক্রমণ বেশি দেখা যায়। বালি মাটিতে এ রোগের তীব্রতা বেশি পরিলক্ষিত হয়।

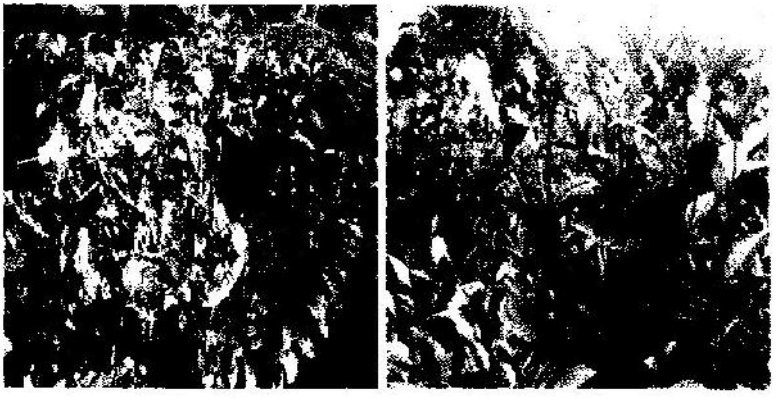

ডাই ব্যাক বা আগা মরা আক্রান্ত চায়ের মাতৃবৃক্ষ

লাল মরিচা বা রেড রাস্ট আক্রান্ত চা গাছ

ব্রাঞ্চ ক্যানকার বা ডাল পচন ক্ষত রোগ আক্রান্ত চা গাছের কাণ্ড

ডাই ব্যাক বা অগ্র মরা আক্রান্ত চায়ের মাতৃবৃক্ষ

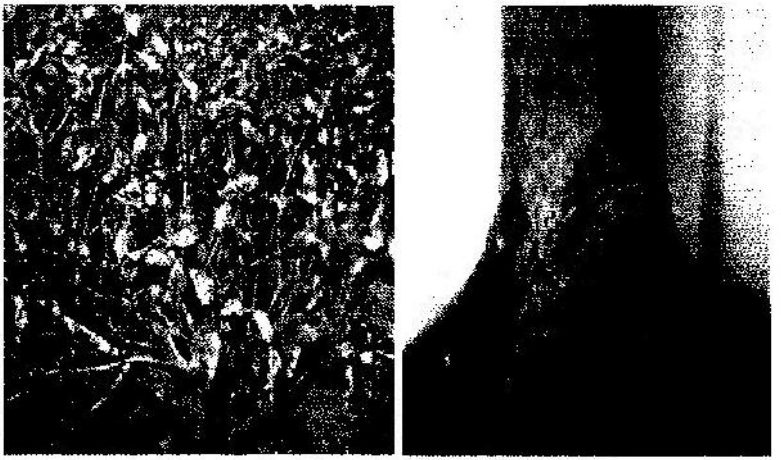

সারকোল স্টাম্প রট বা অংগার রোগাক্রান্ত মৃত চা গাছ ও আক্রান্ত গোড়া

সাধারণত এপ্রিল-মে মাস থেকে যখন আর্দ্র ও স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া বিরাজ করে তখন এ রোগের জীবাণু সক্রিয় হয়ে ওঠে।

রোগাক্রান্ত গাছ এককভাবে অথবা বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি গাছ একই জায়গায় হঠাৎ করে মারা যায়। পাতা ঝলসে যায় এবং অল্পে আস্তে শুকিয়ে যায়। বাদামি-লাল রং এর ঝলসানো পাতাগুলো কিছুদিন ডালে লেগে থাকে এবং ডাল নাড়া দিলেও পাতাগুলো গাছ হতে ঝরে পড়ে না। আক্রান্ত গাছের মাটি সংলগ্ন গোড়ায় ও শেকড়ের ওপর অসংখ্য ছোট ছোট কয়লার মতো দানাদার গুটি দেখা যায়।

ছত্রাকের অঙ্গজ অংশ গাছের উপরের মৃত কোষের সংথে মিশে কয়লার ন্যায় আকৃতির সৃষ্টি করে বিধায় রোগটির নাম চারকোল স্ট্যাম্প রট রাখা হয়েছে। অনেক সময় শেকড়ের উপর ছত্রাকের বীজকণা পরিলক্ষিত হবার পূর্বেই গাছ মরে যেতে থাকে। আক্রমণ তীব্র হলে বাকলের নিচে ছত্রাকের মাইসেলিয়াম পরিলক্ষিত হয়।

প্রতিকার: সঠিক সময়ে প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে না পারলে গাছ মারা যায় বিধায় আক্রমণের লক্ষণ পরিলক্ষিত হলেই প্রতিকার ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। প্রতিরোধক ব্যবস্থা হিসাবে চারপাশের এক সারি সুস্থগাছসহ আক্রান্ত এলাকার চারদিকে ৩০ সে.মি চওড়া এবং ৩০ সে.মি গভীরতা বিশিষ্ট গর্ত করে অস্থায়ী নালা তৈরি করে গাছগুলোকে পৃথকীকরণ করে পরবর্তীতে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায়। সরাসরি ৪০% বাণিজ্যিক ফরমালিন প্রয়োগ করেও এ রোগ দমন করা যায়। এক্ষেত্রে আক্রান্ত গাছ ও তার চারপাশে অন্তত দু'সারি সুস্থ গাছে ৪০% ফরমালিন প্রয়োগ করতে হবে। এর জন্য প্রথমে কাঁটা কোদাল দিয়ে গাছের গোড়ার মাটি আলগা করে ১৮ এমএল ফরমালিন ৯ লিটার পানিতে মিশ্রিত করে ঝাঁঝরির সাহায্যে আস্তে আস্তে গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করতে হবে। সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যে, কোন অবস্থাতেই যেন ফরমালিন মিশ্রিত পানি গাছের পাতায় না পড়ে। ফরমালিন প্রয়োগের পর গাছের গোড়া মালচিং করে দিতে হবে। ফরমালিন মিশ্রিত পানি মালচিং এর উপরও প্রয়োগ করা ভাল। সম্পূর্ণ মরাগাছ শেকড়সহ তুলে ফেলে দিতে হবে। ফরমালিন মিশ্রিত পানি প্রয়োগ করে গর্ত ভরাট করে দিতে হবে এবং পলিথিন দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। ৭ দিন পর পলিথিন সরিয়ে মাটিগুলো ঝুরঝুরে করে আরও ২ দিন অপেক্ষা করে (ফরমালিনের গ্যাস বিতাড়িত করার জন্য) নূতন চারা লাগানো যাবে। মনে রাখতে হবে এ রোগ টিলার ঢালে দেখা দিলে বেশি ছড়িয়ে পড়ে। কারণ ঢাল দিকে পানি নেমে যাওয়ার সময় এ রোগের জীবাণু সংক্রমিত হয়। এমনকি শেকড় থেকে শেকড়ে বিস্তৃত হয়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

চা উৎপাদনে ছায়াতরুর ভূমিকা
(Role of shade trees in tea production)

চা বাগানে ছায়াতরুর প্রচলন ঘটনাচক্রে হয়েছে। বিগত শতাব্দীর চল্লিশের দশকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ক্রমবর্ধমান হারে চা-চাষের সম্প্রসারণ ঘটে। এরই ধারাবাহিকতায় পতিত জঙ্গল আবাদ করে চায়ের আবাদ শুরু হয়। আসামে জঙ্গল পরিষ্কার করতে গিয়ে কোন কারণে কয়েকটি *Albizzia chinensis* গাছ রয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীতে লক্ষ্য করা গেল যে, এ-সকল গাছের ছায়ায় উৎপাদিত চায়ের উৎপাদন তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি হল।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে উত্তর-পূর্ব ভারতের চা-বাগানসমূহে সুপরিকল্পিতভাবে ছায়াতরুর প্রচলন ঘটে পরে তা দক্ষিণ ভারত, শ্রীলংকা, ইন্দোনেশিয়া এবং আফ্রিকাতে ছড়িয়ে পড়ে। বাকিংহাম (১৮৮৫) সর্বপ্রথম *Albizzia chinensis* গাছটির ছায়াতরু হিসাবে উপকারিতা সম্পর্কে বর্ণনা দেন। ব্রহ্মপুত্র ভ্যালির নিচু এলাকার চা বাগানগুলোতে ছায়াতরুর উপকারিতা সম্পর্কে Watt এবং Mann (1903) বর্ণনা দেন। তাঁদের বর্ণনায় *A.chinensis* কর্তৃক নাইট্রোজেন সংবন্ধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু তাঁরা নিবিড় এবং যত্রতত্র ছায়াদানের বিরোধিতা করেন।

সময়ের আবর্তনে *A. chinensis* ছাড়াও ছায়াদানের জন্য অন্যান্য ছায়াতরুর প্রচলন ঘটে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে *A.odoratissima, A. procera* এবং *Dalbergia assamica*। এগুলো নাইট্রোজেন সংবন্ধন করে মাটির গুণাগুণ বৃদ্ধিতেও ভূমিকা রাখে তাই শীঘ্রই আসাম এবং ডুয়ার্স ভ্যালিতে ছায়াতরু চা-চাষের একটি অবশ্যকীয় কৃষি-কৌশল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ছায়াতরুর উপকারিতা

১. ছায়াতরু চায়ের ঝোপগুলোর তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে এবং পরিমিত আর্দ্রতা বৃদ্ধি করে।
২. বাষ্পমোচন এবং প্রস্বেদনের মাধ্যমে পানি হারানো কমিয়ে রাখে।
৩. বায়ুপ্রবাহের গতি নিয়ন্ত্রণ করে
৪. অতিবেগুনিরশ্মির ক্ষতি থেকে চা গাছকে রক্ষা করে।
৫. পুষ্টিমৌল সঞ্চালনে সাহায্য করে।
৬. শোষক পোকার উপদ্রব হ্রাস করে।
৭. কাঠ এবং জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা যায়, ফলে বাড়তি আয় হয়
৮. বছরে হেক্টর প্রতি ৮ থেকে ১০ টন জৈব পদার্থের যোগান দিয়ে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে।
৯. ভূমিক্ষয় হ্রাস করে।
১০. পরিবেশে অক্সিজেন যোগান দেয়, কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করে, পাখিদের আবাসনের ব্যবস্থা করে, ফলে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সাহায্য করে।
১১. মাটির আর্দ্রতা রক্ষা করে, উপযুক্ত ছায়াবৃক্ষ মাটিতে নাইট্রোজেন যোগ করে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে।

ছায়া এবং চা পাতার উষ্ণতার সম্পর্ক

চা গাছের উন্মুক্ত আনুভূমিক এবং খাড়া পাতাগুলোর তাপমাত্রা দিনের বেলা ৪০°-৪৫° সে. পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে যখন পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রা ৩০°- ৩২°সে. হয়ে থাকে (Barerjee 1993)। তবে খাড়া বা প্রায় খাড়া পাতাগুলোর তুলনায় আলোতে উন্মুক্ত আনুভূমিক পাতাগুলোর তাপমাত্রা ২°-৪° সে. বেশি হতে পারে।

গবেষণা ক্ষেত্রে জন্মানো চা-গাছের উপর জরিপ চালিয়ে Hadfield (1995) দেখেন যে, সালোক সংশ্লেষণের জন্য অনুকূল তাপমাত্রা হচ্ছে ১৮°- ২৫° সে.। এ তাপমাত্রার উপরে সালোকসংশ্লেষণ দ্রুত হ্রাস পায় এবং ৪২° সে.তাপমাত্রায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। আরও বেশি তাপমাত্রায় পাতার টিস্যুগুলো নষ্ট হয়ে যায়। বাংলাদেশ এবং উত্তর ভারতের মত নিচু অঞ্চলে গাছগুলো যখন দ্রুত বৃদ্ধি পায়, বছরের সেই সময়টিতে তাপমাত্রার বৃদ্ধির ফলে সালোক সংশ্লেষণের হার কমে যায়। এসময় তাপমাত্রা ৪০° সে. পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। সুতরাং এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য ছায়াদানের প্রয়োজন পড়ে। সুষ্ঠু ছায়া ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আলোকপ্রাপ্তির মাত্রা অনুকূলে রাখা সম্ভব। একই সাথে পরিবেশের অন্যান্য উপাদানও অনুকূলে রাখা সম্ভব (Raj Kumar *et al* 1999)। চা-গাছ যেখানেই থাক না কেন, তাপমাত্রা ৩০° সে. এর উপরে উঠলেই ছায়াদানের

ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক বলে ড.বড়ুয়া অভিমত ব্যক্ত করেন (Barua ১৯৮৭ এবং ১৯৮৯)।

একই কারণে কেনিয়া, উগান্ডা, তানজানিয়া, শ্রীলংকার উঁচু এবং মাঝারি উঁচু অঞ্চলে, দার্জিলিং, দক্ষিণ ভারত এবং ইন্দোনেশিয়ার উঁচু অঞ্চলের চা-বাগানসমূহে ছায়াদানের প্রয়োজনীয়তা নেই। কারণ এসকল স্থানের তাপমাত্রা সচরাচর ৩০° সে. এর উপরে যায় না। তবে তাপমাত্রা ছাড়াও আরও কিছু প্রভাবক বিবেচনায় নিয়ে উপাসি (UPASI) চা গবেষণা প্রতিষ্ঠান যেকোন পরিবেশেই ছায়াদানের সুপারিশ করে কারণ সূর্যের আলোর প্রখরতা এবং বিকিরণের কারণে ছায়াহীন চা-গাছে 'Chlorosis' দেখা দেয়।

বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ-পূর্ব ভারতে ডিসেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত শুষ্ক মৌসুমে, কখনও তা এপ্রিল পর্যন্ত, এমনকি মে মাসের প্রথমার্ধ পর্যন্ত প্রলম্বিত হয়। এ অবস্থায় মাটির আর্দ্রতা রক্ষা করা কঠিন, তবে ছায়াবৃক্ষের মাধ্যমে অনেকটাই সম্ভব। সুতরাং বাংলাদেশ ও দক্ষিণ-পূর্ব ভারতে চা-গাছে ছায়ার প্রয়োজনীয়তা সুপ্রতিষ্ঠিত (Hadson and Muraleedharan 1994)।

দক্ষিণ-পূর্ব ভারত, শ্রীলংকা, আফ্রিকা এবং ইন্দোনেশিয়াতে ছায়াবৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা মোটেই সমান নয়, তার কারণও তাপমাত্রার পার্থক্য (Hadfield, 1968)

ছায়া এবং আলোক তীব্রতা

সৌর বিকিরণের অবলোহিত এবং দৃশ্যমান আলোর একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ছায়াবৃক্ষ দ্বারা শোষিত হয় ফলে ছায়াবৃক্ষের নিচে চা-গাছের তাপমাত্রা এবং আলোর পরিমাণ কমে যায় (Barua 1989)। চা গাছের পাতার অবস্থান এবং বিন্যাস দ্বারা নির্ধারিত হয় কোন পাতাটি কী পরিমাণ আলোকশক্তি শোষণ করবে। সাধারণত খাড়া পাতাগুলোই বেশি পরিমাণ আলো শোষণ করে। আনুভূমিক পাতার ক্ষেত্রে উপরের পাতাগুলো বেশি আলো পায়, তাই বেশি আলো শোষণ করে কিন্তু নিচের পাতাগুলো উপরের পাতা দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, তাই কম আলো পেয়ে থাকে (Hadfield 1974)।

Hadfield (1974) আরও বলেন যে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উপরের ১০ সে.মি. স্তরে দৃশ্যমান আলোর (Visible light) ৭০ - ৯০ শতাংশ শোষিত হয়। দৃশ্যমান আলোর বাকি অংশ পত্রাচ্ছাদনের ফাঁক দিয়ে নিচের পাতাগুলোতে পৌঁছায় অথবা উপরের পাতাগুলো থেকে প্রতিফলনের মাধ্যমে নিচের পাতাগুলোতে পৌঁছায়।

কচি পাতায় মোট আলো শোষণের পরিমাণ আলোর তীব্রতার উপর নির্ভর করে। পঞ্চাশ শতাংশ আলোকে তীব্রতায় সর্বোচ্চ ফলন পাওয়া যায় (Barua 1989)।

ছায়া এবং চায়ের মান

কৃত্রিম ছায়াদানের মাধ্যমে পরিচালিত পরীক্ষণে প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, ছায়া চা পাতায় বিদ্যমান Catechin হ্রাস করে (Soujo 1980)। কেনিয়ায় পরিচালিত জরিপ থেকে জানা গেছে যে, ছায়াযুক্ত চা থেকে প্রাপ্ত কালো চা অধিক মানসম্মত (Othieno 1983)। আসামে পরিচালিত গবেষণায় জানা যায়, পঞ্চাশ শতাংশ আলো চায়ের লিকারের রং এবং মাত্রা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করে থাকে (Dutta and Bosu 1955)। Bosu (1961) জানান যে, তুলনামূলক কম মাত্রার আলোক তীব্রতায় প্রাপ্ত চায়ের মান বৃদ্ধি পায়।

ছায়াতরু এবং চায়ের পুষ্টি

১. চা বাগানের মাটির আর্দ্রতা রক্ষিত হয়।
২. মাটিতে জৈব পদার্থ যুক্ত হয়
৩. মাটিতে নাইট্রোজেন সংবন্ধন হয়
৪. শুকনো মৌসুমে পত্র-পল্লবের বাষ্পমোচনের হার কমিয়ে গাছের সজীবতা ধরে রাখতে সাহায্য করে।

ছায়াতরু আচ্ছাদন প্রকৃতি (Canopy) এবং শাখা-প্রশাখা ও পাতার গঠনের উপর উপরের বিষয়গুলো নির্ভর করে। প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, বড় বা মাঝারি আচ্ছাদনযুক্ত ছায়াবৃক্ষ মাটির ২.৫ সে.মি. থেকে ৪.৫ সে.মি. গভীরতা পর্যন্ত ১০.৭২ শতাংশ থেকে ১১.৬০ শতাংশ পর্যন্ত আর্দ্রতা ধরে রাখতে পারে। তাছাড়া ছায়াতরুর ঝরা পাতা, বীজ ও বীজের খোসা, শুকনো ডাল থেকে মাটিতে যে জৈব পদার্থযুক্ত হয় তার মাধ্যমে যে উপকার পাওয়া যায় তা ছায়াদানের প্রত্যক্ষ উপকারের চেয়েও বেশি বলে প্রমাণিত হয়েছে।

Cunnigham উল্লেখ করেন যে, পূর্ণ সূর্যালোকে উন্মুক্তস্থানে জৈব বস্তুর অপচয় ছায়াযুক্ত স্থানের তুলনায় ২.৩ গুণ বেশি এবং উন্মুক্ত স্থানে ফসফরাসের অপচয় হয় ২.৬৫ গুণ এবং নাইট্রোজেনের অপচয় হয় ২.৪৫ গুণ বেশি। এ থেকে ধারণা পাওয়া যায় যে, ছায়াতরু থেকে ঝরাপাতার মাধ্যমেই মাটিতে জৈব পদার্থের ঘাটতি অনেকটা পূরণ হয়।

আসামের বরবেটায় (Borbetta) পরিচালিত এক পরীক্ষণ থেকে বিভিন্ন ছায়াবৃক্ষ মাটিতে কী পরিমাণ নাইট্রোজেন হেক্টর প্রতি যোগ করে তা জানা গেছে। নিচের সারণিতে তা উল্লেখ করা হল:

ছায়াবৃক্ষের প্রজাতি	ঝরপাতার শুষ্ক ওজন (কে.)	নাইট্রোজেন (কে./হে.)
Albizzia chinensis	৬৮৫	১৯
Albizzia odoratissima,	৬৫৫	১৬
Derris robusta	৬২৩	১৬
Albizzia procera	৪৬৬	১১

চা গাছ নাইট্রোজেন সরবরাহের পরিবর্তনে খুব বেশি সংবেদনশীল। শিম পরিবারভুক্ত (Legum inous) ছায়াবৃক্ষ যাদের মূলে নডিউল সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া *Rhizobium sp.* বাস করে, তারা নাইট্রোজেন সংবন্ধন করে এবং চা-গাছকে তা সরবরাহ করে। এক পরীক্ষায় জানা গিয়েছে যে, *A. chinensis* প্রতি হেক্টর জমিতে ১১৩ কেজি পর্যন্ত নাইট্রেজেন যোগ করে থাকে।

একটি ভালো ছায়াতরুর কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য

১. এটি চিরসবুজ (evergreen) গাছ হবে, সাধারণত গ্রীষ্মকালে পাতা ঝরে পড়বে না।
২. সহজেই জন্মানো যাবে, দ্রুত বৃদ্ধি এবং মূল মাটির অনেক গভীরে প্রবেশ করবে।
৩. ছায়া দেবে এমনভাবে যাতে ফাঁকে ফাঁকে রোদ প্রবেশ করতে পারে।
৪. পত্র পল্লবের ভার বহনে সক্ষম দৃঢ় কাণ্ডবিশিষ্ট হবে, সহজে ভেঙে পড়বে না।
৫. ঝড়-ঝাপটা, বায়ুপ্রবাহ এবং ঠান্ডা সহিষ্ণু হবে।
৬. কাণ্ডের বাণিজ্যিক মূল্য থাকবে।
৭. বালাই আক্রমণ এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকবে।
৮. চা-গাছের সাথে ক্ষতিকর কোন allelopathic effect সৃষ্টি হবে না।

বীজতলায় ছায়াতরুর চারা উৎপাদন

বীজের সাহায্যে ছায়াতরুর চারা উৎপাদন করে চা বাগানে যথাসময়ে লাগানো প্রয়োজন। এজন্য বীজ সংগ্রহ করে ছয় মাসের মধ্যে রোপণ করা উচিত। বীজগুলোর স্বাভাবিক অংকুরোদগম হার প্রায় ৪০ শতাংশ। বীজতলায় চারা উৎপাদনের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখতে হবে।

১. বীজগুলো সমতল থেকে উঁচুতে এবং সর্বোচ্চ ১ মিটার প্রশস্ত বীজতলায় লাগাতে হবে।
২. মাটি হবে বেলে দো-আঁশ, pH হবে ৬ বা তার কাছাকাছি।
৩. বীজ লাগানোর পর বালি বা ছাইয়ের আবরণ দ্বারা ঢেকে দিতে হবে।
৪. সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত ঝাঝরি দ্বারা পানি দিতে হবে এমনভাবে যাতে বীজগুলো স্থানচ্যুত না হয়।

৫. বীজতলা বাঁশের চাপ্টা দ্বারা ঢেকে দেয়া উচিত, কারণ এতে সমানভাবে সমস্ত বীজতলায় অংকুরোদগম হবে।
৬. অংকুরোদগম হতে ২ – ৩ সপ্তাহ সময় লাগবে।
৭. ৪ – ৬ সপ্তাহের মধ্যে প্রথম পাতাজোড়া গজাবে
৮. এ পর্যায়ে পলিথিন মোড়ানো মাটিতে চারাগুলোকে স্থানান্তর করতে হবে।
৯. পলিথিনের মধ্যে এটেল দো-আঁশ মাটি দিতে হবে এবং মাটির pH হবে কমবেশি ৬।
১০. অস্থায়ী ছায়াদানের ব্যবস্থা করতে হবে।
১১. গাছগুলো প্রতিষ্ঠিত হলে চা দ্রাব্য নার্সারি মিশ্রণ সার প্রয়োগ করতে হবে।
১২. এক সপ্তাহ পর পর একইভাবে সার দিতে হবে
১৩. পর্যায়ক্রমে ছায়া অপসারণ করতে হবে। ছায়া অপসারণের সময় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে ভাল হয়।
১৪. ৯ – ১২ মাস বয়সি চারা বাগানে রোপণের জন্য ব্যবহার করতে হবে।

বীজতলার কীট-রোগবালাই

- অংগামরা রোগ দেখা দিতে পারে।
- পাতায় পঁচা দাগ দেখা দেয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাতা ঝরে পড়ে
- ক্যাটারপিলার দ্বারা পাত আক্রান্ত হতে পারে।

এ রোগ দমনে Mancozeb ছিটিয়ে দিতে হয়। ১০ লিটার পানিতে ৩০ গ্রাম Mancozeb মিশিয়ে প্রতি সপ্তাহন্তে ২–৩ বার ছিটিয়ে দিতে হয়। কীট দমনে প্রতি লিটার পানিতে ১ মি.লি. রিপকর্ড সিঞ্চন করা যেতে পারে।

বোরনের (Boron) অভাবজনিত লক্ষণ

১. বীজতলায় বোরনের অভাব হলে চারাগাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং প্রধান অক্ষের পাতা ঝরে যায়
২. আক্রান্ত গাছগুলো ঝোপালো হয়ে যায়।
৩. ০.১০% (১০ লিটার পানিতে ১০ গ্রাম) বোরিক এসিড দ্বারা মাটি ভিজিয়ে দিতে হবে

রোপণ

১. গাছ রোপণের পূর্বে প্রতিটি গাছের জন্য ১০০ গ্রাম রকফসফেট এবং ৪০০ গ্রাম ডলোমাইট/পিট মিশ্রণ মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।
২. প্রাথমিকভাবে ৬ মি. × ৬ মি. দূরত্বে চারাগুলোকে রোপণ করতে হবে। অর্থাৎ হেক্টর প্রতি গাছের সংখ্যা হবে ২৭৫টি।

বাংলাদেশের চা বাগান উপযোগী ছায়াতরুর বিন্যাস (Shade-pattern)

প্রতি হেক্টর জমিতে রোপিত ছায়াবৃক্ষের ঘনত্ব এবং দূরত্বের উপর ভিত্তি করে ছায়া বিন্যাসকে নিম্ন, মাঝারি এবং ভারি এই তিনভাগে ভাগ করা যায়। নিচের সারণিতে এ বিন্যাস প্রকৃতি উল্লেখ করা হল (Sana, 1989)

ছায়া প্রকৃতি	ছায়া-বিন্যাস	ছায়াতরুর দূরত্ব (মি.)
সাময়িক	হালকা	৪.৫ × ৭.৫
সাময়িক	মাঝারি	১৫ × ১৫
সাময়িক	ঘন/ভারি	৯ × ৯

বাংলাদেশের জলবায়ু এবং ভূমিরূপের জন্য প্রয়োজন মাঝারি এবং ঘন ছায়াবিন্যাস। টিলাভূমি বা ঢালে ঘন ছায়াবিন্যাসের প্রয়োজন। ছায়াবৃক্ষসমূহের দূরত্ব এবং রোপণ-পদ্ধতি এমন হওয়া উচিত যাতে ছায়ার প্রকৃতি উপযোগী এবং পরিবর্তনশীল হয়। প্রাথমিক অবস্থায় রোপণের দূরত্ব দ্বারাই ছায়ার ঘনত্ব নির্ধারণ করা যেতে পারে।

ছায়াবৃক্ষ রোপণের ক্ষেত্রে দুটি পদ্ধতি অনুসরণ করা যায়। যথা-

১) **কুইনকাঙ্ক (Quincunx) পদ্ধতি**: এ পদ্ধতিতে চারটি স্থায়ী ছায়াবৃক্ষের আড়াআড়ি দূরত্বের ছেদবিন্দুতে একটি বৃক্ষ লাগানো হয়।

২) **অন্তরোপণ পদ্ধতি (Inter-planting method)**: এক্ষেত্রে একই লাইনে রোপিত চারটি স্থায়ী ছায়াবৃক্ষের মাঝখানে একটি গাছ লাগানো হয়।

নিচের সারণিতে বাংলাদেশের একটি সাধারণ ছায়া-বিন্যাস প্রকৃতি দেখানো হল:

ছায়াবৃক্ষ প্রজাতি	ছায়া প্রকৃতি	আচ্ছাদনাকৃতি (Canopy structure)	গাছে - গাছে দূরত্ব (মিটার)			
			ভূমিরূপ			
			সমতল	টিলার ঢাল		
				পূর্ব	উত্তর	উত্তর-পশ্চিম
Indigofera teysmanii	T	হালকা	৩.৬×৩.৬	৩.৬×৩.৬	৪.৬×.৬	৩ × ৩
Albizzia chinensis	SP	মাঝারি	৬.০×৬.০	৬ × ৬	০×০.৯	৪.৬ × ৪.৬
Albizzia moluccana	ST	বৃহৎ	৬.০ × ৬.০	৬ × ৬	০×০.৯	৪.৬ × ৪.৬
Albizzia odoratissima	P	মাঝারি	৬.০ × ৬.০	৬ × ৬	০×০.৯	৪.৬ × ৪.৬
Albizzia procera	P	মাঝারি	৬.০ × ৬.০	৬ × ৬	০×০.৯	৪.৬ × ৪.৬
Albizzia lebbek	P	মাঝারি	৬.০ × ৬.০	৬ × ৬	০×০.৯	৪.৬ × ৪.৬
Deris robusta	P	মাঝারি	৬.০ × ৬.০	৬ × ৬	০×০.৯	৪.৬ × ৪.৬
T = Temporary, SP = Semi-permanent, P = Permanent						

ছায়া ব্যবস্থাপনা

১. চা-গাছ কেবলমাত্র হালকা বা ছড়ানো-ছিটানো ছায়া পছন্দ করে। ছায়া এমন হওয়া উচিত যাতে ৬০ শতাংশ সূর্যালোক চা-গাছে পৌঁছাতে পারে।

২. রোপণের ৮- ১০ বছর পর ছায়া পাতলা করে দিতে হবে এমনভাবে যেন ছায়াবৃক্ষের দূরত্ব হয় ১২ × ৬ মি. (৪০ × ২০ ফিট)।

৩. পূর্ব-পশ্চিম সারিতে 'একটি রেখে একটি গাছ' -এভাবেকেটে ফেলতে হবে

৪. প্রয়োজন হলে ১২ - ১৫ বছর পরে আবার ছায়া পাতলা করে দিতে হবে এমনভাবে যে বৃক্ষগুলোর দূরত্ব হয় ১২ × ১২ মি. বা ৪০ ×৪০ ফিট। সর্বদা প্রুনিং করার পূর্বে ছায়া পাতলা করে দেয়ার সময় নির্ধারিত করা উচিত।

পোকা-মাকড় ও রোগবালাই

১. ছায়ার আধিক্য বেশি হলে Blister blight রোগ দেখা দিতে পারে।

২. ছায়ার আধিক্য বেশি হলে চায়ের মশা, স্কেল ইনসেক্ট এর প্রাদুর্ভাব বেড়ে যাবে।

৩. ছায়ার অপ্রতুলতা হলে লাল-মাকড়, উইপোকা ও ফ্লাসওয়ার্ম এর উপর্যুপরি আক্রমণ দেখা দিবে।

৪. কখনও কখনও স্কেল ইনসেক্ট এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে।

৫. বর্তমানে কোন কোন ছায়া জাত এবং ছায়ার আধিক্য লুপার ক্যাটারপিলার আক্রমণে সহায়ক হচ্ছে।

চা-এ ছায়াগাছের শ্রেণি বিন্যাস

বাংলাদেশের চায়ে তিন ধরনের ছায়াগাছ রোপণ করা হয়ে থাকে। সদ্য রোপিত চা গাছে অস্থায়ী ছায়াগাছ রোপণ করা হয়ে থাকে। অস্থায়ী ছায়াগাছ অল্পবয়স্ক চা গাছের মাঝে রোপিত হয়। দীর্ঘমেয়াদী স্থায়ী ছায়াগাছ পূর্ণবয়স্ক চা আবাদিতে দীর্ঘকালব্যাপী থাকার মানসে রোপণ করা হয়ে থাকে। নিম্নে এদের নাম উল্লেখ করা হলো :

অস্থায়ী ছায়াগাছ

i) *Indigofera teysmanii* - *ইন্ডিগোফেরা*

ii) *Tephrosia candida* - *বগামেডুলা*

iii) *Crotalaria anagyroides* - *ক্রোটালারিয়া*

স্বল্পস্থায়ী ছায়াগাছ

i) *Albizzia chinensis* (Canker জনিত সমস্যার কারণে বাংলাদেশে এটির ব্যবহার প্রায় উঠে গেছে)

ii) *A. moluccana* (ব্যবহার প্রায় নেই কারণ Shallow rooter, dense shade, almost evergreen)

স্থায়ী ছায়াগাছ

i) *A. odoratissima* বাংলাদেশে এর ব্যবহার ব্যাপক ।

ii) *A. procera* বাংলাদেশে এর ব্যবহার সীমিত হওয়ার কারণ tall and slender, canker prone, leafless period long ।

iii) *A. lebbek* বাংলাদেশে এর ব্যবহার ব্যাপক।

iv) *Derris robusta* বাংলাদেশে এর ব্যবহার ব্যাপক।

বাংলাদেশের চা বাগানসমূহে বালাই এবং রোগ বিস্তারে ছায়াবৃক্ষের প্রভাব পৃথিবীর কোন কোন চা উৎপাদনকারী দেশসমূহে শিম পরিবারের (Leguminous) বা শিম পরিবারের বাইরের কিছু প্রজাতির উদ্ভিদকে ছায়াদানকারী উদ্ভিদ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তবে ভূমিরূপ এবং কৃষি-জলবায়ুর ভিন্নতার কারণে কিছু ব্যতিক্রমও আছে। চা বাস্তুতন্ত্রে চা গাছ ছাড়াও ছায়াবৃক্ষ, সবুজশস্য, বন ইত্যাদি থাকে বাংলাদেশের সিলেট, চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চলের বিশাল এলাকায় একক শস্য হিসেবে চা গাছের আবাদ রয়েছে। চা বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ বিধায় এসকল চা-আবাদির বাস্তুসংস্থানে বিভিন্ন প্রকার পোকামাকড় এবং রোগের স্থায়ী অবস্থান ঘটে থাকে।

বাংলাদেশে চা গাছে এ পর্যন্ত ২৯টি অর্থ্রোপোডা পর্বের পোকা-মাকড়, একটি শৈবাল এবং ১৮টি ছত্রাকঘটিত রোগ সম্পর্কে জানা গিয়েছে (Sana, 1983, Ali 1990) তাদের প্রকোপ, অপর্যাপ্ত ছায়াদান ব্যবস্থা, অপর্যাপ্ত পয়নিষ্কাশন প্রণালি, আন্তঃচাষাবাদ পদ্ধতি ইত্যাদি কারণে বার্ষিক ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১০-১৫ শতাংশ (Ali 1990)।

ছায়া সম্পর্কে কিছু নেতিবাচক পর্যবেক্ষণ থাকলেও এটি নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, নিম্নলিখিত কারণে ছায়াদানকারী বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য (Eden 1952, Barua 1989):

১. চা বাস্তুতন্ত্রের পরিবেশকে উন্নত করতে।

১. মাটির উর্বরতা বাড়াতে ।

২. উষ্ণতা এবং বাষ্পায়নের মাধ্যমে পানিশূন্যতা হ্রাস করতে।

৩. মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখতে

৪. উষ্ণতা পছন্দকারী (Thermophilic) কিছু বালাই এবং রোগ-জীবাণুর প্রকোপ কমাতে

পক্ষান্তরে, ছায়াবৃক্ষের মাধ্যমে যেসকল সমস্যা হতে পারে, তা নিম্নরূপ:

১. ছায়াবৃক্ষের মূলের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার মূলবাহিত রোগ চা গাছে ছড়াতে পারে।
২. ছায়াবৃক্ষের ছায়াতে রোগ-জীবাণুর স্পোর দ্রুত বংশ বৃদ্ধি করে।
৩. বিভিন্ন পতঙ্গজাতীয় বালাই-এর আগমন ঘটায় এবং আশ্রয়দান করে।
৪. কোন কোন বালাই এবং রোগ-জীবাণুর সংক্রমণ এবং বিস্তার ঘটায়।

তবে সামগ্রিক বিবেচনায় ছায়াবৃক্ষ ক্ষতির তুলনায় উপকার বেশি করে। তাই বাংলাদেশের চা বাগানসমূহে ছায়াবৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষা করা যায় না। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, শ্রীমঙ্গলে জেমস ফিনলে চা বাগান কর্তৃপক্ষ আশির দশকে কেনিয়ার ন্যায় ছায়াহীন অবস্থায় চা আবাদের কথা ভাবেন। এ সময় বিটিআরআই সংলগ্ন ভাড়উড়া চা বাগানের SB-8 নং সেকশনের ছায়াগাছ পুরোপুরি কর্তন করে ফেলা হয়। এ সুযোগে বিটিআরআই-এর বিজ্ঞানীগণ দেখতে পান যে, ছায়াহীন চা গাছগুলোতে বিভিন্ন সময়ে ৯টি বালাই এবং রোগ সাফল্যজনকভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে। তারা এটিও লক্ষ্য করেন যে, প্রতিটি ক্ষেত্রে সংক্রমণ এবং রোগ বিস্তারের তীব্রতা ছিল ছায়াঘেরা এলাকার চেয়ে অনেক বেশি। এ থেকে নিশ্চিত হওয়া যায় যে বালাই এর উপদ্রব কমাতে ছায়াতরুর ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে বালিশিরা সার্কেলের ভাড়উড়া চা বাগানের SB-8 নম্বর সেকশনের সমতল এলাকায় পরীক্ষণ কাজ শুরু করা হয়। প্রতিটি ১ হেক্টর আয়তনের ছায়াহীন এবং ছায়াযুক্ত দুটি প্লট নির্বাচন করা হয়। প্লটগুলো ছিল পূর্ব-পশ্চিমমুখী এবং চা গাছগুলো ছিল পরিপক্ব। ছায়াবৃক্ষগুলো ছিল *Albizzia odoratissima (85%), A. moluccana (5%), Derris robusta (5%),* এবং *Dalbergia assamica (5%)* এসকল বৃক্ষ প্রায় ৬০ শতাংশ এলাকা ছায়া দিচ্ছিল। ছায়াবৃক্ষগুলোর দূরত্ব ছিল ১২ মি. × ১২মি. এবং চা গাছগুলোর দূরত্ব ছিল ১২০ সে.মি. × ৭০ সে.মি.। এলাকাটি ছিল সুনিষ্কাশিত, পয়ঃপ্রণালিযুক্ত। আগাছা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রচলিত এবং রাসায়নিক পদ্ধতি, চা-পাতা চয়ন, ছাঁটাইচক্র পরিচালনা, সার প্রয়োগ করা ইত্যাদি নৈমিত্তিক কাজগুলো বাগান কর্তৃপক্ষের তদারকিতে সম্পন্ন হচ্ছিল।

বাগানের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডে কোনরূপ বিঘ্ন সৃষ্টি না করে বালাই এর প্রকোপ পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছিল প্রতিটি ছায়াযুক্ত এবং ছায়াহীন প্লটের একটি সারি, তারপর একটি সারি বাদ দিয়ে পরবর্তী সারি এভাবে বিভিন্ন সারির মাঝে মাঝে মোট ১০০টি করে গাছ নির্বাচন করা হয়। তারপর প্রতি দু'মাস অন্তর বালাই এর

উপস্থিতি এবং প্রকোপ পর্যবেক্ষণ করা হয়। পরপর ৭ বছর ব্যাপী রোগবালাই পর্যবেক্ষণ করা হয়। বাহ্যিক লক্ষণ দেখে বিভিন্ন রোগ-বালাই সনাক্ত করা হয়। একই সাথে তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত এবং আর্দ্রতার পরিমাপ নথিভুক্ত করা হয়।

ফলাফল

পরীক্ষণের ফলাফল ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। দেখা যায় যে, উইপোকা, জ্যাসিড, ফ্ল্যাশওয়ার্ম এবং ম্যাক্রোফোমার উপদ্রব সমস্ত বছরব্যাপী ছিল। তবে এদের উপদ্রব ছায়াহীন প্লটে বেশি ছিল কারণ এগুলো সূর্যের আলো বেশি পছন্দ করে। কিন্তু উইপোকা এবং ম্যাক্রোফোমার উপদ্রব ঘন ঘন এবং ছায়াযুক্ত বা ছায়াহীন নির্বিশেষে সকল গাছেই প্রকটভাবে লক্ষ্য করা গেছে।

ছায়াযুক্ত প্লটে *Helopeltis* এর প্রকোপ বেশি ছিল, কারণ এগুলো তাপ এবং আলো পছন্দ করে না। পাতা চয়ন ঋতুর প্রথমদিকে লাল-মাকড়া (Red Spider Mite) এবং লাল-মরিচা (Red rust) রোগের প্রকোপ বেশি লক্ষ্য করা গেছে। তারপর এদের প্রকোপ কমলেও পাতা-চয়নের মধ্য সময় পর্যন্ত লাল-মাকড়ের প্রকোপ ছিল মৃদু বা মাঝারি তীব্রতা সম্পন্ন।

ঋতুভিত্তিক গড় প্রকোপ এবং রোগ-বালাইয়ের বিস্তার ছকের মাধ্যমে উল্লেখ করা হল। প্রতিটি রোগ বা বালাইয়ের ক্ষেত্রে ছায়াযুক্ত এবং ছায়াহীন পরিবেশের প্রভাব যাচাইয়ের জন্য পরিসংখ্যানগত টি-টেস্ট (T-test) করা হয়। এ থেকে পরীক্ষাকালীন সময়ে পাঁচ বৎসরকাল পরে লাল মাকড় এবং Macrophoma এর ক্ষেত্রে ছায়াহীন পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

গড় বৃষ্টিপাত, সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতা সম্পর্কে তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। উপাত্ত থেকে স্পষ্টই দেখা যায়, পরীক্ষাকালীন সময়ব্যাপী গড় বৃষ্টিপাত, সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতা প্রায় সমানই ছিল।

টেবিলে বিভিন্ন কোয়ার্টারে সংক্রমণের হার উল্লেখ করা হয়েছে। বিভিন্ন কোয়ার্টারে বিভিন্ন বালাই এবং রোগের প্রকোপ একই রকম থাকলেও তার তীব্রতা ছায়াহীন অঞ্চলে বেশি বলেই প্রমাণ পাওয়া গেছে। প্রথম কোয়ার্টারে বালাইয়ের পোকামাকড়ের আক্রমণ খুব কম ছিল যা দ্বিতীয় এবং তৃতীয় কোয়ার্টারে খুব বেশি বেড়ে যায়। চতুর্থ কোয়ার্টারে উইপোকা, ম্যাক্রোফোমা এবং ঋতুভিত্তিক আপদ, যেমন – *Helopeltis* এবং Jassid এর উৎপাত দেখা দেয়। এ থেকে সরাসরি প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কলোনি তৈরি, সংখ্যা বৃদ্ধি এবং পুনরাবর্তনের ক্ষেত্রে ছায়ার প্রভাব রয়েছে। ছায়াবৃক্ষ চা বাস্তুতন্ত্রের এক অবিচ্ছেদ্য নিয়ামক।

ছায়া এবং ছায়াহীন অবস্থায় ভাড়াউড়া চা বাগানের SB-৮ নং সেকশনে বালাই এবং রোগের তুলনামূলক প্রকোপ (১৯৮১-১৯৮৬)

বালাইসমূহ	ঝোপগুলোতে সার্বিক সংক্রমণ (%)											
	১৯৮১		১৯৮২		১৯৮৩		১৯৮৪		১৯৮৫		১৯৮৬	
	ছায়াযুক্ত	ছায়াহীন	ছায়াযুক্ত	ছায়াহীন	ছায়াযুক্ত	ছায়াহীন	ছায়াযুক্ত	ছায়াহীন	ছায়াযুক্ত	ছায়াহীন	ছায়াযুক্ত	ছায়াহীন
Red spider mite	৮.৬৬	১৩.০০	১০.১৭	১১.৩৩	১২.১৭	২০.১৭	৩.১৬	৯.০০	২.৫০	৭.৮৩	৩.৬৬	৬.১৭
Helopeltties	১০.১৬	৯.৩৩	১২.১৭	৮.৫০	১২.৫০	৬.৬৭	৩.৮৩	২.৮৩	৫.৬৬	৪.৮৩	৪.৫০	৩.৮৩
Flush worm	৩.৫০	৪.৮৩	৪.১৭	৪.৮৩	৩.৬৭	৪.০০	২.৬৭	২.৩৩	৬.১৭	৭.১৭	৩.৬৬	৪.০০
Jassid	০.৮৩	১.১৬	১.০০	১.৫০	১.১৭	২.৩৩	১.৮৩	২.১৭	৪.৩৩	৫.১৭	২.১৭	২.৮৩
Leaf roller	১.৫০	২.১৬	১.১৭	১.৮৩	১.১৭	২.৩৩	২.৫০	২.৬৭	৪.৫০	৫.০০	০.৬৭	০.৮৩
Termite	১৫.১৬	১৫.৬৭	১৪.৫০	১৫.৩৩	১০.৬৭	১২.৮৩	৮.০০	৮.৫০	১০.১৭	১১.৩৩	১১.৩৩	১১.৮৩
Macrophoma	১০.০০	১১.৩৩	১০.৮৩	১১.১৭	৯.১৭	১০.৮৩	৫.১৭	৫.৫০	৬.০০	৭.৫০	৪.১৭	৬.০০
Red rust	১.৫০	১.৮৩	০.৫০	১.৫০	০.৫০	১.১৭	০.৩৩	১.৩৩	১.৬৭	২.৫০	১.৫০	২.৫০
Horse hair blight	০.৮৩	০.৩৩	০.৮০	০.৬৬	০.৬৭	০.৬৩	১.৫০	০.৮৩	১.০০	০.৮৩	২.৩৩	১.০০

গড় তাপমাত্রা (সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন), বৃষ্টিপাত এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতা (১৯৮১-৮৭)

বছর	বৃষ্টিপাত (সে.মি.)	তাপমাত্রা সর্বোচ্চ (°C)	তাপমাত্রা সর্বনিম্ন (°C)	আ. আর্দ্রতা (%)
১৯৮১	২২০.৯৫	৩১.৫৪	১৯.৯৫	৮১.৫৫
২৯৮২	২২৯.১৭	৩১.০৪	১৯.১০	৭৬.৮০
১৯৮৩	৩০৬.৫৩	৩০.৫২	১৯.৯৫	৭৬.৯৫
১৯৮৪	৩০৯.৭০	৩০.৩৭	২০.৭০	৭৫.৪০
১৯৮৫	২৪১.০৩	৩০.৫৫	১৭.৩৮	৮২.৫৩
১৯৮৬	২৫০.২০	৩০.০৭	১৯.৫২	৭৬.৬৪
১৯৮৭	২১০.৯১	৩০.২৮	১৯.৮১	৭৮.৯৫

উপসংহার

চা বাস্তুতন্ত্র এবং বালাই বৈচিত্র্যের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের চা-এর ক্ষেত্রে একটি জোরালো বালাই ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন। সকল উন্নত নিয়ন্ত্রণ কৌশলের মধ্যে ছায়া ব্যবস্থাপনা নিঃসন্দেহে বালাই নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বন-ধ্বংসের কারণে এবং নতুন নতুন ভূমি চা-আবাদিতে অন্তর্ভুক্ত করার কারণে নতুন নতুন বালাইয়ের সংক্রমণ ঘটছে। এসকল পোকামাকড় ও রোগবালাই এর জন্য ছায়াবৃক্ষ কদাচিৎ বিকল্প পোষক হিসেবেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে চা গাছে সংক্রমণের সম্ভাবনা কমে যায়।

দীর্ঘ অনাবৃষ্টির সময় ছায়াবৃক্ষসমূহ চা-গাছগুলোকে বিরূপ প্রতিক্রিয়া থেকে রক্ষা করে। সার্বিক দিক বিবেচনা করে বলা যায়, ছায়াবৃক্ষ চা বাস্তুতন্ত্রে সার্বিক উন্নয়নে সরাসরি ভূমিকা রাখার পাশাপাশি বালাই নিয়ন্ত্রণেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

চতুর্দশ অধ্যায়

ছাঁটাই এর উপযুক্ত সময় এবং ছাঁটাই পূর্ববর্তী বিবেচ্য বিষয়

(Ideal time and methods of tea pruning and its preconditions)

ছাঁটাই-এর জন্য উপযুক্ত সময় জানা প্রয়োজন। কেননা এর উপর ছাঁটাই-পরবর্তী সাফল্য নির্ভর করে। চা গাছের বৃদ্ধির হার পর্যবেক্ষণ করে ছাঁটাই-এর উপযুক্ত সময় নির্ধারণ করা হয়। যখন বৃদ্ধির হার কমে যায় এবং শর্করা উৎপাদন তুলনামূলকভাবে হ্রাস পায় তখনই ছাঁটাই-এর উপযুক্ত সময়। ছাঁটাই-এর অন্যতম একটি উদ্দেশ্য হল পরবর্তী মৌসুমের পূর্বেই যাতে নতুন পত্র-পল্লব গজাতে পারে এবং গাছগুলো সজীব হয়ে উঠতে পারে তা নিশ্চিত করা (Banerjee 1993)।

উত্তর-পূর্ব ভারতে তেজস্ক্রিয় কার্বন-ডাই-অক্সাইড ব্যবহার করে পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, অক্টোবর থেকে মধ্য-ফেব্রুয়ারি সময়কালে শর্করা নিচের দিকে প্রবাহিত হতে থাকে (Manivel 1980)। মূলে শর্করা বা শ্বেতসার সঞ্চয়ের বিষয়টি বিবেচনা করে দক্ষিণ-পূর্ব ভারতে ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি মাস হচ্ছে ছাঁটাই-এর জন্য আদর্শ সময়। তবে খরাপ্রবণ এলাকায় এ সময়টি মধ্য-ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি মাসের শেষভাগ পর্যন্ত হওয়া উচিত। দার্জিলিং-এ এসময়টি আরও ১৫ দিন এগিয়ে আনা হয় কারণ সেখানে আগেভাগেই পাতা চয়ন বন্ধ হয়ে যায়। তবে নিচু এলাকার বাগানগুলোতে অক্টোবর মাসেই ছাঁটাই শুরু করা যেতে পারে।

শ্রীলঙ্কা এবং পূর্ব আফ্রিকাতে শুকনো মৌসুমের পরের সময়টিকেই ছাঁটাই-এর আদর্শ সময় ধরা হয়। খরাপ্রবণ এলাকায় ছাঁটাইকৃত গাছগুলো মাটি থেকে খুব কম পানি গ্রহণ করেই টিকে থাকতে পারে। তবে মাটিতে পানিশূন্যতার বিরূপ প্রভাবের পূর্বেই ছাঁটাই কাজটি করা উচিত (Ellis 1984)।

ছাঁটাই-এর পূর্বে বিবেচ্য বিষয়

ছাঁটাই-এর পূর্বে গাছে শ্বেতসার সঞ্চয়ের (Starch reserve) পরিমাণ জানা প্রয়োজন। কেননা যথেষ্ট পরিমাণ শ্বেতসার সঞ্চয় না থাকলে যেকোন পর্যায়ের ছাঁটাই মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনে (Banerjee 1993)। ছাঁটাইয়ের সময় প্রচুর ডালপালা অগ্রভাগসহ কাটা পড়ে। ফলে গাছের শর্করা প্রস্তুতি বন্ধ হয়ে যায়। তখন মূলে সঞ্চিত শর্করার সাহায্যেই গাছগুলো বেঁচে থাকে। এ বিষয়টি প্রথমে শ্রীলঙ্কাতে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হয়েছিল (Gadd 1928)।

মাটিতে পুষ্টিদ্রব্যের প্রাচুর্য আরেকটি বিবেচ্য বিষয়। মাটিতে পুষ্টির অভাব থাকলে ছাঁটাই-এর পরে পুনরায় সজীব হতে একটি গাছের অনেকদিন সময় লাগে। তাছাড়া ছাঁটাই-এর পূর্বে মাটিতে প্রয়োজনমত সার প্রয়োগ করা দরকার এবং লক্ষ্য রাখা দরকার যাতে গাছগুলো সেই সার গ্রহণ করতে সক্ষম। অর্থাৎ মাটিতে পর্যাপ্ত আর্দ্রতা থাকতেই সার প্রয়োগ করতে হবে। অন্যথায় সার প্রয়োগ ঠিক নয়। এজন্য জমিতে পটাস সার প্রয়োগ করা হয়। শ্রীলঙ্কাতে এক গবেষণায় জানা গেছে যে, ছাঁটাই-এর ঠিক পূর্বে শুষ্ক মাটিতে সার প্রয়োগ করা হলে গাছগুলো সজীব-সতেজ হতে অনেক বেশি সময় লাগে এবং আগামর (Die back) রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে (Pethiagoda 1966)।

মূলে খাদ্য সঞ্চয় এবং পর্যাপ্ততার পরিমাণ পরীক্ষার মাধ্যমে জানা সম্ভব। এজন্য প্রথমে ১ থেকে ২ মি.লি. পাতিত পানিতে ১ গ্রাম দানাদার আয়োডিন এবং ১ গ্রাম পটাসিয়াম আয়োডাইড যোগ করে দ্রবণ তৈরি করা হয়। তারপর পাতিত পানি যোগ করে এর আয়তন বাড়িয়ে ১০০ মি.লি. করা হয়। দ্রবনটিকে কালো রঙের বোতলে সংরক্ষণ করে রাখা হয়। গাছের গোড়াতে মূলের উৎপত্তিস্থল থেকে প্রায় ১০ সে.মি. দূরে মাটিতে ১০ থেকে ১৫ সে.মি. গভীর করে গর্ত খোড়া হয়। তবে বয়স্ক গাছের ক্ষেত্রে আরও দূরে গর্ত করলেও চলে। তারপর কমপক্ষে ৫ মি.মি. ব্যাসের যেকোন একটি মূল গাছ থেকে কেটে বিচ্ছিন্ন করা হয়। মূলটির কাটস্থান যেন মসৃণ হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়। এখন কাটাস্থানে ২/৩ ফোঁটা আয়োডিন দ্রবণ ফেলা হয় এবং ৫ মিনিট রেখে দেয়া হয়। যদি মূলটির কেন্দ্র থেকে পরিধির দিকে গাঢ় নীলবর্ণ ছড়িয়ে পড়তে থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে, গাছটিতে শ্বেতসারের ভাল মজুদ রয়েছে।

কিন্তু শ্বেতসারের মজুদ কম হলে বর্ণটি গাঢ় না হয়ে হালকা হবে এবং শুধুমাত্র মূলটির কাটাস্থানের কেন্দ্রে কিছুটা গাঢ়বর্ণ দেখা যাবে। দেখা গিয়েছে যে, সেপ্টেম্বর মাস বা তার কাছাকাছি সময়ে মূলের শ্বেতসার সঞ্চয় খুবই কম থাকে এবং হেমন্তকাল থেকে সঞ্চয় দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। শীতকালে এই সঞ্চয়ের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি হয়। তারপর ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে।

ছাঁটাই-এর বিভিন্ন পদ্ধতি

চা গাছের জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে ছাঁটাই-এর প্রয়োজন হয়। উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে ছাঁটাইকে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

১. অপরিণত চা গাছে সুকাঠামো গঠনকারী (Formative) ছাঁটাই।
২. পরিণত চা গাছে রক্ষণ (Maintenance) ছাঁটাই।
৩. সর্বপ্রকার চা গাছে সংশোধনমূলক (Corrective) ছাঁটাই।

অপরিণত চা গাছে সুকাঠামো গঠনকারী ছাঁটাই

চা গাছ একটি বহুবর্ষজীবী বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদ। ছাঁটাই-এর মাধ্যমে একে নির্দিষ্ট উচ্চতায় ঝোপের কাঠামো দান করা হয়। তাছাড়া সুবিধাজনক উচ্চতায় পাতা-চয়নের সুবিধার জন্য একটি টেবিলের মতো কাঠামো দান করা হয়। রোপিত চারা যখন বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন ছাঁটাই-এর কাজটি শুরু করা হয়। অনুকূল আবহাওয়ায় প্রথম বছর পাঁচটি পদ্ধতিতে ছাঁটাই করা হয়ে থাকে। যথা- ডিসেন্টার, ব্রেকিং, স্কেগিং বা বেন্ডিং, ডিবাডিং এবং রিং বার্কিং (Ring barking) যেসকল চারা একক কাণ্ডবিশিষ্ট সেগুলোর ক্ষেত্রে ব্রেকিং এবং যে সকল চারায় একাধিক শাখা থাকে সেগুলোর ক্ষেত্রে ডিসেন্টারিং পদ্ধতি সুবিধাজনক। এপ্রিল- মে মাসে চারা রোপণ করা হলে অর্থাৎ Spring planting হলে, পরের বছর জানুয়ারি মাসের শেষ অথবা ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমদিকে ছাঁটাই শুরু করতে হবে। তাছাড়া শীতকালীন চারা রোপিত হলে পরের বছর এপ্রিল মাসের শেষের দিকে বা মে মাসের প্রথম দিকে ছাঁটাই শুরু করা উচিত। এভাবে প্রথম পাঁচটি বছর ছাঁটাই পদ্ধতি এবং ছাঁটাই-এর উচ্চতা নিচের ছকে দেখানো হল :

চারার বয়স	ছাঁটাই পদ্ধতি	ছাঁটাইয়ের উচ্চতা (সে.মি.)
১ম বছর	ডিসেন্টার/ব্রেকিং	১৫ - ২৩
২য় বছর	প্রুনিং	৩৫ - ৪০
৩য় বছর	স্কিফিং	৫০
৪র্থ বছর	প্রুনিং	৪৫ -৫০
৫ম বছর	স্কিফিং	৬৮ - ৭৩

ডিসেন্টারিং বা ব্রেকিং পদ্ধতিকে বাংলায় 'বিকেন্দ্রীকরণ' বলা যেতে পারে। এটি হচ্ছে চা-গাছের জীবনের প্রথম বছরের ছাঁটাই পদ্ধতি। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ঊর্ধ্বমুখী বৃদ্ধি বন্ধ করে দেয়া এবং পার্শ্বীয় মুকুলের বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করা যাতে যথাসময়ে একটি ভালো পাতা-চয়ন উপযোগী চয়নতল (Plucking table) তৈরি হয়।

হালকা-ধরনের ছাঁটাইকে স্কিফিং বলা হয়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে পাতা-চয়নের তলকে নামিয়ে রাখা এবং গিটযুক্ত, ঘিঞ্জি ডালপালা অপসারণ করা।

পরিণত চা-গাছে বিভিন্ন প্রকার ছাঁটাই: ছাঁটাইকে রক্ষণাবেক্ষণ (maintenance) এবং সংশোধনমূলক (corrective) ছাঁটাইও বলা হয়। এগুলোকে মোটা দাগে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যেতে পারে:

ক) **হালকা ছাঁটাই** (Light Prune বা LP): পূর্ববর্তী ছাঁটাইয়ের ৪/৫ বছরের মাথায় যখন চা গাছগুলো যথেষ্ট উঁচু হয়ে যায় তখন পূর্ববর্তী ছাঁটাইতলের উপরে হালকা ছাঁটাই দেয়া হয়। আসাম এবং ডুয়ার্সে হালকা ছাঁটাই একটি উত্তম ছাঁটাই হিসেবে পরিচিত। বাংলাদেশেও এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য কেননা মাঝারি উচ্চতার এবং নিচু বাগানগুলোতে যেখানে যথেষ্ট পরিমাণ সার প্রয়োগ করা হয় এবং নিয়মিত হালকা ছাঁটাই দেয়া হয় সে সকল বাগানে চায়ের উৎপাদন বেড়ে যায়।

খ) **গভীর স্কিফিং** (Deep Skiff বা DSK): সর্বশেষ ছাঁটাই-তল এবং পাতা-চয়নতলের মাঝামাঝি স্থানে এধরনের ছাঁটাই দেয়া হয়। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পাতা চয়নের জন্য নতুন নতুন অগ্রমুকুল উৎপন্ন করা।

গ) **মধ্যম স্কিফিং** (Medium Skiff বা MSK): মধ্যম বা মাঝারি ছাঁটাই এর উদ্দেশ্য হচ্ছে অনুৎপাদনশীল অগ্রমুকুল এবং ডাল-পালাকে ছাঁটাই করে অপসারণ করা।

ঘ) **হালকা স্কিফিং** (Light Skiffing বা LSK): হালকা স্কিফিং বলতে একই বছরেরপাতা-চয়নতলে শয়ান শাখা-প্রশাখা, যারা অনুৎপাদনশীল, সেগুলোকে অপসারণ করা বুঝায়।

ঙ) **মাঝারি ছাঁটাই** (Medium Pruning বা MP): এটি এক ধরনের গভীর প্রকৃতির ছাঁটাই। এর মূল উদ্দেশ্য পাতা-চয়নের তলকে সুবিধেজনক উচ্চতায় রাখা যাতে সহজেই পাতা-চয়ন করা যায়। এর উচ্চতা নির্ভর করে পূর্ববর্তী সফল ছাঁটাইয়ের উপর। যদি পূর্ববর্তী ছাঁটাই সন্তোষজনক হয়, তাহলে এ উচ্চতা মাটি থেকে ৫৫ – ৬৮ সে.মি. এর বেশি হয় না।

বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিটিআরআই) চার বছরের ছাঁটাই-চক্র বা Pruning cycle অনুসরণ করার পরামর্শ দিয়ে থাকে। নিচের ছকে বিটিআরআই কর্তৃক বাংলাদেশের চা বাগানগুলোতে সার বছর মেয়াদি ছাঁটাইচক্রের প্রকারভেদ, ভূমি থেকে উচ্চতা এবং উপযুক্ত সময় উল্লেখ করা হল–

ছাঁটাই প্রকৃতি	উচ্চতা (সে.মি.)	ছাঁটাই-এর উপযুক্ত সময়
LP	৫৫ - ৮০	ডিসেম্বর
DSK	৬৫ - ৯০	জানুয়ারির প্রথমার্ধ
MSK	৭০ - ৯৫	জানুয়ারি
LSK	৭২ - ৯৭	ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমার্ধ
MP	৪৫ - ৬০	ডিসেম্বর

ডগা/বিটপ ছাঁটাই এবং পত্র চয়ন

বিটপ ছেদন (Tipping)

আগা ছাঁটাই বা টিপিং (Tipping) হচ্ছে ছাঁটাইকৃত (Pruned) শাখাগুলোতে গজানো সকল প্রাথমিক কুঁড়ি ভেঙে ফেলা। এটি নির্ধারিত উচ্চতায় করা হয়। এর মূল উদ্দেশ্য হল পাতা চয়নের জন্য একটি চয়নতল প্রতিষ্ঠা করা যাতে প্রচুর পত্র-চয়ন করা সম্ভব হয়। ছাঁটাই করা শাখাগুলো থেকে স্বাভাবিকভাবেই কিছু কুঁড়ি গজায়। এগুলোকে প্রাথমিক কুঁড়ি (Primary shoot) বলা হয়। এগুলোকে বৃদ্ধি পেতে দিলে তা 'বানজি' বা বন্ধ্যা শাখা-প্রশাখাতে পরিণত হয়, যা মোটেই কাম্য নয়।

যথাসময়ে আগা ছেদন বা টিপিং করা প্রয়োজন। অনাবশ্যক বিলম্ব হলে ঝোপের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হতে পারে। হাত দ্বারা টিপিং করাই উত্তম। টিপিং কাজে দক্ষ এবং অভিজ্ঞ পাতা-চয়নকারী শ্রমিক নিয়োগ করা উচিত। সাধারণত পাতা-চয়ন ঋতুর প্রারম্ভে যে সকল গাছে টিপিং করা প্রয়োজন সে সকল গাছে টিপিং করা হয়। এসময় প্রচলিত ৭ দিনের পাতা-চয়নচক্রের পরিবর্তে ৫/৬ দিনের পাতা-চয়ন চক্র অনুসরণ করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে পরবর্তী পত্র-পল্লব গজানোর পূর্বে বন্ধ্যা মুকুলগুলো অপসারণ করে ভালো ফল পাওয়া গেছে। তবে গভীরভাবে ছাঁটাই করা (Deep skiffed) এবং হালকাভাবে ছাঁটাই করা হয়েছে এরূপ ক্ষেত্রে অবশ্যই ৭ দিনের পাতা চয়ন চক্র অনুসরণ করা উচিত এবং কমপক্ষে টিপিং-এর পাঁচটি চক্র সম্পন্ন করা প্রয়োজন। এতে করে একটি উত্তম পাতা-চয়ন তল (Plucking table) তৈরি হবে।

টিপিং-এর উদ্দেশ্য

১. সুবিধেজনক উচ্চতায় একটি পত্র-চয়ন তল (Plucking table) তৈরি করা, যাতে পাতা-চয়ন করা সহজ হয়।
২. এর মাধ্যমে চায়ের ঝুপগুলোকে স্বাস্থ্যবান, সতেজ এবং উৎপাদনশীল রাখা।
৩. সমগ্র পাতা-চয়নকালব্যাপী পাতা উৎপাদন নিশ্চিত করা।
৪. পার্শ্বীয় মুকুলের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা।

টিপিং-এর উচ্চতা

টিপিং এর নিখুঁত উচ্চতা নির্ধারণের জন্য বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হলেও এ ব্যাপারে প্রচুর মতভেদ রয়েছে। তবে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মত হচ্ছে ছাঁটাই করা হয়নি, এরূপ গাছের ক্ষেত্রে যে উচ্চতায় বানজি বা বন্ধ্যা তালপালা গজায় সেই উচ্চতাটি ছাঁটাইয়ের জন্য উত্তম। আর হালকা ছাঁটাই করা হয়েছে এরূপ ঝোপগুলোর ক্ষেত্রে ছাঁটাই তলের ২০ সেন্টিমিটার উপরে টিপিং করা যেতে পারে।

এটি পাঁচটি পাতার সমান উচ্চতা হয় এবং ক্ষেত্রবিশেষে ১৫ থেকে ২৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত উঁচুতে হয়। গভীর ছাঁটাই করা হয়েছে এরূপ ঝোপগুলোর ক্ষেত্রে ছাঁটাইতল থেকে দুটি পাতা সমান উচ্চতায় বা প্রায় ৪ ইঞ্চি উঁচুতে টিপিং করা উত্তম। বিভিন্ন প্রকার ছাঁটাই এর ক্ষেত্রে টিপিং-এর উচ্চতা নিম্নলিখিত ছক অনুযায়ী অনুসরণ করা যেতে পারে। এটি বাংলাদেশের চা বাগানগুলোতে বাস্তবতার নিরিখে প্রণীত হয়েছে।

ছাঁটাই-এর প্রকারভেদ	টিপিং উচ্চতা
মধ্যম ছাঁটাই (Medium Prune)	১০ ইঞ্চি বা ২৫ সেন্টিমিটার
হালকা ছাঁটাই (Light Prune)	৮ ইঞ্চি বা ২০ সেন্টিমিটার
গভীর স্কিফ (Deep Skiff)	৪ ইঞ্চি বা ১০ সেন্টিমিটার
মধ্যম স্কিফ (Medium Skiff)	২ ইঞ্চি বা ৫ সেন্টিমিটার
হালকা স্কিফ (Light Skiff)	১ ইঞ্চি বা ২.৫৪ সেন্টিমিটার

পাতা চয়ন

চা শিল্পে পাতা-চয়ন (Plucking) হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। পাতা চয়ন বলতে চা গাছের বা ঝোপের (Bush) অসংখ্য শাখা-প্রশাখায় উৎপন্ন কচি ডগা সংগ্রহ করাকে বোঝায় যা থেকে পরবর্তী পর্যায়ে তৈরি চা পাওয়া যায়। পর্বমধ্যসহ ২ থেকে ৩টি পাতা এবং অগ্রমুকুল চা শ্রমিকেরা সংগ্রহ করে থাকেন। চা উৎপাদনে মোট খরচের শতকরা ২০ ভাগ পাতা-চয়নে ব্যয় হয় এবং মাঠপর্যায়ে ব্যয়ের শতকরা ৬০ ভাগ এ পর্যায়ে ব্যয় হয়ে থাকে (Hudson 1998)। পাতা চয়ন হচ্ছে চা চাষে সবচেয়ে ব্যয়বহুল এবং শ্রমিকভিত্তিক কাজ। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে আদর্শ গুণগত মানসম্পন্ন সর্বাধিক পাতা সংগ্রহ করা।

সাধারণভাবে পাতা-চয়ন বলতে কচিপাতা ছিঁড়ে সংগ্রহ করা বোঝায় কিন্তু এটি একটি যথেষ্ট উঁচুমানের কৌশলগত কাজ। এর সাফল্য নির্ভর করে চা-গাছের সাথে দীর্ঘ পরিচিতি এবং অভিজ্ঞতার উপর। এ প্রসঙ্গে চারটি মৌল বিষয় জড়িত (Shahiduzzaman 2001)। যথা-

১. চা গাছের জাত (Cultivars)
২. চয়নতল (Plucking table)
৩. চয়ন পদ্ধতি (Plucking system)
৪. চয়নকাল বিরতি (Plucking interval)

বিষয়গুলো সম্পর্কে নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল:

১. **চা গাছের জাত** (Cultivars): ভালো জাতের চা গাছ থেকেই ভাল মানসম্পন্ন সর্বাধিক পাতা চয়ন করা সম্ভব। কেননা ভালজাতের চা গাছের উপরিতলে

প্রচুর পরিমাণ চয়ন উপযোগী ডগা সৃষ্টি হয়। যেহেতু চায়ের ফলন চা-গাছের অঙ্গজ বৃদ্ধির উপর নির্ভরশীল, সেহেতু অধিক পাতা মানেই অধিক চা।

২. **চয়নতল** (Plucking table): সময়মতো এবং যথাযথ চয়ন তল সৃষ্টি করা গেলে প্রচুর চয়ন উপযোগী পাতা পাওয়া সম্ভব। একই সাথে চয়ন তলের নিচে প্রচুর স্বাভাবিক পত্রবিন্যাস থাকে, ফলে চা গাছে খাদ্যের স্বাভাবিক যোগান অব্যাহত থাকে. কেননা সালোক সংশ্লেষণের জন্য আলোতে প্রসারিত যথেষ্ট সংখ্যক পরিণত পাতা থাকা প্রয়োজন। একটি ঝোঁপের পাতা দ্বারা আচ্ছাদিত এলাকা এবং এর আওতায় থাকা ভূমির অনুপাতের মাধ্যমে পত্রবিন্যাসের স্বাভাবিক এবং কাঙ্ক্ষিত আকার সম্পর্কে জানা যায়। এই অনুপাতটিকে Leaf Area Index (LAI) বলা হয়। একটি চা আচ্ছাদিত এলাকা LAI এর মান ৫ হওয়া বাঞ্ছনীয় (Barua 1989)। আসলে ফলন নির্ভর করে চয়নতলের নিচের পত্রাচ্ছাদনের (Maintenance leaf) উপর। এই আচ্ছাদনকে খাদ্যের উৎস (Source) বলা যায় এবং চয়নযোগ্য কচি মুকুলগুলোকে খাদ্য ব্যবহারকারী (Sink) বলা যায়। এদের মধ্যে সফল আন্তঃক্রিয়ার উপরই ফলনের সাফল্য নির্ভর করে।

৩. **চয়ন কৌশল** (Plucking system): গাছের বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে চয়ন কৌশল নির্ধারণ করা উচিত। আবহাওয়া ও জলবায়ুর কারণে গাছের বৃদ্ধির হার হ্রাস/বৃদ্ধি পেতে পারে। বিভিন্ন প্রকার চয়নকৌশল রয়েছে। যেমন– জনমপাতা বা ফিস (মৎস্যপুচ্ছ) পত্র চয়ন, গোলপাতা চয়ন এবং একক-পাতা চয়ন পদ্ধতি।

৪. **চয়ন বিরতি বা চয়নচক্র** (Plucking interval or round) : চয়নকালের যথাযথ বিরতি ফলন বৃদ্ধি করে। পর পর পাতা চয়নের মাঝের দিনগুলোকে বিরতি বলা হয়। এটি নির্ভর করে বর্ধনশীল ডগায় পাতা প্রসারণের ধরনের উপর। এই সময়টি হচ্ছে ডগায় পাতার প্রস্ফুটনের সময়কাল।

এই সময়কালকে Leaf period বা Phyllochron বলা হয়। যদি এই সময়কাল ৪ দিন হয়, তাহলে ১+মুকুল চয়নের পরবর্তী চারদিন বিরতি দিয়ে ২+মুকুল চয়ন করা হয় এবং তারপর ৮ দিন বিরতি দিয়ে ৩+মুকুল চয়ন করা যায় (Barua 1989)।

সুতরাং পাতা চয়নের বিরতিকাল বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক এমনকি একই এলাকায় বছরের বিভিন্ন সময় এই বিরতিকাল বিভিন্ন হয়ে থাকে। চয়নকালের বিরতি দীর্ঘ হলে ফলন বৃদ্ধি পায় কিন্তু পাতার গুণগতমান কমে যায়।

কারণ দীর্ঘ বিরতি বয়স্ক/পরিপক্ক পাতার সরবরাহ বাড়ায় (Banerjee, 1993)।

বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট দ্বারা পাতা চয়নের বিরতিকালের উপর মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল থেকে জানা যায় যে, ৭ দিনের স্থলে ১০ দিন বিরতিকাল হলে ফলন কিছুটা বৃদ্ধি পায় কিন্তু ৭ দিন বিরতিকালে ২+কুঁড়ির সংখ্যা অনেক বেশি পাওয়া যায়। নিচের ছকে BT2 ক্লোনের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত ফলাফল দেখানো হল:

পরীক্ষণ	ফলন (তৈরি চা কেজি/হেক্টর)
T_1 (৬ দিন)	১৯৫২.১৯
T_2 (৭ দিন)	২০৭৫.৮৮
T_3 (৮ দিন)	১৯০৪.৭৫
T_4 (৯ দিন)	১৯৩৮.৮৬
T_5 (১০ দিন)	২১২৪.৯৫

পাতা চয়নের মান (Plucking standard)

পাতা চয়নের মান চয়নকৃত পাতার প্রকারভেদের উপর নির্ভর করে। নিচের ছকের সাহায্যে বিষয়টি বোঝা যেতে পারে :

চয়নমান	চয়নকৃত পাতার প্রকারভেদ
উন্নতমানের (Fine)	একটি পাতা এবং একটি কুঁড়ি, দুটি পাতা এবং একটি কুঁড়ি এবং একক বানজি
আদর্শমানের (Standard)	বড় একটি পাতা এবং একটি কুঁড়ি, সম্পূর্ণ দুটি পাতা এবং একটি কুঁড়ি এবং সকল প্রকার একক বানজি।
মধ্যমমানের (Medium)	দুটি পাতা একটি কুঁড়ি এবং দুটি বানজি।
নিকৃষ্টমানের (Coarse)	দুটি পাতা একটি কুঁড়ি, দুটি পাতা একটি কুঁড়ির চেয়ে বড় মুকুল এবং দুটি বানজি
অতিনিকৃষ্টমানের (Very coarse)	তিনটি পাতা একটি কুঁড়ি, তিনটি পাতা একটি কুঁড়ির চেয়ে বড় এবং দুটি বানজি।

পাতা-চয়নের ক্ষেত্রে কিছু জরুরি পরামর্শ

১. ফিস পত্র (fishleaf) সহ চয়ন না করে পরিপক্ক পাতাগুলোর উপরিতলে চয়ন করা হলে বর্ধনশীল ডগায় শর্করা সরবরাহ নিশ্চিত হয়। এবং সেই সাথে গোড়ায় শ্বেতসার সঞ্চয়ের ঘাটতি পূরণ হয়। এর ফলে পরবর্তী সময় বুশ যখন দূর্বল হয়ে পড়ে বিশেষ করে কিছু প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে (যেমন- শিলাবৃষ্টি, খরা ইত্যাদি) তখন উপকার পাওয়া যায়। তবে এর নেতিবাচক

দিক হল চয়ন-চক্র দ্রুত উঁচু হয়ে যায়।

২. LP এবং DS এর আওতায় ৯ দিন বিরতিকালসহ পাতা চয়ন করা হলে ফলন বৃদ্ধি পায় এবং বায়োমাস যথাক্রমে ১০% এবং ১৩% বৃদ্ধি পায়। LS ফসলের ক্ষেত্রে ৭ দিন বিরতিকাল অনুসরণ করলে বায়োমাস আরও বৃদ্ধি পায়।

৩. পাতা চয়নের বিরতিকাল ফলনের উপর সার্বিক প্রভাব ফেলে। ঊর্ধ্বে একটি নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত বিরতিকাল যত দীর্ঘ হয়, ফলন তত বেশি হয়।

৪. কোন একটি ক্লোনের ক্ষেত্রে ৯ দিন বিরতিকালে পাতা চয়ন করা হলে ফলন বেড়ে যেতে পারে, কিন্তু ভিন্ন ক্লোন বা ক্লোনসমূহের ক্ষেত্রে ফলন হ্রাস পেতে পারে। স্বল্প বিরতিকালে উত্তম চয়ন উপযোগী কুঁড়ি পাওয়া যায়।

৫. বিরতিকাল ৭ দিন থেকে ২১ দিন করা হলে সার্বিকভাবে ফলন বৃদ্ধি পায় কিন্তু চয়ন উপযোগী ডগার সংখ্যা হ্রাস পায়। এক্ষেত্রে একপাতা এককুঁড়ি এবং দুই পাতা এক কুঁড়ির সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পায় কিন্তু তিন কিংবা চারটি পাতা একটি কুঁড়ির সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়ে।

৬. ৭ দিন বা ২১ দিন বিরতিকালের চেয়ে ১৪ দিন বিরতিকালে পাতা চয়ন করা হলে সার্বিক ফলন বাড়ে। চয়নকাল বৃদ্ধি পেলে চায়ের অর্জিত মূল্য সাময়িক হ্রাস পেলেও অতিরিক্ত ফলনের কারণে প্রাপ্ত মূল্যের তুলনায় তা নিতান্ত কম।

৭. শ্রীলংকায় নিচু অঞ্চলে ৪ দিন সময়কালের পাতা চয়ন এবং ৬ দিনের বিরতিকাল অনুসরণ করে ১৬% পর্যন্ত ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে।

৮. আফ্রিকাতে ৭ দিন বিরতিকালের স্থলে ১৪ দিন বিরতিকাল অনুসরণ করে ৩৮% বেশি ফলন সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে।

৯. নতুন পাতার প্রসারণকাল পর্যন্ত বিরতিকাল অনুসরণ করা হলে ভালো ফল পাওয়া যায় বলে কেউ কেউ মত প্রকাশ করেন।

১০. পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রা দীর্ঘসময়ব্যাপী উচ্চ থাকলে কমসময় বিরতিকাল অনুসরণ করা উচিত। উত্তর-পূর্ব ভারতে ভরা মৌসুমে পাতা স্ফুটনের সময়কালের উপর ভিত্তি করে ৭ দিন বিরতিকাল অনুসরণ করা হয়। এতে একটি সমীকরণ পাওয়া যায়– ২×পাতা স্ফুটন সময়কাল ১। তবে বিভিন্ন ক্লোনের ক্ষেত্রে পাতা স্ফুটনের সময়কালে (Leaf period) পার্থক্য হতে পারে।

ছাঁটাই এবং পাতা চয়ন

ছাঁটাই (Pruning)

অধিক এবং দীর্ঘমেয়াদে উৎপাদনশীলতা ধরে রাখার ক্ষেত্রে ছাঁটাই (Pruning) এর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু হতে পারে না। চা গাছের ছাঁটাই একটি বৈজ্ঞানিক প্রথা। ছাঁটাই এর মাধ্যমে চা গাছকে ঝোপালো করে 'বুশ' তৈরি করা হয়, ফলে অঙ্গজ বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে। ছাঁটাইকরণের অন্যান্য উদ্দেশ্যগুলো :

১. গাছগুলোকে আকৃতি দেয়া যাতে জায়গার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হয়।

২. গাছের অগ্রমুকুলের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা এবং ঝোপের আকার ও উচ্চতা নিয়ন্ত্রণ করা।

৩. পাতা চয়নের জন্য গাছগুলোকে এমন একটি উচ্চতায় রাখা যাতে একজন পাতাচয়নকারী অনায়াসে চয়ন করতে পারে।

৪. মৃত, রোগাক্রান্ত এবং পুরাতন শাখা-প্রশাখা অপসারণের মাধ্যমে বয়স্ক গাছগুলোর উৎপাদনশীলতা বজায় রাখা।

৫. গাছের অভ্যন্তরীণ পরিবেশকে এমনভাবে রাখা যাতে সর্বোচ্চ উৎপাদন নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি বালাই এবং রোগের বিস্তার কমে যায়

৬. সহজে এবং কম খরচে ফসল সংগ্রহ করা।

৭. নতুন সতেজ শাখা সৃষ্টি করা এবং গাছের শারীরবৃত্তীয় চাহিদা পূরণ করা।

৮. তৈরি চায়ের গুণগতমান নিশ্চিত করা

চা গাছের প্রকরণ, আবহাওয়া এবং বিদ্যমান উৎপাদন অবস্থা বিবেচনা করে ছাঁটাই পদ্ধতি নির্ধারণ করা প্রয়োজন। ছাঁটাইয়ের মাধ্যমে কাণ্ডের আকৃতি সুবিধেজনক রাখার পাশাপাশি একটি স্থির উৎপাদনশীলমাত্রা বজায় রাখা সম্ভব হয়। কিন্তু ছাঁটাইয়ের শারীরবৃত্তীয় এবং জৈব-রাসায়নিক ভিত্তি সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। মূলত ছাঁটাই প্রক্রিয়া এমন হওয়া উচিত যাতে গাছের বৃদ্ধি এবং উৎপাদনশীলতার মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় থাকে।

সুতরাং ছাঁটাই প্রক্রিয়া এমন হওয়া উচিত যাতে গাছের সার্বিক দিক বিবেচনায় রাখা যায় এবং গাছে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য সঞ্চিত থাকে। কেননা ছাঁটাইয়ের মাধ্যমে গাছের অভ্যন্তরীণ খাদ্য সঞ্চয়ের একটি বড় অংশ হ্রাস পায়।

উত্তম ছাঁটাই প্রক্রিয়া আমরা তাকেই বলব যার মাধ্যমে ছাঁটাই পরবর্তী সময়ে গাছের সবচেয়ে কম ক্ষতি হয়, বিশেষ করে শ্বসন-প্রক্রিয়ার সর্বনিম্ন ক্ষতি হয় এবং ফলন ইনডেক্স (Harvest Index) বৃদ্ধি পায় (Barua 1961)। সন্দেহ করা হয় যে, কাণ্ডের আকৃতি (উচ্চতা) হ্রাস করা হলে উদ্ভিদের অভ্যন্তরে পুষ্টিপ্রবাহ এবং পুষ্টি ব্যবহার বিঘ্নিত হতে পারে (Tanton 1979)। কিন্তু ছাঁটাই এর ক্ষেত্রে গাছের

কার্বহাইড্রেট সঞ্চয় একটি প্রধান নিয়ামক ভূমিকা রাখে, কারণ যথেষ্ট পরিমাণ কার্বহাইড্রেট সঞ্চয় না থাকলে যেকোন ধরনের ছাঁটাই গাছের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হবে। উদ্ভিদদেহে সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে তৈরি কার্বহাইড্রেটের অতিরিক্ত অংশটি মূলে সঞ্চিত থাকে। সে তুলনায় প্রোটিনের সঞ্চয় উদ্ভিদের দেহের সমস্ত অংশে বিদ্যমান থাকে বিধায় ছাঁটাই-এর ক্ষেত্রে তা সরাসরি প্রাসঙ্গিক নয়। সুতরাং যখন ছাঁটাই এর মাধ্যমে অসংখ্য শাখা-প্রশাখা এবং পত্র-পল্লব ফেলে দেয়া হয়, তখন মূলে সঞ্চিত কার্বহাইড্রেট বা স্টার্চ এর সঞ্চয় উদ্ভিদকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। কাজেই ছাঁটাই এর কৌশল নির্ধারণে কার্বহাইড্রেট বা শর্করার সঞ্চয় অবশ্যই বিবেচ্য বিষয় এবং এমনকি ছাঁটাই-এর সময়কাল এমনভাবে নির্ধারণ করা উচিত যেন কার্বহাইড্রেট সঞ্চয় সে সময় যথেষ্ট পরিমাণে থাকে (Sharma 1984)।

তেজস্ক্রিয় কার্বন-ডাই-অক্সাইড ব্যবহারের মাধ্যমে গবেষণায় দেখা গেছে যে, উত্তর-পূর্ব ভারতে অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত চা গাছগুলোর নিচের অংশে শ্বেতসারের মজুদ গড়ে উঠতে থাকে যার পরিমাণ অক্টোবর মাসে ১০ শতাংশ থেকে ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ফেব্রুয়ারি মাসে সর্বোচ্চ ২১ শতাংশে পৌঁছায় (Manivel 1980)। যেহেতু সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে উৎপন্ন দ্রব্যগুলোর চলাচল এবং শ্বেতসারের মজুদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বিদ্যমান, সেহেতু সাধারণভাবে ধরে নেয়া হয় যে, ডিসেম্বর মাস থেকে জানুয়ারি মাস পর্যন্ত সময়কাল ছাঁটাইকরণের জন্য সর্বোত্তম এবং অক্টোবরের পূর্বে তা কিছুতেই করা যাবে না।

শ্লথ বৃদ্ধিকালে ছাঁটাইয়ে বিরতি দেয়া অত্যাবশ্যক যাতে করে শ্বেতসারের মজুদ সন্তোষজনক হতে পারে, কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, সকল দেশের ক্ষেত্রে এ নীতিটি প্রযোজ্য নয় কেননা ছাঁটাইকরণের উপযুক্ত সময়কাল স্থানীয় উৎপাদন পরিবেশের উপর নির্ভর করে ভিন্ন ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক।

শ্রীলংকা এবং পূর্ব আফ্রিকাতে শুষ্ক সময়ের ঠিক পরবর্তী সময়টিকেই আদর্শ সময় হিসেবে ধরে নেয়া হয়। মূলত গাছের বৃদ্ধির হার পর্যালোচনা করেই ছাঁটাইয়ের জন্য উপযুক্ত সময় নির্ধারণ করা হয়। সেই সময়টি এমন হওয়া উচিত যখন গাছের বৃদ্ধির হার এত মন্থর হয়ে যায় যে, শর্করা উৎপাদন হ্রাস পায়, কেননা ঐ সময়ে ছাঁটাই করা হলে কিছু নতুন কুঁড়ি গজাবে এবং পরবর্তী গরমকালের পূর্বেই সেগুলো সবল-সতেজ হয়ে উঠবে। ছাঁটাইকরণের উপযুক্ত সময়কাল নির্ধারণে অন্য যে সমস্ত বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন সেগুলো হচ্ছে- সূর্যের তীব্র তাপে দগ্ধ হওয়া থেকে পরিত্রাণ পাওয়া, খরার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া এবং বিভিন্ন বালাই ও রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া। ছাঁটাইকরণের সময় এবং পরিমাণ নির্বিশেষে ছাঁটাইয়ের সাফল্য অন্যান্য কিছু ভৌত কর্মকাণ্ডের উপরও নির্ভর করে যেমন, দুর্বল এবং আড়াআড়িভাবে বিন্যস্ত ডালপালা কেটে ফেলা। এটি না করা হলে এসকল অকার্যকর ক্ষুদ্র শাখা-প্রশাখা গাছের কুঁড়ির সুষ্ঠু বৃদ্ধি ও বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে

এবং উৎপাদন হ্রাস করে। 'বানজি' বা বন্ধ্যা ডগাগুলো নতুন কুঁড়ি উৎপাদন বিঘ্নিত করে। মৃত ডগাগুলোকে অপসারণ করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ কেননা এগুলো ছত্রাক আক্রমণের কারণ হতে পারে।

এটি খুব স্বাভাবিক যে, অনুৎপাদনশীল ডগা এবং শাখাগুলোকে অপসারণ করা হলে নতুন কুঁড়িগুলোর বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়। কিন্তু এর মাত্রা কী হবে তা নিয়ে মতভেদ আছে, কেননা কিছু শাখা-প্রশাখা থাকা বাঞ্ছনীয় একারণে যে, তাতে গাছের শর্করা উৎপাদন অব্যাহত থাকে। কিন্তু একথাও সত্য যে, যদি বেশিরভাগ শাখা-প্রশাখা 'বানজি' বা বন্ধ্যা হয়, তাহলে হিতে বিপরীত হতে পারে। তাছাড়া মরা বা বন্ধ্যা ডালপালা অপসারণের সময়কাল নির্ধারণ করাও জরুরি। এ সময়টি ছাঁটাইকরণের ঠিক পরপর হলে সবচেয়ে ভালো হয় এবং খেয়াল রাখতে হবে যে, কুঁড়ি জন্মানো শুরু হলে তা কিছুতেই করা যাবে না।

ছাঁটাই পরবর্তী বৃদ্ধি এবং আচরণ থেকে জানা যায় যে, বিভিন্ন জাতের চা গাছের ক্ষেত্রে শুষ্ক ওজন বৃদ্ধি এবং শাখা-প্রশাখা বিস্তারের মাত্রার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে (Banerjee, 1988)। সাধারণত নিম্নউচ্চতায় ছাঁটাই করা হলে, গাছের শুষ্ক ওজনের উৎপাদন পরিমাণও কম হয়। তবে এটি প্রধানত গাছটির জেনোটাইপের উপর নির্ভর করে (Banerjee. 1988)। যাহোক, ছাঁটাই পরবর্তী বৃদ্ধির সাথে সাথে গাছের শুষ্ক ওজন এবং সঞ্চয়ের মাত্রাও বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন চা গাছের ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধি এবং সঞ্চয়ের মাত্রা বিভিন্ন হয়। এর কারণ বংশগত হতে পারে (Banerjee. 1988)।

এ সম্পর্কে খুব কমই জানা গেছে যে, ডালপালা ছাঁটাই এবং ছাঁটাইকরণের পরবর্তীতে গাছের আকার হ্রাস পাওয়ার কারণে শ্বসনের হার কমার ফলে গাছের জন্য লাভজনক হয় কীনা (Roberts and Keys 1978) এবং এর ফলে ফলন ইনডেক্স বৃদ্ধি পায় কিনা (Magambo and Cancll 1981)। সুতরাং ছাঁটাইকরণের একটি আদর্শ (Standard) অনুসরণের জন্য যেমন ঝোঁপের উচ্চতা এবং কাণ্ডের পুরুত্ব বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন, তেমনি গাছের শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ যেমন ছাঁটাই পরবর্তী বৃদ্ধি ও বিকাশ এবং পুনর্গঠন প্রক্রিয়াকেও বিবেচনায় নিতে হবে। ছাঁটাইকরণের সাথে চায়ের গুণগতমানের সম্পর্ক আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা বিবেচনায় নিয়ে ছাঁটাইয়ের ব্যাপকতা বা পরিমাণ নির্ধারণ করা উচিত। সাধারণভাবে হালকা ছাঁটাই করা হলে ভালোমানের চা পাওয়া যায়, তবে ক্ষেত্রবিশেষে অধিক ছাঁটাই গুণগতমান নিশ্চিত করে, বিশেষ করে সবুজ চায়ের ক্ষেত্রে (Aoki 1984)। সারকথা হল, ছাঁটাইকরণের মাধ্যমে চা গাছের ঝোঁপের উপরের ছোট ছোট ডালপালাগুলো কেটে গাছের আকৃতি এমন রাখা হয় যাতে পরের বছর সর্বোৎকৃষ্ট এবং সবল কচি ডগা পাওয়া যায়।

পঞ্চদশ অধ্যায়

সেচ ও পানি নিষ্কাশন
(Irrigation and Drainage of tea)

গাছের বৃদ্ধি ও উৎপাদনে পানির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গাছ মূলের সাহায্যে মাটি হতে পানি সংগ্রহ করে পাতা দিয়ে বের করে দেয়। এটি গাছের একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া যাকে প্রস্বেদন (transpiration) বলা হয়। যত বেশি পানি পাতা দিয়ে বের হয়ে যাবে তত বেশি গাছের বৃদ্ধি ও উৎপাদন বাড়বে। পানি শোষণের পরিমাণের সাথে গাছের বৃদ্ধির সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। দেখা যায় যে, ১ কেজি শুকনো পদার্থ (dry matter) তৈরি করতে গাছকে ২০০-১০০০ কেজি পানি অপসারণ করতে হয়। পানির এ পরিমাণ নির্ভর করছে গাছের প্রজাতি ও পানি ব্যবহারের দক্ষতার উপর। তাছাড়া মাটি হতেও পানি উবে যাচ্ছে যাকে বাষ্পীয়ভবন (evaporation) বলা হয়। মাটি হতে প্রতিনিয়তই এ দু'ভাবে পানি বাতাসে উড়ে যাচ্ছে। এ দু'প্রক্রিয়াকে একত্রে Evapotranspiration বলা হয়।

প্রতিদিন কী পরিমাণ পানি Evapotranspiration (ET) অর্থাৎ প্রস্বেদন ও বাষ্পীয়ভবন) প্রক্রিয়া দ্বারা মাটি হতে উবে যায় তা নির্ভর করে পরিবেশের তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বায়ুর গতি ও সূর্যালোকের সময়কালের উপর।

যখনই মাটি হতে গাছে পানি সরবরাহের মাত্রা গাছের চাহিদার তুলনায় কমে যেতে শুরু করে তখনই উৎপাদন কমতে থাকে। মাটিতে পানির পরিমাণ কমতে কমতে যখন এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে গাছ আর মাটি হতে পানি শোষণ করতে পারে না, তখনই গাছ মারা যেতে শুরু করে। এ পরিস্থিতিকে 'উইলটিং পয়েন্ট' (Wilting point) বলা হয়। সুতরাং উৎপাদন বৃদ্ধি বা উৎপাদন স্থিতিশীল রাখতে এবং গাছকে বাঁচিয়ে রাখতে শুকনো মৌসুমে সেচের মাধ্যমে মাটিতে পানি সরবরাহ করতে হয়।

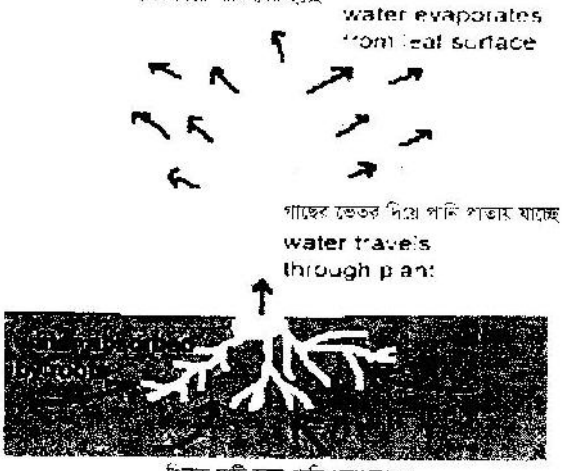

শিকড় মাটি হতে পানি গ্রহণ করছে

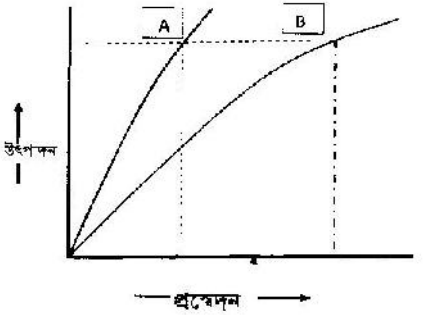

১ কেজি শুকনা পদার্থের জন্য : ২০০ - ১০০০ কেজি পানির প্রয়োজন

প্রস্বেদনের সঙ্গে উৎপাদনের সম্পর্ক

অপরদিকে মাটিতে অতিমাত্রায় পানি থাকলেও গাছের জন্য ক্ষতিকর : যা উৎপাদন কমিয়ে দেয় এমনকি মৃত্যুও ঘটায়। মাটিতে অসংখ্য ছোট ও বড় ছিদ্র (Mico and Macro pore) থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় ছোট ছিদ্রতে পানি এবং বড় ছিদ্রতে বাতাস থাকে পানি ও বাতাস উভয়ই গাছের বৃদ্ধি এবং মাটিতে গাছের খাদ্য ব্যবহার উপযোগী করে থাকে। যখনই মাটির সমস্ত ছিদ্রগুলো পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে যায় তখন আর বাতাস থাকে না। এ পরিস্থিতিকে জলাবদ্ধতা (Waterlog) বলা হয়। আমাদের দেশে বর্ষা মৌসুমে অতিবৃষ্টির জন্যই এরূপ জলাবদ্ধতা দেখা দেয়

বিশেষ করে নিম্নভূমিতে. এমতাবস্থায় নর্দমা (Drain) খনন করে অতিরিক্ত পানি অপসারণ করা একান্ত প্রয়োজন.

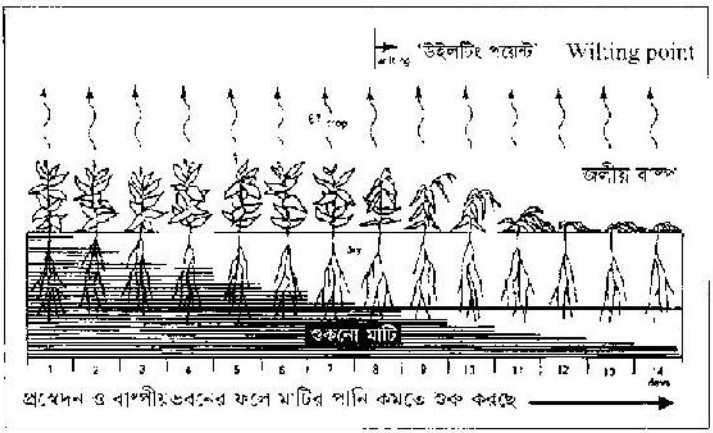

বাংলাদেশে চা গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য বছরে অনুমানিক নেট ১২০০ মি.মি পানির প্রয়োজন হয়। এ হিসাবে দেখা যায় যে, সারা বছরে এক একর জমিতে ১,২০,০০,০০০ (এক কোটি বিশ লক্ষ) লিটার পানি সরবরাহ করতে হয় বৃষ্টি বা সেচের মাধ্যমে।

বাংলাদেশে বছরে ১৬৫০ হতে ৩১৪০ মি.মি বৃষ্টি হয়ে থাকে। যা গাছের চাহিদার তুলনায় যথেষ্ট। দেখা যায় যে, এ বৃষ্টি সারা বছর সুষমভাবে না হওয়ায় শুকনো মৌসুমে পানির অভাব এবং বর্ষাকালে জলাবদ্ধতা দেখা দেয়

সেচ

সেচ যন্ত্র ও এর অনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি এবং সেচের নিমিত্তে পানির আধার সেচের প্রধান উপকরণ। ছোট বড় প্রত্যেক চা বাগানের জন্য এ সমস্ত উপকরণের নিশ্চয়তা থাকতে হবে তাছাড়া সেচপ্রতি 'পানির পরিমাণ', 'কখন', ও 'কত সময়ব্যাপী' সেচ দিতে হবে সে সম্বন্ধেও জ্ঞান থাকা আবশ্যক। যন্ত্রপাতি স্থাপনের উপরেও যথাযথ ধারণা থাকতে হবে। অন্যথায় সেচের খরচ বৃদ্ধি পাবে এবং কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য সাধিত হবে না।

সেচ প্রদানে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় নিতে হবে–

১. সেচের জন্য পানির উৎস নিশ্চিত করা।
২. সেচ পদ্ধতি নির্ধারণ ও সেচের জন্য প্রয়োজনীয় সেচযন্ত্র, যন্ত্রাংশ ক্রয় ও স্থাপন।

৩. সেচের সম্ভাব্য সময় নির্ধারণ।

৪. সেচের পরিমাণ নির্ধারণ

৫. মাটিতে পানি শোষণ ক্ষমতা অনুযায়ী একক সময় পরিমিত সেচে পানি প্রয়োগ।

৬. সেচের বিরতি বা কতদিন পরপর সেচ দিতে হবে তা নির্ধারণ।

পানির পরিমাণ

প্রতি সেচের পানির পরিমাণ নিরূপণের জন্য নিম্নলিখিত তথ্যাদি জানা প্রয়োজন:

১. মাটির সহজলভ্য পানির (available water) পরিমাণ

২. গাছের শেকড়ের গভীরতা (root depth)

৩. মাটির সহজলভ্য পানির ঘাটতি (soil water deficit)

৪. পাতা দ্বারা মাটি কতটুকু আবৃত (leaf coverage)

৫. সেচ সময়ের ET এর পরিমাণ

ধরা যাক, এক সেকশনের মাটির বুনট বেলে দোঁআশ পানির ঘাটতি ৪০% হওয়ার পরই সেচ দেবার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। উক্ত জমির গাছের শেকড় গভীরতা ০.৫ মিটার, ৭৫% জমি পাতা দ্বারা আবৃত। ET ৪ মি.মি । মাটির পানি শোষণ ক্ষমতা ১০ মি.মি। জমির পরিমাণ ২ হেক্টর। এমতাবস্থায় কতটুকু পানি কত সময়ব্যাপী কতদিন পরপর সেচ দিতে হবে তার একটি হিসাবে দেয়া হল।

বেলে দোঁআশ মাটির সহজলভ্য পানির পরিমাণ সাধারণত ১০০ মি.মি/ মিটার।
৪০% ঘাটতিতে পানির পরিমাণ = (১০০×০.৪০)
= ৪০মি. মি/ মিটার

নেট পানির পরিমাণ = ৪০× শেকড়ের গভীরতা
= ৪০× ০.৫
= ২০ মি.মি

মোট পানির পরিমাণ = ২০÷০.৭ (এখানে সেচ কার্যক্রমের দক্ষতা ৭০% ধরা হয়েছে)
= ২৮.৫৭ মি.মি

মোট পানির আয়তন = ২৮.৫৭× ১০,০০০×২
= ৫,৭১,৪০০ লিটার
(এককালীন সেচের জন্য প্রয়োজন)

কতদিন পর পুনঃসেচ = ২০÷ (৪ ×০.৭৫)
= ৭ দিন

কত সময়ব্যাপী সেচ দিতে হবে= মোট পানির পরিমাণ÷মাটির পানি শোষণ ক্ষমতা
= ২৮.৫৭ ÷ ১০
= ২.৮৭ ঘণ্টা অর্থাৎ ৩ ঘণ্টা

এখানে উল্লেখ্য যে, সেচ দেয়ার সময় অনেক পানির অপচয় হয়ে থাকে। এ অপচয়ের পরিমাণ সাধারণত ৩০-৫০% হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় এ অপচয়/ক্ষতিপূরণ করতে উক্ত ৩০-৫০% বেশি পানি সরবরাহ করতে হয়। সেজন্য সেচ কার্যক্রমের দক্ষতা ৫০%-৭০% ধরা হয়ে থাকে

মাটির সহজলভ্য পানির (Available water) পরিমাণের উপর এককালীন সেচের পরিমাণ এবং কতদিন পরপর সেচ দিতে হবে তা নির্ভর করে। যেমন বালি মাটির সহজলভ্য পানির পরিমাণ কম। তাই সে মাটিতে সেচের নিমিত্তে পানি কম লাগবে বেশি পানি দিলে তা অপচয় হবে। এক্ষেত্রে এক সেচের সময় থেকে পরবর্তী সেচের বিরতি কম হবে। অন্যদিকে কাদা মাটির সহজলভ্য পানির (Available water) পরিমাণ বেশি থাকায় সেচের পানি বেশি লাগবে সেক্ষেত্রে এক সেচের সময় থেকে পরবর্তী সেচের বিরতি বেশি হবে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, যখনই সেচ দেয়া হবে তখনই শেকড়ের গভীরতা পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে ভেজাতে হবে। সহজ পর্যবেক্ষণের জন্য বাজারে প্রাপ্য কাঠমিস্ত্রির ব্যবহার্য মোটা প্যাচযুক্ত বর্মা (Carpenter's auger) মাটিতে ঢুকিয়ে দিয়ে বিভিন্ন গভীরতায় মাটিতে পানির উপস্থিতি পরীক্ষা করা যেতে পারে।

সেচ পদ্ধতি

চা বাগানের জন্য স্প্রিংক্লার সেচ পদ্ধতিই উত্তম। এর সাহায্যে জমিতে সুষমভাবে সেচের পানি সরবরাহ করা যায়। তবে সে জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব দিতে হবে:

১. এক স্প্রিংক্লার হতে অপর স্প্রিংক্লার এর দূরত্ব এমন হতে হবে যাতে এক স্প্রিংক্লার এর পানি অন্য স্প্রিংক্লার গায়ে পড়ে। নিম্নে চিত্রে দেখানো গেল।

২. স্প্রিংক্লার প্রেসার কম বা বেশি হলে পানি সুষমভাবে বণ্টন করা যায় না। এক জায়গার মাটি বেশি ভিজে অনেক গভীরে চলে গিয়ে পানির অপচয় হয় অন্যদিকের মাটি সামান্য ভিজে। এ অবস্থা হতে রক্ষা পেতে স্প্রিংক্লার নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত প্রেসারে পরিচালনা করতে হবে।

৩. স্প্রিংক্লার হতে পানি সরবরাহের মাত্রা (Discharging capacity) মাটির পানি শোষণ ক্ষমতার বেশি হবে না। যদি এ মাত্রা বেশি হয় তবে পানির অপচয় বেশি হবে। এক্ষেত্রে সরবরাহের মাত্রা মাটির শোষণ মাত্রার সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে হবে যাতে মাটির উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত না হয়। বেলে দোঁআশ মাটির জন্য পানি সরবরাহ মাত্রা ঘণ্টায় ১০ মি.মি হওয়া সঙ্গতিপূর্ণ

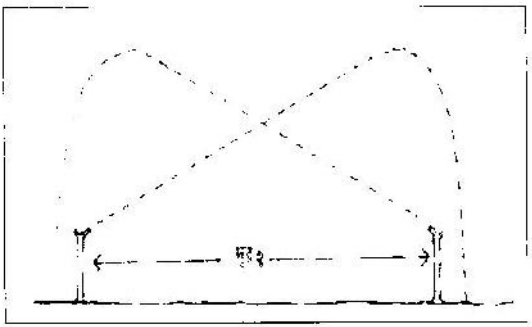

কখন সেচ দেয়া উচিত?

দেখা যায় যে, মাটির সহজলভ্য পানির পরিমাণ একটি নির্দিষ্ট মাত্রার নিচে চলে গেলে উৎপাদন নিম্নমুখী হতে শুরু করে। এ নির্দিষ্ট মাত্রাকে সন্ধিক্ষণ মাত্রা (critical point) বলা হয়। যদি এ পানি কমতে কমতে শূন্যের কাছাকাছি চলে যায় তখন গাছ মরতে শুরু করে। এ সন্ধিক্ষণ মাত্রার পরিমাণ গাছের প্রকারভেদে ১২-৩২ মি.মি হয়ে থাকে। তাই উৎপাদন স্থিতিশীল রাখতে হলে পানির পরিমাণ এ পর্যায়ে পৌঁছার সাথে সাথে সেচ দেয়া উচিত। তবে আমাদের দেশে সাধারণত গাছকে বাঁচিয়ে রাখতে সেচ দেয়া হয়। দিনের বেলায় বিশেষ করে দুপুরে গাছের পাতা যদি নিচের দিকে অস্বাভাবিকভাবে ঝুলে পড়ে, বুঝতে হবে মাটির সহজলভ্য পানির

পরিমাণ শূন্যের কাছাকাছি এসে গেছে। এ অবস্থা কয়েকদিন চলতে থাকলে গাছ মারা যাবে, যদি সেচ দেয়া না হয়।

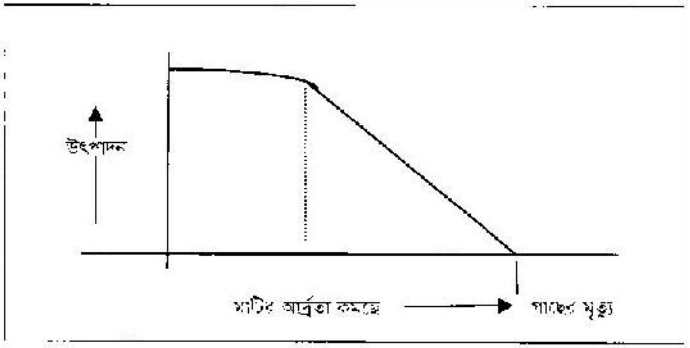

মাটির আর্দ্রতার সঙ্গে উৎপাদনের সম্পর্ক

সহজলভ্য পানির পরিমাণ সব মাটির জন্য এক নয়। এটি মাটির বুনট, গঠন ও জৈব পদার্থের উপর নির্ভরশীল। নিম্নে মাটির বুনট ভিত্তিতে সহজলভ্য পানির পরিমাণ দেয়া হল।

বুনট (Texture)	সহজলভ্য পানির পরিমাণ (মি.মি/মি.)
বালি মাটি (Loamy Sand)	৭৫- ৮৫
বেলে দোঁআশ মাটি (Sandy Loam)	১০০ -১২০
দোঁআশ মাটি (Loam)	১৫০ - ২০০
কাদা মাটি (clay)	১৪০ - ১৭৫

মাসিক গড় বৃষ্টিপাত ও গাছের পানির চাহিদা (ইটি)

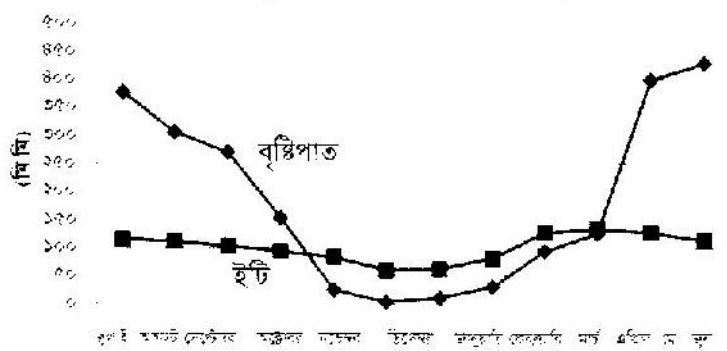

জুন-জুলাই মাসে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৪০০ মি.মি এর বেশি এবং ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে এ পরিমাণ প্রায় শূন্যের কাছাকাছি। অন্যদিকে গাছের পানির চাহিদা মার্চ-এপ্রিল মাসে গড়ে ১৩০ মি.মি এবং ডিসেম্বর- জানুয়ারিতে ইহার পরিমাণ ৬০ মি.মি। দেখা যায় যে, নভেম্বর হতে এপ্রিল মাস পর্যন্ত মোট চাহিদার তুলনায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অনেক কম তাই নভেম্বর হতে এপ্রিল মাস পর্যন্ত সেচ দিয়ে গাছকে সতেজ রাখা এমনকি মৃত্যুর হাত হতে রক্ষা করা উচিত।

নার্সারি সেচ

নার্সারি সেচ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইহাতে পানির ঘাটতি কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। মাটি যাতে সবসময় স্বাভাবিক ভেজা থাকে সে বিবেচনায় রেখে সেচ দিতে হবে। পানির অপচয় যাতে না হয় সেজন্য সরু ছিদ্র বিশিষ্ট ঝাজরি বা অল্প মাত্রা পানি সরবরাহকারী স্প্রিংক্লার ব্যবহার করা উচিত। উল্লেখ্য যে, প্রাইমারি বেডের মাটি কমপক্ষে ২ ইঞ্চি ও সেকেন্ডারি বেডে স্থাপিত চারার ব্যাগের তলা পর্যন্ত ভিজাতে হবে

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

সিটিসি চা তৈরি প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক
(Aspects of CTC processing of tea)

উইদারিং (withering): চা শিল্পে উইদারিং বলতে বাগান থেকে চয়নকৃত চা পাতাগুলোকে ফ্যাক্টরিতে আনার পর আর্দ্রতা এবং বায়ুপ্রবাহ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে নির্দিষ্ট সময় রেখে চা পাতাগুলোর আর্দ্রতা কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় নামিয়ে আনা এবং অন্যান্য ভৌত ও রাসায়নিক গুণাবলী অর্জনকে বুঝায়। কালো চা প্রস্তুতির ক্ষেত্রে উইদারিং হচ্ছে একটি সাধারণ কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। উইদারিংকে দুইভাগে ভাগ করা হয়, যথা – ভৌত এবং রাসায়নিক।

ভৌত উইদারিং প্রক্রিয়ার মূল উদ্দেশ্য

১) চয়নকৃত পাতা থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ আর্দ্রতা কমানো। এর পরিমাণ আরসি (RC) চায়ের ক্ষেত্রে ১০-১৫% এবং অন্য চা এর ক্ষেত্রে ১৫-২০%

২) চা প্রস্তুতকরণের পরবর্তী ধাপগুলোর জন্য চা পাতাগুলোকে প্রস্তুত করা।

৩) পাতাগুলোর দৃঢ়তা কমিয়ে শিথিল করা যাতে রোলিং ভাল হয়।

রাসায়নিকভাবে উইদারিং থেকে নিচের পরিবর্তনগুলো ঘটে

১) দ্রবণীয় প্রোটিন, মুক্ত অ্যামাইনো এসিডসমূহ এবং সরল শর্করাসমূহের মাত্রা বৃদ্ধি পায়।

২) পেপসিডেজ নামক উৎসেচক (enzyme) দ্বারা প্রোটিনের ভাঙ্গনের মাধ্যমে অ্যামাইনো এসিডের ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় যা চা এর সুগন্ধ সৃষ্টি করে।

৩) কালো চায়ের কাপে ক্যাফেইনের যোগান দেয়

৪) জৈব এসিডের মাত্রা বৃদ্ধি করে যার ফলে চা এর সুরভি বৃদ্ধি পায় এবং পলিফেনল অক্সিডেজের (PPO) কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়।

যে সকল কারণে উইদারিং প্রভাবিত হয়

১) **উইদারিং এর সময়কাল** : ১০ থেকে ১৫ শতাংশ আর্দ্রতা কমানোর জন্য সিটিসি চা তৈরিকরণের ক্ষেত্রে ১২ থেকে ১৮ ঘণ্টা সময় প্রয়োজন হয়। নিচের বিষয়গুলোর উপর আর্দ্রতা কমানো হার এবং উইদারিং এর সময় নির্ভর করে :

ক) পাতার প্রকার
খ) ছড়ানো পাতার পুরুত্ব
গ) বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা
ঘ) পাতার অবস্থা (ভেজা অথবা শুকনা)

ক) পাতার প্রকার (Type of leaf): পাতার ভৌত অবস্থা, রাসায়নিক অবস্থা, বয়স ইত্যাদির উপর অনেকাংশে উইদারিং এর ব্যাপ্তিকাল নির্ভর করে। কচি পাতার চেয়ে রুক্ষ বয়স্ক পাতার ক্ষেত্রে উইদারিং এর সময় অনেক বেশি লাগে। পরীক্ষায় দেখা যায়, শতকরা পঞ্চাশভাগ রুক্ষ পাতাসহ ১০০ কেজি পাতা ১৫ ঘণ্টা উইদারিং করা হলে ১৮ লিটার পানি অপসারিত হয় কিন্তু শতকরা ১৫ ভাগ রুক্ষ পাতাসহ ১০০ কেজি পাতা থেকে একই সময়ে ৩৫ লিটার পানি অপসারিত হয়।

খ) ছড়ানো পাতার পুরুত্ব (Thickness of spread) : ট্রাফের আকারের উপর ভিত্তি করে উইদারিং ট্রাফ ফ্যানের নকশা এমনভাবে করা হয় যাতে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় পানিকে বাষ্পায়িত করা যায়। উইদারিং ট্রাফে প্রতি বর্গফুট স্থানে ২.৫ কেজি থেকে ৩ কেজি চা-পাতাকে এমনভাবে ছড়ানো হয় যাতে পাতা বিস্তারের পুরুত্ব ৮ ইঞ্চি হয়। খুব পাতলা করে পাতা বিছানো হলে সঠিক মাত্রায় এবং সমভাবে উইদারিং হয় না। তাছাড়া অনেক জায়গারও অপচয় হয়। কোন কোন কারখানায় ভরা মৌসুমে প্রতি বর্গফুটে ৪/৫ কেজি পাতা লোড করা হয় যার ফলে উইদারিং কাঙ্ক্ষিত পরিমাণে হয়না।

গ) **বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা** (Relative humidity of the air) : উইদারিং প্রক্রিয়ায় বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা বা শুকানোর ক্ষমতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বাতাস শুষ্ক হলে উইদারিং দ্রুত হয়। কিন্তু আর্দ্র বাতাস আর্দ্রতা শুষে নিতে পারে না। ৭° ফারেনহাইট হাইগ্রোমিটার তাপমাত্রার পার্থক্যের ক্ষেত্রে প্রতি ১০০০০০ঘনফুট/মিনিট বাতাসের বাষ্পায়ন ক্ষমতা ৪.৫ লিটার উদাহরণস্বরূপ-

ট্রাফের আকার ৪০ × ৫ অর্থাৎ ২০০ বর্গফুট, প্রতি বর্গফুট জায়গায় পাতার পরিমাণ = ৩ কেজি, ট্রাফের ধারণক্ষমতা = ২০০ × ৩ = ৬০০ কেজি হলে উইদারিং এর পর পাতার ওজন হবে ৪০০ কেজি।

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

সিটিসি চা তৈরি প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক
(Aspects of CTC processing of tea)

উইদারিং (withering): চা শিল্পে উইদারিং বলতে বাগান থেকে চয়নকৃত চা পাতাগুলোকে ফ্যাক্টরিতে আনার পর আর্দ্রতা এবং বায়ুপ্রবাহ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে নির্দিষ্ট সময় রেখে চা পাতাগুলোর আর্দ্রতা কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় নামিয়ে আনা এবং অন্যান্য ভৌত ও রাসায়নিক গুণাবলী অর্জনকে বুঝায়। কালো চা প্রস্তুতির ক্ষেত্রে উইদারিং হচ্ছে একটি সাধারণ কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। উইদারিংকে দুইভাগে ভাগ করা হয়, যথা – ভৌত এবং রাসায়নিক।

ভৌত উইদারিং প্রক্রিয়ার মূল উদ্দেশ্য

১) চয়নকৃত পাতা থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ আর্দ্রতা কমানো। এর পরিমাণ আরসি (RC) চায়ের ক্ষেত্রে ১০-১৫% এবং অন্য চা এর ক্ষেত্রে ১৫-২০%।
২) চা প্রস্তুতকরণের পরবর্তী ধাপগুলোর জন্য চা পাতাগুলোকে প্রস্তুত করা।
৩) পাতাগুলোর দৃঢ়তা কমিয়ে শিথিল করা যাতে রোলিং ভাল হয়।

রাসায়নিকভাবে উইদারিং থেকে নিচের পরিবর্তনগুলো ঘটে

১) দ্রবণীয় প্রোটিন, মুক্ত অ্যামাইনো এসিডসমূহ এবং সরল শর্করাসমূহের মাত্রা বৃদ্ধি পায়
২) পেপসিডেজ নামক উৎসেচক (enzyme) দ্বারা প্রোটিনের ভাঙ্গনের মাধ্যমে অ্যামাইনো এসিডের ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় যা চা এর সুগন্ধ সৃষ্টি করে।
৩) কালো চায়ের কাপে ক্যাফেইনের যোগান দেয়।
৪) জৈব এসিডের মাত্রা বৃদ্ধি করে যার ফলে চা এর সুরভি বৃদ্ধি পায় এবং পলিফেনল অক্সিডেজের (PPO) কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়।

যে সকল কারণে উইদারিং প্রভাবিত হয়

১) **উইদারিং এর সময়কাল** : ১০ থেকে ১৫ শতাংশ আর্দ্রতা কমানোর জন্য সিটিসি চা তৈরিকরণের ক্ষেত্রে ১২ থেকে ১৮ ঘণ্টা সময় প্রয়োজন হয়। নিচের বিষয়গুলোর উপর আর্দ্রতা কমানো হার এবং উইদারিং এর সময় নির্ভর করে :

ক) পাতার প্রকার
খ) ছড়ানো পাতার পুরুত্ব
গ) বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা
ঘ) পাতার অবস্থা (ভেজা অথবা শুকনা)

ক) **পাতার প্রকার** (Type of leaf): পাতার ভৌত অবস্থা, রাসায়নিক অবস্থা, বয়স ইত্যাদির উপর অনেকাংশে উইদারিং এর ব্যাপ্তিকাল নির্ভর করে। কচি পাতার চেয়ে রুক্ষ বয়স্ক পাতার ক্ষেত্রে উইদারিং এর সময় অনেক বেশি লাগে। পরীক্ষায় দেখা যায়, শতকরা পঞ্চাশভাগ রুক্ষ পাতাসহ ১০০ কেজি পাতা ১৫ ঘণ্টা উইদারিং করা হলে ১৮ লিটার পানি অপসারিত হয় কিন্তু শতকরা ১৫ ভাগ রুক্ষ পাতাসহ ১০০ কেজি পাতা থেকে একই সময়ে ৩৫ লিটার পানি অপসারিত হয়।

খ) **ছড়ানো পাতার পুরুত্ব** (Thickness of spread) : ট্রাফের আকারের উপর ভিত্তি করে উইদারিং ট্রাফ ফ্যানের নকশা এমনভাবে করা হয় যাতে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় পানিকে বাষ্পায়িত করা যায়। উইদারিং ট্রাফে প্রতি বর্গফুট স্থানে ২.৫ কেজি থেকে ৩ কেজি চা-পাতাকে এমনভাবে ছড়ানো হয় যাতে পাতা বিস্তারের পুরুত্ব ৮ ইঞ্চি হয়। খুব পাতলা করে পাতা বিছানো হলে সঠিক মাত্রায় এবং সমভাবে উইদারিং হয় না তাছাড়া অনেক জায়গারও অপচয় হয়। কোন কোন কারখানায় ভরা মৌসুমে প্রতি বর্গফুটে ৪/৫ কেজি পাতা লোড করা হয় যার ফলে উইদারিং কাঙ্ক্ষিত পরিমাণে হয়না।

গ) **বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা** (Relative humidity of the air) : উইদারিং প্রক্রিয়ায় বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা বা শুকানোর ক্ষমতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বাতাস শুষ্ক হলে উইদারিং দ্রুত হয়। কিন্তু আর্দ্র বাতাস আর্দ্রতা শুষে নিতে পারে না। ৭° ফারেনহাইট হাইগ্রোমিটার তাপমাত্রার পার্থক্যের ক্ষেত্রে প্রতি ১০০০০০ঘনফুট/মিনিট বাতাসের বাষ্পায়ন ক্ষমতা ৪.৫ লিটার উদাহরণস্বরূপ-

ট্রাফের আকার ৪০ x ৫ অর্থাৎ ২০০ বর্গফুট, প্রতি বর্গফুট জায়গায় পাতার পরিমাণ = ৩ কেজি, ট্রাফের ধারণক্ষমতা = ২০০ x ৩ = ৬০০ কেজি হলে উইদারিং এর পর পাতার ওজন হবে ৪০০ কেজি।

অর্থাৎ ২০০ কেজি পানি বাষ্পীভূত হবে। এক্ষেত্রে ৪০০০০০০ ঘনফুট/মিনিট বাতাসের প্রয়োজন হবে।

ঘ) পাতার অবস্থা (Condition of the leaf): ঋতুভেদে কারখানায় নিয়ে আসা পাতা ভেজা বা শুকনা হতে পারে। ভেজা পাতায় শুকনা পাতার চেয়ে অনেক বেশি ব্যাকটেরিয়া জীবাণু থাকে। এক্ষেত্রে দ্রুত ১২° ফারেনহাইট পর্যন্ত হাইগ্রোমেট্রিক পার্থক্যের মধ্যে গরম বাতাস চালিত করে পাতার উপরের আর্দ্রতা অপসারিত করা প্রয়োজন

উইদারিং কৌশল

১) **উইদারিং হার:** উইদারিং হার হচ্ছে উইদারিং করার পরে পাতার ওজন এবং সবুজ পাতার ওজনের অনুপাতের শতকরা হার।

উদাহরণ : সবুজ পাতার ওজন = ২০০ কেজি

উইদার করা পাতার ওজন = ১৪০ কেজি

সুতরাং উইদারিং এর শতকরা হার = $\frac{১৪০}{২০০} \times ১০০ = ৭০\%$

২) **উইদারিং এর পরিমাণ** : উইদারিং এর পরিমাণ (degree) হচ্ছে শতকরা প্রকাশিত তৈরি চা এবং উইদারকৃত চায়ের অনুপাত উদাহরণস্বরূপ তৈরি চা ৩০০ কেজি এবং উইদারকৃত চা ১০০০ কেজি হলে, উইদারিং এর পরিমাণ (degree) হবে

$\frac{৩০০}{১০০০} \times ১০০ = ৩০\%$, এর উপর ভিত্তি করে উইদারিং প্রকারভেদ নিচের ছকের সাহায্যে প্রকাশ করা যায় –

উইদারিং এর পরিমাণ (%)	উইদারকৃত পাতায় আর্দ্রতার পরিমাণ (%)	উইদারের প্রকার
৩০	৭০	খুব কোমল (very soft)
৪০	৬০	কোমল (soft)
৪৫	৫৫	মধ্যম (medium)
৫০	৫০	কঠিন (hard)

৩) **বায়ুচলাচল এবং বায়ুর অবস্থা:** উইদারিং বা পাতার আর্দ্রতার হার নির্ভর করে বায়ুচলাচল, বায়ুচাপ এবং বায়ুর আর্দ্রতার উপর যথেষ্ট বায়ুচলাচল থাকলে বায়ু জলীয়বাষ্প বহন করে নিয়ে যায় এবং এরূপ বায়ুতে উইদারিং ভাল হয়।

জলীয়বাষ্প পাতার পৃষ্ঠ দিয়েই নির্গত হয়। কুঁড়ি এবং বৃন্ত থেকে যে আর্দ্রতা হ্রাস পায় তা মূলত পাতার মাধ্যমেই ঘটে কিন্তু সরাসরি বাষ্পীভবনের মাধ্যমে হয় না। ফেব্রুয়ারি থেকে মধ্য এপ্রিল পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে বায়ুর আর্দ্রতা অনেক সময় ৫০% এর নিচে চলে যায়। এরকম আবহাওয়ায় ভাল বায়ুচলাচলের ব্যবস্থা থাকলে ১৬ ঘণ্টা বা তারও কম সময়ে ৬৫ শতাংশ উইদার অর্জন করা সম্ভব। আবার জুন থেকে আগস্ট মাসে বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯০ থেকে ৯৫% এর মধ্যে থাকে। এসময় বায়ুর আর্দ্রতা কমিয়ে যথাযথ উইদারিং করা যেতে পারে। তবে সাধারণত ফ্যানের মাধ্যমে উষ্ণ বায়ু ব্যবহার করে উইদারিং করা হয়ে থাকে। যেসব বাগানে যথেষ্ট উইদারিং ট্রাফ রয়েছে তারা গরম বাতাসের প্রবাহ না দিয়ে পাতলা করে সবুজ চা পাতা বিছিয়ে দিলেও ভালো উইদারিং হয়ে থাকে।

৪) **উইদারিং এর জন্য প্রয়োজনীয় বায়ুর পরিমাণ :** উইদারিং সম্পন্ন করার জন্য বায়ুর পরিমাণ ব্যবহৃত বায়ুর আর্দ্রতার উপর নির্ভর করে। নিচের সূত্র ব্যবহার করে বায়ুর প্রয়োজনীয় পরিমাণ নির্ধারণ করা যেতে পারে

ঘনফুট/মিনিট/কেজি (সবুজ পাতা) $= \frac{100}{(TD - TW)}$

এখানে, T_D = শুষ্ক বাল্বের তাপমাত্রা

T_W = আর্দ্র বাল্বের তাপমাত্রা

যদি হাইগ্রোমিটার ৭০° ফা. তাপমাত্রার পার্থক্য বজায় রাখতে হয়, তাহলে প্রয়োজনীয় বাতাসের পরিমাণ হবে –

$\frac{১০০}{৭} =$ ১৪.৩ ঘনফুট/মিনিট/কেজি সবুজ পাতা

অর্থাৎ প্রতিমিনিটে প্রতি কেজি সবুজ পাতার জন্য বায়ুর পরিমাণ হবে ১৪.৩ ঘনফুট।

মানসম্মত উইদারিং এর জন্য আর্দ্র এবং শুষ্ক বায়ুর তাপমাত্রার (wet bulb and dry bulb temperature) ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় বায়ুর পরিমাণ নিচের ছকে উল্লেখ করা হলো:

শুষ্ক ও আর্দ্র বায়ুর তাপমাত্রার পার্থক্য	বায়ু প্রবাহ
$T_D - T_W$	ঘনফুট/মিনিট/কেজি সবুজ পাতা
1^0F	100
2^0F	50
3^0F	33.3
4^0F	25

5^0F	20
6^0F	16.7
7^0F	14.3
8^0F	12.5
9^0F	11.1
10^0F	10

৫) **ট্রাফ** (Trough): একটি চা কারখানার ট্রাফের আকার আকৃতি ভরা মৌসুমে সর্বোচ্চ পরিমাণ চয়নকৃত পাতার পরিমাণটি মাথায় রেখে নির্ধারণ করা উচিত। সাধারণত ভরা মৌসুমে একদিনের সর্বোচ্চ পরিমাণ তৈরি চা, এক বছরে তৈরি চায়ের ১ শতাংশ হয়ে থাকে।

উদাহরণস্বরূপ একটি ২০০ হেক্টর বাগানে যদি হেক্টর প্রতি বাৎসরিক তৈরি চায়ের পরিমাণ ৩০০০ কেজি হয়, তাহলে বছরে মোট তৈরি চায়ের পরিমাণ হবে ৩০০০ × ২০০ = ৬,০০,০০০ কেজি। ২৫% হারে রিকভারি ধরে মোট ২৪,০০,০০০ কেজি সবুজ চা পাতা চয়ন করা হবে। সুতরাং ১ শতাংশ পাতা হবে ২৪,০০০ কেজি। এক্ষেত্রে প্রতি বর্গফুটে ৩ কেজি হিসাবে ২৪০০ কেজি পাতার জন্য ৮০০০ বর্গফুট বিশিষ্ট ট্রাফ প্রয়োজন হবে। সুতরাং ট্রাফের আকার ৭৫ × ৬ হলে মোট ১৮টি ট্রাফের প্রয়োজন হবে।

উইদারিং এর প্রকারভেদ :

১) **প্রাকৃতিক উইদারিং** (Natural withering) : আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা অনুকূল থাকলে প্রাকৃতিকভাবেই বিদ্যমান বায়ু দ্বারা উইদারিং করা যেতে পারে। প্রচলিত ধারণা হচ্ছে প্রাকৃতিক উইদারিং কৃত্রিম উইদারিং এর চেয়ে ভাল এর মূল কারণ বায়ুর নিম্নতাপমাত্রা। সাধারণত বাংলাদেশে জানুয়ারি মাসে বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা অনেক নিচে নেমে যায় এবং এ অবস্থাটি এপ্রিল মাস পর্যন্ত বজায় থাকে যা প্রাকৃতিক উইদারিং এর জন্য অনুকূল

২) **কৃত্রিম উইদারিং** (Artificial withering) : এ পদ্ধতিতে ড্রায়ারের মাধ্যমে বায়ু গরম করে তা উইদারিং-এর জন্য ব্যবহার করা হয়। তবে গরম বায়ুর সাথে বাইরের বায়ু যোগ করা হয়। এ কাজে ব্যবহৃত ফ্যানগুলোর বিন্যাস এমন থাকে যে, গরম বায়ুর সাথে ঠান্ডা বায়ু মিশে যেতে পারে। গরম ও ঠান্ডা বায়ুর মিশ্রণের তাপমাত্রা যেন কিছুতেই ৯৫° ফা. বা ৩৫° সে. এর বেশি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে বেশি তাপমাত্রায় পাতার এনজাইম এর কার্যকারিতা হ্রাস পায়। ট্রাফের তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণের জন্য ট্রাফের উপরে একটি ডায়ালকৃতি থার্মোমিটার রাখা যেতে পারে একবার পত্রপৃষ্ঠের আর্দ্রতা অপসারিত হলে তাপমাত্রা কমিয়ে ২৭°-২৯° সে. এর মধ্যে রাখা ভালো।

সপ্তদশ অধ্যায়

চা তৈরিতে সিটিসি রোলিং এর কার্যকারিতা
(Effectiveness of Rolling in CTC processing of tea)

রোলিং (Rolling)

বাগান থেকে চয়ন করে আনা চা পাতাগুলোকে যথাযথভাবে উইদারিং করা হলে পাতাগুলো নেতিয়ে পড়ে। এ অবস্থায় পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ধাপটি হল রোলিং। রোলিং এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে চা পাতাগুলোকে ছোট ছোট টুকরোতে পরিণত করা এবং চাপ প্রয়োগ করে নির্যাস বের করা যাতে টুকরোগুলো সে নির্যাসের আবরণে আবৃত হয়।

রোলিং-এর গুরুত্ব

রোলিং এর মাধ্যমে অক্সিজেনের উপস্থিতিতে পলিফেনলগুলোর সাথে উৎসেচক পলিফেনল অক্সিডেজের মিশ্রণ ঘটে। ফলে গাঁজন প্রক্রিয়া শুরু হয়। রোলিং এর পূর্বে পলিফেনল অক্সিডেজ কোষের ভ্যাকুওলে জমা থাকে এবং পলিফেনলগুলো সাইটোপ্লাজমে থাকে।

রোলিং এর পূর্বপ্রস্তুতি

একটি আধুনিক উন্নতমানের চা কারখানায় সিটিসি রোলারে রোলিং এর জন্য চা পাতাগুলোকে প্রেরণ করার পূর্বে গ্রিনলিফ শিফটারের উপর দিয়ে (যা এক প্রকার চলুনি বিশেষ) চালনা করা হয় যাতে চা পাতার সাথে মিশ্রিত পাথর, ধাতব টুকরা ইত্যাদি আলাদা হয়ে যায় এবং সিটিসি রোলারের কোন ক্ষতি না হয়। একটি ঘূর্ণায়মান ট্রের নিচের দিকে তারজালি থাকে, যা ২ অশ্বশক্তির মোটর দ্বারা চালিত হয়। এ শিফটারের সাথে শক্তিশালী চুম্বক থাকে যাতে লোহা বা স্টিলের টুকরোগুলো সহজেই পৃথক হয়ে যায়।

পরবর্তী ফালি করার যন্ত্রে (Green Leaf Shredder) পাতাগুলোকে চলনা করা হয়, যাতে পাতাগুলো ছোট ছোট ফালিতে বিভক্ত হয়ে যায়। শ্রেডার মেশিনটিতে একটি সিলিন্ডারে মূল শ্যাফটের সাথে অনেকগুলো ছুরি বা ব্লেড লাগানো থাকে, যা ২৫০০ আরপিএম (RPM) বেগে ঘুরতে থাকে। ২৫০০০ কেজি পাতা ফালি করার পর ব্লেডগুলোকে পুনরায় ধার দেয়া উচিত। প্রতিটি ব্লেডের ওজন ৭০০ গ্রামের মতো হয়।

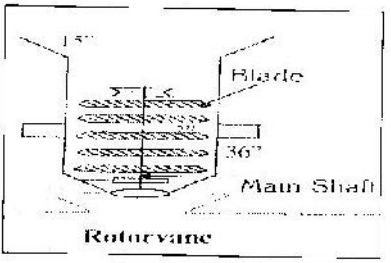

Green Leaf Shredder

রোলিং কৌশল (Rolling Technique)

রোটরভেন: রোটরভেন হচ্ছে সিলিন্ডার আকৃতির ড্রাম বিশেষ যার ব্যাস ৮", ১৫" বা ১৮" ইঞ্চি হয়ে থাকে। ড্রামের ভেতরের পরিধি বরাবর নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে রোধক (Resistors) বসানো থাকে। ড্রামের যে মূল শ্যাফট ঘূর্ণায়মান থাকে, তাতে সমান দূরে দূরে পাতা ব ভেন বসানো থাকে। মূল শ্যাফটে এমনভাবে প্যাঁচ থাকে যাতে পাতাগুলো ড্রামের মধ্য দিয়ে সহজে চালিত হতে পারে। চা পাতাগুলো ভেন এবং রোধকের মধ্য দিয়ে যাবার সময় গুড়ো হয়ে যায় এবং ড্রায়ফ্রামের মধ্য দিয়ে বের হয়ে যায়। আইরিস প্লেটের ছিদ্র ছোট বড় করার মাধ্যমে ড্রামের ভেতরের চাপ এবং কর্তনের নমুনা পরিবর্তন করা যায়। রোটরভেনের আরপিএম (RPM= Revolution Per Minute) ৩০-৩৫ হয়ে থাকে

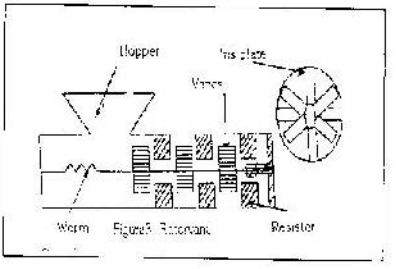

রোটরভেন

রিকন্ডিশনিং (Reconditioning)

দক্ষিণ ভারতে উইদারকৃত নতুন চা পাতার সাথে পূর্বেকার নিম্নমানের চা মিশিয়ে দেয়া হয় যাতে নিম্নমানের চায়ের মান বৃদ্ধি পায়। এভাবে প্রাপ্ত চা'কে রিকন্ডিশনড বা আরসি (RC) চা বলা হয়। সদ্যোজাত চা পাতার মান এবং কারখানায় যন্ত্রপাতি বিবেচনায় প্রতিদিন সর্বোচ্চ ৪০% নিম্নমানের চা মেশানো যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে নিচের বিষয়গুলো বিবেচনা করা জরুরি:

- RC দ্রব্য অবশ্যই পরিষ্কার এবং ফাইবারমুক্ত হতে হবে।
- RC দ্রব্যের ধূসরতা অবশ্যই কম থাকতে হবে।
- RC দ্রব্য রিসাইক্লিং এর পূর্বে ৪০ মেশের মধ্য দিয়ে যেতে হবে।
- RC দ্রব্য ভাসমান ফাইবারমুক্ত থাকা উচিত।

নিচের সূত্রের সাহায্যে উইদার করা চা এর সাথে কী পরিমাণ RC যোগ করা যেতে পারে তা নির্ণয় করা যায়। এভাবে সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ করা হলে CTC রোলার উত্তপ্ত হবে না এবং জ্যাম লাগবে না।

$$\frac{MWL - 55 \times 100}{55 - MRC}$$

এখানে, MWL = Moisture content in the withered leaf
MRC = Moisture content in the RC material

উদাহরণস্বরূপ, যদি উইদারকৃত পাতা এবং RC দ্রব্যে আর্দ্রতার পরিমাণ যথাক্রমে শতকরা ৬৫ ভাগ এবং ৬ ভাগ হয়, তাহলে

$$\frac{MWL - 55 \times 100}{55 - MRC} = \frac{65 - 55 \times 100}{55 - 6} = 20.4$$

অর্থাৎ প্রতি ১০০ কেজি উইদার করা চা পাতার সথে ২০.৪ কেজি RC দ্রব্য যোগ করা যেতে পারে। তবে বাংলাদেশে RC চা উৎপাদন কিছুতেই উৎসাহিত করা হয় না। বাজারেও RC চায়ের মূল্য অতিনিম্নস্তরে। দক্ষিণ ভারতে RC চা করার পেছনে machine plucking পদ্ধতিটিই প্রধান কারণ বলে প্রতীয়মান হয়।

CTC রোলার (CTC Roller)

CTC রোলারে একটি প্রধান শ্যাফ্ট থাকে যার উপর ম্যানড্রেলের আকৃতিতে অংশগুলো তাপ প্রয়োগ করে বসানো হয়। রোলারের ব্যাস সাধারণত ৯" হয় তবে সর্বশেষ সেনোভা (senova) রোলারের ব্যাস ১৩" হয়। রোলারের সামর্থের উপর ভিত্তি করে তাদের দৈর্ঘ্য ২৪" থেকে ৩৬" পর্যন্ত হয়। সাধারণত দুটি রোলারকে পরস্পর সমান্তরাল ও আনুভূমিকভাবে যুক্ত করা হয় এবং উভয়ে পরস্পর বিপরীতমুখী হয়ে ঘুরে। নিম্নগতি ও উর্ধ্বগতি রোলারের গতির অনুপাত

১ : ১০ হয়, যেমন – ৬০ : ৬০০, ৭০ : ৭০০, ১০০ : ১০০০ ইত্যাদি। এ গতি চা পাতা বা ডাস্টের গ্রেডের উপর নির্ভরশীল।

রোটারভেন যন্ত্রের সামর্থ্য – ঘণ্টাপ্রতি তৈরি চা নিম্নরূপ –

১৫' রোটারভেন – ৩০০ কেজি
১৮" রোটারভেন – ৪০০ কেজি

ঘণ্টাপ্রতি CTC রোলারের সামর্থ্য নিম্নরূপ –

২৪" CTC রোলার – ২৫০ কেজি
৩০" CTC রোলার – ৩০০ কেজি
৩৬" CTC রোলার – ৪০০ কেজি
৩০" সেনোভা রোলার – ৩৫০ কেজি

২" প্রস্থ এবং ১' পুরু স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি ফাঁপা অংশগুলোকে মূল শ্যাফটের সাথে একটার পর একটি পাশাপাশি লাগানো হয়। প্রথম অংশগুলোতে চেজিং গ্রুভগুলো (Chasing grooves) সমান্তরাল থাকে এবং তারপর মিলিং গ্রুভগুলো তৈরি হয়।

সাধারণত চেজিং গভীরতা মিলিং গভীরতার চেয়ে বেশি থাকে প্রতিটি দাঁতের কাঁধ থাকে এবং কাঁধের পেছনদিকে ঢালু থাকে। কাঁধের দৈর্ঘ্য এবং ঢালুর দৈর্ঘ্যের অনুপাতকে প্রোফাইল বলা হয়। প্রোফাইল দ্বারা তৈরি চা-এর আকৃতি (size) নির্ধারিত হয়।

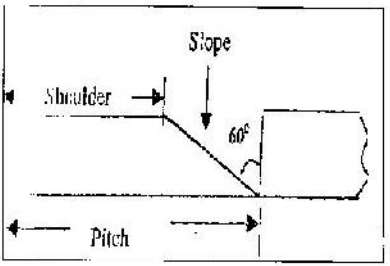

দাঁতের প্রোফাইল (Tooth Profile)

রোলারের RPM চা এবং ডাস্ট উৎপাদনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বাজারের চাহিদা অনুযায়ী রোলারের RPM এবং কাঁধ /ঢালু অনুপাতকে সমন্বয় করে অধিক চা কিংবা ডাস্ট উৎপাদন করা যেতে পারে।

কাঁধ/ঢালু অনুপাত চা এর গ্রেড নির্ধারণে একটি প্রধান ভূমিকা পালন করে। কাঁধের

অংশে কাটিং এবং ঢালু অংশে কার্লিং হয়। অধিক মিহি চায়ের জন্য কাঁধ/ঢালু অনুপাত ৪ : ৩ থেকে ৫ : ৩ হওয়া প্রয়োজন। একইভাবে অধিক Leaf grade এর জন্য কাঁধ ও ঢালুর অনুপাত ৩ : ৪ থেকে ৩ : ৫ হওয়া দরকার। Leaf grade এর জন্য মিলিং কোণ ৬০ – ৬৫° এবং ডাস্ট এর জন্য ৫০ – ৫৫° হতে হয়। সাধারণত যত বেশি ঢালু থাকে দানার আকার তত বড় হয়। CTC রোলারের প্রতি ইঞ্চিতে দাঁতের সংখ্যা এক্ষেত্রে আরেকটি নির্ণায়ক

প্রতি ইঞ্চিতে দশটি দাঁতবিশিষ্ট রোলার (10 TPI) গুঁড়া (dust) চা তৈরির জন্য এবং আটটি দাঁতবিশিষ্ট রোলার (8 TPI) পাতি চা (Leaf grade) উৎপাদনের জন্য সুপারিশ করা হয়। চায়ের চমৎকার গ্রেডের জন্য প্রথম এবং সর্বশেষ রোলার 8 TPI বিশিষ্ট এবং মাঝেরগুলো 10 TPI বিশিষ্ট থাকা বাঞ্ছনীয়।

একইভাবে ডাস্ট চা উৎপাদনের জন্য প্রথম দুটি 8 TPI এবং বাকিগুলো 10 TPI রোলার থাকা প্রয়োজন।

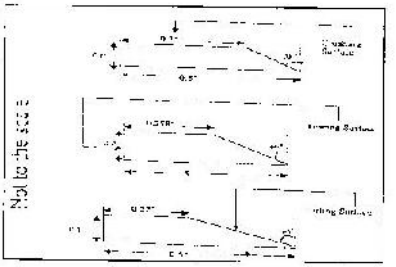

CTC রোলার ধারানোর কৌশল

CTC রোলারের ধারানো (Sharpening of CTC Roller) : চিত্রে CTC রোলারের ধারানোর একটি আদর্শ উদাহরণ দেয়া হয়েছে। যখন খণ্ডাংশগুলো ৬৫° কোণে ধারানো হয়, তখন ক্রাশিং তল হয় ০.২৩৩", যখন এটি ৬০° কোণে ধারালো থাকে তখন ক্রাশিং তল হয় ০.২৫৮"। যখন কাটিং কোণ কমে তখন ক্রাশিং তল বাড়ে। তবে টিয়ারিং তলের কোণ পরিবর্তন হয় না (০.২")। ৫৫° কোণে সবচেয়ে বেশি ক্রাশিং তল পাওয়া যায় (০.৩")। ক্রাশিং তল যত বড় হয়, গুঁড়া চা এর উৎপাদন তত বৃদ্ধি পায়। বাজারের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের CTC রোলারের বিচ্যুতি বা ধার নির্ধারণ করা উচিত।

প্যাঁচানো গ্রুভ (Helical Grooves)

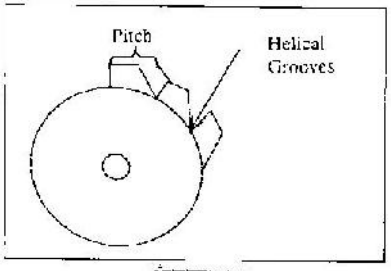

প্যাঁচানো গ্রুভ

রোলারে বিদ্যমান প্যাঁচানো গ্রুভের সংখ্যার উপর CTC রোলারের উৎপাদনশীলতা নির্ভর করে। CTC রোলারের ব্যাসের উপর প্যাঁচানো গ্রুভের সংখ্যা নির্ভর করে।

যেমন : প্রচলিত রোলারের ক্ষেত্রে –
CTC রোলারের ব্যাস (D) = ৮"
পীচ = ০.৫"

সুতরাং প্যাঁচানো গ্রুভের সংখ্যা হবে = $\frac{\pi \times D}{\text{পীচ}}$

$= \frac{৩.১৪ \times ৮}{০.৫} = ৫০$

সেগমেন্টের আয়ুষ্কাল (Life of Segment):

কারখানায় সরবরাহকৃত সবুজ চায়ের মান এবং ব্যবহৃত RC দ্রব্যের শতকরা পরিমাণের উপর সেগমেন্টগুলোর আয়ু নির্ভর করে। সাধারণত প্রচলিত CTC রোলারের ক্ষেত্রে সেগমেন্টের পুরুত্ব ২৫ মি.মি এবং সেনোভা রোলারের ক্ষেত্রে ৩৩ মি.মি হয়। নিচের উদাহরণ থেকে কারখানায় ব্যবহৃত CTC রোলারের সেগমেন্ট বা খণ্ডগুলোর আয়ুষ্কাল সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যাবে।

প্রচলিত CTC রোলারের ক্ষেত্রে –
রোলারের দৈর্ঘ্য = ৩০"
রোলারের ব্যাস = ৮"
খণ্ডাংশের পুরুত্ব = ২৫ মি.মি. ধারানো উপযোগী
পুরুত্ব = ২০ মি.মি. প্রতিবার ধারানোর ফলে অপসারিত ধাতু = ০.৫ মি.মি

$$\text{সুতরাং পুনঃধারানোর সংখ্যা} = \frac{\text{পুনঃধারানোযোগ্য পুরুত্ব}}{\text{প্রতিবার ধারানোর ফলে অপসারিত ধাতু}}$$

$$= \frac{২০}{০.৫} = ৪০$$

বিভিন্ন আকারের রোলারের পুনঃধারকরণের বিরতিকাল (চা উৎপাদনকাল)

৩৬" রোলার = ২৫,০০০ কেজি
৩০" রোলার = ২২,০০০ কেজি
২৫" রোলার = ২০,০০০ কেজি

সেনোভা রোলারের ক্ষেত্রে :
রোলারের দৈর্ঘ্য = ৩০"
রোলারের ব্যাস = ১৩"
খণ্ডাংশের পুরুত্ব = ৩৩ মি.মি
পুনঃধারানোযোগ্য পুরুত্ব = ২৮ মি.মি
প্রতিবার ধারকরণের সময় অপসারিত ধাতু = ০.৫ মি.মি

$$\text{সুতরাং পুনঃধারকরণের সংখ্যা} = \frac{\text{পুনঃধারাণোযোগ্য পুরুত্ব}}{\text{প্রতিবার ধারকরণের সময় অপসারিত ধাতুর পুরুত্ব}}$$

$$= \frac{২৮}{০.৫} = ৫৬$$

এক্ষেত্রে, পুনঃধারকরণের মাঝখানে বিরতিকাল হবে ৪০,০০০ কেজি তৈরি চা।

গাঁজন (Fermentation) বা পলিফেনল জারন

গাঁজন বা ফার্মেন্টেশন প্রকৃতার্থে 'অক্সিডেশন' কিন্তু চা শিল্পে এ ভুল নামই প্রচলিত হয়ে আসছে। হচ্ছে চা পাতায় বিদ্যমান পলিফেনল অক্সিডেজ (Polyphenol oxydase) নামক এনজাইমের সহায়তায় পাতার পলিফেনলসমূহের জারন ক্রিয়া। রোলিং এর পূর্বে পলিফেনল এবং পলিফেনল অক্সিডেজ কোষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকে। যখন পাতাগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় তখন অক্সিজেনের উপস্থিতিতে এদের মিশ্রণ ঘটে এবং জৈব-রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে থিয়াফ্ল্যাভিন (Theaflavin- TF) ও থিয়ারুবিজিন (Thearubigin TR) উৎপন্ন হয়। এ যৌগগুলো মূলত রঞ্জক পদার্থ। থিয়াফ্ল্যাভিনের রঙ কমলা লাল এবং থিয়ারুবিজিন লালচে তামাটে বর্ণের হয়। এদের উপর লিকারের সতেজতা, উজ্জ্বলতা এবং রঙ নির্ভর করে।

গাঁজন প্রভাবক (Factors influencing fermentation) :

নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর গাঁজন ক্রিয়া নির্ভর করে –

১) গাঁজনের সময়কাল
২) তাপমাত্রা
৩) আর্দ্রতা
৪) বায়ুপ্রবাহ
৫) ছড়ানো পাতির পুরুত্ব
৬) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা।

১) ফার্মেন্টেশনের সময়

ফার্মেন্টেশন বা গাঁজনের সময় অনেকগুলো ধারাবাহিক জটিল জৈব রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে যার ফলে চা পাতাগুলো তামাটে বর্ণ ধারণ করে। থিয়াফ্ল্যাভিন (TF) এবং থিয়ারুবিজিন (TR) সঠিক অনুপাতে উৎপন্ন হওয়ার সাথে সাথে ফার্মেন্টেশন বন্ধ করা প্রয়োজন। এ সময় সবুজ চা পাতার গুণাগুণ, তাপমাত্রা, আর্দ্রতা ইত্যাদির উপর তৈরি করা চা এর গুণাগুণ নির্ভর করে। গাঁজন শুরুর দিকে যখন পলিফেনল জারিত হতে থাকে তখন দ্রুতহারে TF তৈরি হতে থাকে। পরবর্তী ধাপে TF থেকে TF এ রূপান্তর চলতে থাকে এবং এ অবস্থায় বেশি সময় ধরে গাঁজন চলতে থাকলে TF এর পরিমাণ কমে যায়। সুতরাং তৈরি চায়ে সঠিক সতেজতা ও উজ্জ্বল লিকার পেতে হলে সর্বোচ্চ TF এর উপস্থিতি জরুরি এবং এটি নিশ্চিত করার জন্য যথাসময়ে গাঁজন বা ফার্মেন্টেশন বন্ধ করতে হবে।

সাধারণত বাংলাদেশে গাঁজনের সময়সীমা ৫০-৬০ মিনিট হয়ে থাকে। তবে এ সময়সীমা বিভিন্ন কারখানায় বিভিন্ন সময়ে হওয়াটাই স্বাভাবিক। যেমন, তাপমাত্রা যেদিন ২৭° সে. বা ৯০° ফা. এর নিচে হবে সেদিন গাঁজনের জন্য সময় বেশি লাগবে। একটি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন গাঁজনের সময় খুব বেশি কমানো না হয়, কারণ এতে TF এর পরিমাণ অনেক বেশি হওয়ার দরুণ লিকারের সতেজতা ও উজ্জ্বলতা অনেক বেশি হলেও এর শক্তি (Strength) কমে যাবে।

২) তাপমাত্রা

পলিফেনল অক্সিডেজ (Polyphenol Oxydase, PO) নামক এনজাইম গাঁজনের সময় পলিফেনলের উপর ক্রিয়া করে। উচ্চ তাপমাত্রায় PO এর কার্যকারিতা কমে যায়। একইভাবে নিম্ন তাপমাত্রায়ও এর কার্যকারিতা হ্রাস পায়। যেমন, ১৬° সে. বা ৬০° ফা. তাপমাত্রার নিচের তাপমাত্রায় এনজাইম কার্যকারিতা খুবই কমে যায় এবং ৩২° সে. (৯০° ফা.) পর্যন্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে এ কার্যকারিতা সর্বোচ্চ বৃদ্ধি

পায়। ৩২° সে. এর উপরে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে এনজাইম কার্যকারিতা পুনরায় কমতে থাকে। উচ্চ তাপমাত্রায় একটি সীমা পর্যন্ত (৩২°) ফার্মেন্টেশন বৃদ্ধি পেলেও চা এর গুণগত মান কমে যেতে পারে। তাই ফার্মেন্টেশনের জন্য সর্বোত্তম তাপমাত্রা ধরা হয় ২৭° সে.। তাপমাত্রা এ থেকে বৃদ্ধি পেলে TF এর পরিমাণও কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় থাকে না এবং লিকারের মান কমে যায়।

৩) আর্দ্রতা

উন্নতমানের গাঁজন প্রক্রিয়ার জন্য কক্ষের আর্দ্রতা ৯৫% বা তার কাছাকাছি থাকা বাঞ্ছনীয়। যদি কক্ষের আপেক্ষিক আর্দ্রতা কম থাকে তাহলে চা পাতার পৃষ্ঠতল থেকে বাষ্পাকারে জল বিয়োজন ঘটতে থাকে। ফলে পাতার পৃষ্ঠদেশ সংলগ্ন মেসোফিল কোষগুলোতে কোষরসের ঘনত্ব বেড়ে যায় এবং অসমভাবে গাঁজন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তাছাড়া অধিক বাষ্পায়নের ফলে পাতার পৃষ্ঠদেশ কালচে বর্ণ ধারণ করে। সুতরাং উপযুক্ত আর্দ্রতা বজায় রাখার জন্য ফার্মেন্টিং ড্রামে হিউমিডিফায়ার (Humidifier) ব্যবহার করা উত্তম।

৪) বায়ু চলাচল (Aeration)

মানসম্পন্ন গাঁজনের জন্য গাঁজন কক্ষে যথেষ্ট বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা রাখা বাঞ্ছনীয়। পরীক্ষায় দেখা গেছে, বায়ুশূন্য স্থানে গাঁজনের মাধ্যমে তৈরি চায়ের বর্ণ এবং গন্ধ নিম্নমানের হয়। আবার কার্বন-ডাই-অক্সাইড পূর্ণ পাত্রেও গাঁজন হয় না। এ থেকে বুঝা যায়, ভাল ও মানসম্মত গাঁজনের জন্য অক্সিজেন বা বায়ুর উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। গাঁজনের সময় প্রচুর পরিমাণে কার্বন-ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়, পাতার পৃষ্ঠতল থেকে CO_2 অপসারণ করার জন্য বায়ু চলাচল একান্ত প্রয়োজন। সর্বত্র সমান হারে গাঁজন প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার জন্য সর্বত্র সমানভাবে বায়ু চলাচল নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

৫) ছড়ানো পাতার পুরুত্ব (Thickness of spreading)

ফার্মেন্টেশনের সময় চা পাতাগুলোকে ড্রামে বিছিয়ে রাখার চেয়ে মেঝেতে বিছিয়ে রাখা উত্তম। বিছানো পাতার পুরুত্ব (thickness) কেমন হবে তা পাতার প্রকারভেদের উপর নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ, অর্থোডক্স পাতার পুরুত্ব সিটিসি পাতার পুরুত্বের চেয়ে বেশি হওয়া উচিত। তাছাড়া মেঝেতে বিছানো পাতার পুরুত্ব কম রাখতে হয় যাতে যথেষ্ট পরিমাণ অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসতে পারে। পাতার ঘনত্বও (Kg/m^3) গাঁজন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। CTC পাতার ঘনত্ব অর্থোডক্স পাতার চেয়ে বেশি হয়। অধিক ঘনত্বসম্পন্ন পাতাকে কম পুরু করে বিছাতে হবে।

৬) পরিচ্ছন্নতা (Cleanliness)

ড্রামের মেঝেতে লেগে থাকা রসে ব্যাকটেরিয়া জন্মায়। অনুকূল পরিবেশে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রামণ খুব বেশি হয়। ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ হলে লিকারের রঙ গাঢ় হয়। সংক্রমণ খুব বেশি মাত্রায় হলে তৈরি চা থেকে ফলের গন্ধের মত এক প্রকার গন্ধ নির্গত হয়। সংক্রমিত চা খুব মসৃণ হয় এবং কাপে তৈরি দুধ চা খুব ভারি হয়। এরূপ সংক্রমণ থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য একবার গাঁজন হয়ে গেলে মেঝে ভালভাবে ধুয়ে ফেলা উচিত এ কাজে গরম পানি ব্যবহার করা যেতে পারে।

শুকানো (Drying)

চায়ের সংরক্ষিত গুণাগুণ মূলত শুকানোর কৌশল এবং তৈরি চায়ের আর্দ্রতার উপর অনেকটাই নির্ভর করে। শুকানোর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কৌষিক বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া, পরিবর্তন বন্ধ করা এবং আর্দ্রতা কমিয়ে চা'কে সংরক্ষণ উপযোগী করে তোলা। শুকানোর সময় গাঁজনকৃত চা থেকে জলীয় অংশ অপসারিত হয় এবং চায়ের বর্ণ তামাটে লাল থেকে কালচে বর্ণ ধারণ করে, সেই সাথে গাঁজন থেমে যায়। সাধারণত গাঁজনকৃত চায়ে ৫৫ থেকে ৬০ শতাংশ আর্দ্রতা থাকে এবং শুকানোর পর তৈরি চায়ে আর্দ্রতার পরিমাণ কমে দাঁড়ায় ২.৫ থেকে ৩ শতাংশ।

শুকানো কৌশল (Mechanism of drying)

যে কোন আর্দ্রবস্তুতে দু'ধরণের আর্দ্রতা থাকে একটি হচ্ছে পৃষ্ঠতলের আর্দ্রতা (surface moisture) এবং অপরটি হচ্ছে অভ্যন্তরীণ আর্দ্রতা (core moisture)। পৃষ্ঠতলের আর্দ্রতা খুব সহজেই দূরীভূত হয় কিন্তু ভেতরের আর্দ্রতা বাষ্পীভূত হতে অনেক বেশি সময় লাগে। যখন চায়ের দানাগুলো বেশি আর্দ্র থাকে তখন দ্রুত বাষ্পায়ন ঘটে, কিন্তু আর্দ্রতা কমার সাথে সাথে বাষ্পায়ন কমে যায় যখন চায়ের দানাগুলোকে বাষ্পায়নের মাধ্যমে আর্দ্রতা কমিয়ে শুকানো হয়, তখন বাষ্পায়নের হার সব সময় সমান থাকে না। বাষ্পায়ন দু'পর্যায়ে ঘটে, যথা – (১) ধ্রুব হারে (constant rate period) এবং (২) হ্রাসকৃত হারে (falling rate period)

১) **ধ্রুবহারে বাষ্পায়ন:** শুকানোর প্রথমদিকে চায়ের দানাগুলোর পৃষ্ঠতল থেকে জলকণাগুলো সহজেই বাষ্পীভূত হতে থাকে এবং পৃষ্ঠতল সংলগ্ন বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা সাপেক্ষে বাষ্পায়নের হার দ্রুত হয়। এ সময়টিকে ধ্রুবহারে বাষ্পায়নকাল বলা হয়।

২) **হ্রাসকৃত হারে বাষ্পায়ন:** ধ্রুবহারে বাষ্পায়নের ফলে চায়ের দানাগুলোর পৃষ্ঠতলের আর্দ্রতা শুকিয়ে যায়। তারপর ভিতরের আর্দ্রতা ব্যাপন প্রক্রিয়ায় পৃষ্ঠতলের দিকে আসতে থাকে।

ড্রায়ারের প্রকারভেদ

বাজারে চা পাতা শুকানোর জন্য বিভিন্ন প্রকার ড্রয়ার পাওয়া যায়। যথা –

ক) প্রচলিত ড্রায়ার (Conventional Drier বা Endless Chair Pressure type Drier. সংক্ষেপে ECP)

খ) ফ্লুইড বেড ড্রায়ার (Fluid Bed Drier)

গ) ভাইব্রো ফ্লুইড বেড ড্রায়ার (Vibro Fluid Bed Drier)

ঘ) কম্বিনেশন ড্রায়ার (Combination Drier)

ক) ECP ড্রায়ার: এটি ৪´ এবং ৬´ আকারে পাওয়া যায়। ECP ড্রায়ারে দুইটি বা তিনটি স্বতন্ত্র ট্রে সার্কিট থাকে। যখন চা পাতাগুলো দিয়ে ফিডিং সার্কিট পূর্ণ করা হয়, তখন ছড়ানোর যন্ত্রটি (spreader) পাতাগুলোকে ট্রের উপর সমানভাবে ছড়িয়ে দেয়। উপরের সার্কিটে বা টপ সার্কিটে পাতাগুলো ছড়ানো শেষ হওয়ামাত্র সার্কিটের শেষ প্রান্তে ট্রেটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাত হয়ে যায় এবং পাতাগুলো মিড সার্কিটে পড়ে, মিড সার্কিটের ট্রের চলন উপ সার্কিটের ট্রের বিপরীতমুখী। এভাবে পাতাগুলো ক্রমান্বয়ে উপর থেকে নিচের সার্কিটের দিকে উচ্চ তাপমাত্রা অঞ্চলের দিকে ধাবিত হয় এবং নিচের সার্কিটে পৌছার পর শুকানো সম্পন্ন হয়। এ ধরণের ড্রয়ারে শুকানোর মোট সময় ২০ – ২২ মিনিট। প্রয়োজনীয় বায়ুর পরিমাণ প্রতি ঘনমিটারে ১২০০ – ১৪০০ ঘনফুট। প্রতিবারে ২০০–২৫০ কেজি পাতা শুকানো যায়। সাধারণত ড্রায়ারের অভ্যন্তরের তাপমাত্রা ১০০° সে. এবং নির্গত তাপমাত্রা ৫০° সে. রাখা হয়।

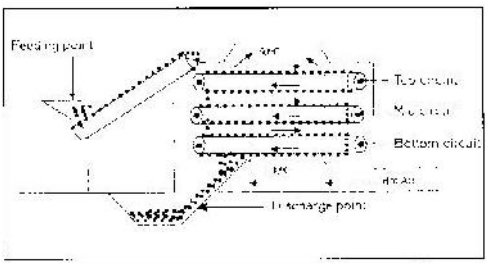

ECP ড্রায়ার

খ) ফ্লুইডবেড ড্রায়ার (Fluidbed drier) : ফ্লুইডবেড ড্রায়ারে ড্রাইং চেম্বার, প্লেনাম চেম্বার, বায়ুপ্রবাহী চেম্বার এবং ডাস্ট কালেক্টার থাকে। ড্রাইং চেম্বার একটি সচ্ছিদ্র গ্রিড প্লেট দ্বারা পৃথক থাকে যার মাধ্যমে উচ্চ চাপযুক্ত তপ্ত বাতাস প্লেনাম চেম্বার থেকে ড্রাইং চেম্বার প্রবেশ করে। প্লেনাম চেম্বার স্বনিয়ন্ত্রিত ভাল্বযুক্ত চারটি অঞ্চলে বিভক্ত থাকে। এ সকল ভাল্ব সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে বায়ু চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে। গ্রিড প্লেটে প্রবিষ্ঠ গরম বাতাসের দিক এয়ার ফ্লো কন্ট্রোল চেম্বার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ড্রইং

চেম্বারের চূড়ায় দুটি সেন্ট্রিফিউগাল এক্সজস্ট ফ্যান সাইক্লোনের সাথে সংযুক্ত থাকে, যাদের একটি রিফায়রিং করে এবং অপরটি মিহি চা নির্গমনে সহায্য করে। যখন গাঁজনকৃত ঢুল (dhool) দ্বারা ড্রাইং চেম্বার পূর্ণ হয়, তখন প্রথম অংশে এটি কৃত্রিম তরলীভূত রূপ (Fluidised) হয়। চাপযুক্ত গরম বাতাসের সাহায্যে বাষ্পায়নের মাধ্যমে পানি অপসারিত হয়। ভিতরমুখী এবং বহির্মুখী তাপমাত্রা যথাক্রমে ১২১.১১°-১২৬.৬৭° সে. এবং ৬৫.৫৬°-৭১.১১° সে. হলে ভাল মানের চা পাওয়া যায়। ড্রায়ারের আকারের উপর বাতাসের পরিমাণ নির্ভর করে।
উদাহরণস্বরূপ, ২০´ x ৪´ ড্রায়ারের জন্য ১৬০০ ঘনফুট বাতাস প্রয়োজন হয়।

ড্রায়ারের প্রথম অংশটিতে ড্রাইং এর জন্য আর্দ্রতা ৫৫-৬০% থাকা উচিত। এখানে মোট ফিডিং আর্দ্রতার ৫০% বাষ্পায়নের জন্য উচ্চ চাপযুক্ত প্রচুর তপ্ত বাতাসের প্রয়োজন হয়। এ অংশে মোট আর্দ্রতার ২৭-৩০% বাষ্পায়িত করা হয়। উইদারিং কম হলে ফিডিং আর্দ্রতা উপযোগী মাত্রার চেয়ে বেশি হয়। সেক্ষেত্রে ঠিকমত ফ্লুইড হবে না। ৫০% আর্দ্রতা বাষ্পীভূত করার জন্য গরম বাতাসের মাধ্যমে অন্তত ছয় ইঞ্চি পরিমাণ ফ্লুইড (Fluidisation) প্রয়োজন।

ড্রায়ারের দ্বিতীয় অংশে ব্যাপনের মাধ্যমে পানি অপসারিত হয়। এখানে ৩০% ফিডিং আর্দ্রতা অপসারিত হওয়া প্রয়োজন, অর্থাৎ ১৬.৫-১৮% আর্দ্রতা অপসারণ করা দরকার। এজন্য দ্বিতীয় অংশটিতে একটু বেশি সময় দেয়ার দরকার হয়। এ অংশে প্রথম অংশের চেয়ে তাপমাত্রা কম দেয়া হয়, তবে নির্গত তাপ প্রথম অংশের চেয়ে বেশি হয়। যেহেতু প্রথম অংশে পানি প্রায় সম্পূর্ণ অপসারিত হয়ে যায়, তাই দ্বিতীয় অংশে ফ্লুইডের উচ্চতা বেশি হয়।

ড্রায়ারের তৃতীয় অংশে শুকানোর একটি জটিল ধাপ অতিক্রান্ত হয়। কেননা এ অংশে চা-এর কণাগুলোর গভীরের আর্দ্রতা অপসারিত হয়। যেহেতু প্রথম ও দ্বিতীয় অংশে আর্দ্রতা হ্রাস পেয়ে চায়ের ওজন কমে যায়, তাই তৃতীয় অংশে ফ্লুইডের মাত্রা ও পরিমাণ বেশি হয়। অধিকাংশ আর্দ্রতা প্রথম ও দ্বিতীয় অংশে অপসারিত হয়ে যায়, তাই তৃতীয় অংশে অপেক্ষাকৃত কম বাতাসের প্রয়োজন হয়। শুষ্ক চায়ের চূড়ান্ত আর্দ্রতা ২.৫-৩ শতাংশ বিবেচনায় রেখে তৃতীয় অংশে ১৭-১৭.৫ শতাংশ ফিডিং আর্দ্রতা অপসারণযোগ্য। চা পাতাগুলো মৃদু আর্দ্রতার ১১-১২ শতাংশসহ তৃতীয় অংশে প্রবেশ করে এবং ২.৫-৩ শতাংশে না নামা পর্যন্ত শুষ্ক হতে থাকে।

শীতলীকরণ অঞ্চল (Cooling zone): এ অংশে তপ্ত চা পাতাগুলোকে ফ্যানের সাহায্যে শীতল করা হয়। তারপর নির্গমন প্রান্তে পাঠিয়ে দেয়া হয়। ড্রায়ারের শেষ মাথায় নির্গত হওয়ার প্রাক্কালে চায়ের আর্দ্রতা ২.৫-৩ শতাংশ থাকা উচিত, কেননা সংরক্ষণের জন্য এ আর্দ্রতাই সবচেয়ে উপযোগী।

সাইক্লোন (Cyclone): তৈরি চা থেকে অপসারিত বর্জ্য বা ডাস্ট (Dust) সংগ্রহ করার জন্য ফ্লুইড বেড ড্রায়ারে 'সাইক্লোন' ব্যবহার করা হয়।

গ) ভাইব্রো ফ্লুইড বেড ড্রায়ার (Vibro fluidbed drier, VFBD)

ভাইব্রো ফ্লুইড বেড ড্রায়ার যে নীতির উপর কাজ করে তা হচ্ছে ভাইব্রেশন বা কম্পন। এটি বায়ু এবং যান্ত্রিক শক্তিতে কাজ করে। গাঁজন করা চা পাতাগুলোকে একটি ফিড সিস্টেমের মাধ্যমে ড্রইং চেম্বারে পাঠিয়ে দেয়া হয়। নিচের হিটার থেকে গরম বাতাস চা পাতাবাহী সচ্ছিদ্র ট্রের নিচ থেকে উপরের দিকে প্রবাহিত হতে থাকে। চা পাতা উপযুক্ত বায়ুচাপ এবং যান্ত্রিক কম্পনের মাধ্যমে চমৎকারভাবে ফ্লুইড তৈরি করে। VFBD এর সুবিধা হল এতে জ্বালানি সাশ্রয় হয় এবং চালানো খুব সহজ ও বেশি পরিমাণ চা শুকানো যায়।

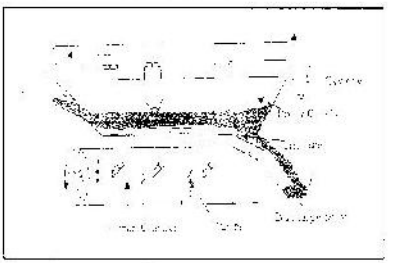

ফ্লুইড বেড ড্রায়ার

ঘ) কম্বিনেশন ড্রায়ার (combination drier, tempest)

এটি হচ্ছে প্রচলিত ড্রায়ার (CD) এবং ফ্লুইড বেড ড্রায়ারের (FBD) সমন্বয়। এতে ড্রায়ার চেম্বারের শীর্ষে, ফ্লুইড তৈরিকরণ অঞ্চলের উপরে ড্রাম থেকে সংগৃহীত ফার্মেন্টেড চা পাতাগুলোকে একটি ঘূর্ণায়মান ট্রের উপরে রাখা হয়। এ অবস্থায় পৃষ্ঠতলের আর্দ্রতা নির্গত তাপের সাথে দূরীভূত হয়। এভাবে ফ্লুইড হবার পূর্বেই আর্দ্রতার একটি অংশ দূরীভূত হয়। প্রচলিত FBD এর তুলনায় এক্ষেত্রে প্রাপ্ত চা পাতার পরিমাণ বেশি হয়।

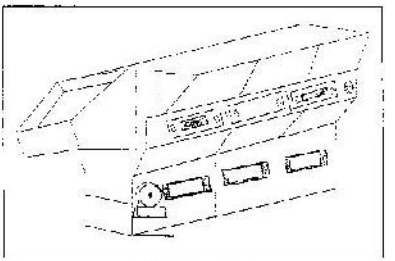

কম্বিনেশন ড্রায়ার

শুষ্ককরণ তাপমাত্রা, আর্দ্রতা এবং চা পাতার মান

ফ্লুইড বেড ড্রায়ারের বিভিন্ন অঞ্চলে চা এর তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা হারানো চা এর গুনগত মানের উপর প্রধান ভূমিকা রাখে। প্রথম অংশে যেখানে পাতার আর্দ্রতা ৫০ শতাংশ কমে যায়, সেক্ষেত্রে প্রথম অংশের শেষভাগে তাপমাত্রা ৪০°-৫০° সে. হওয়া উচিত যাতে এনজাইম নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় এবং সঠিক অনুপাতে TF ও TR পাওয়া যায়। কিন্তু যদি তাপমাত্রা বেশি নেমে যায় তাহলে এনজাইমের কার্যকারিতা চলতে থাকে। এ অবস্থাকে পোস্ট-ফার্মেন্টেশন বলা হয়। এর ফলে পাতাগুলো সিদ্ধ হতে থাকে। দ্বিতীয় অঞ্চলে যেখানে ৩০ শতাংশ ফিডিং তাপমাত্রা অপসারিত হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে ধুল (dhool) তাপমাত্রা দ্বিতীয় অঞ্চলের শেষে ৭০° সে. হওয়া উচিত।

তৃতীয় বা শেষ অঞ্চলে অবশিষ্ট ১৭ শতাংশ ফিডিং আর্দ্রতা অপসারিত হয়, এবং পাতার তাপমাত্রা ৭০°-৮০° সে. হওয়া উচিত।
চিত্র থেকে আর্দ্রতা-তাপমাত্রা সম্পর্কটি বোঝা যাবে।

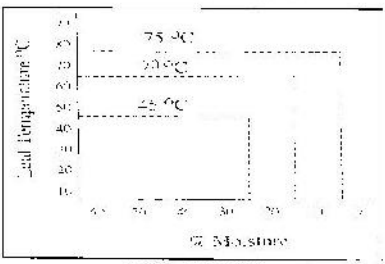

গ্রাজনকৃত পাতা শুষ্ককরণের সময় আর্দ্রতা অপসারণের হার প্রতি মিনিটে ৩.২-৩.৫ শতাংশ হওয়া উচিত। যখন উপযোগী মাত্রার চেয়ে বেশি হয় এবং গভীরের আর্দ্রতা (Core humidity) যথাযথভাবে অপসারিত হয় না, তখন চা পাতা অতিরিক্ত দৃঢ় হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যদি কম হয়, তাহলে এনজাইম সক্রিয় থাকে এবং পোস্ট-ফার্মেন্টেশন চলতে থাকে, যা মোটেই কাঙ্ক্ষিত নয়।

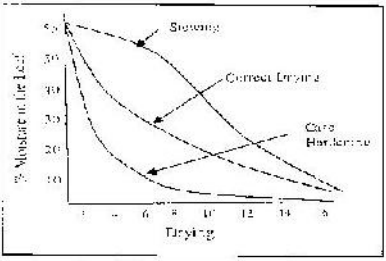

শুষ্ককরণ বক্ররেখা (Drying Curve)

উদাহরণ-১ :

$$\text{আর্দ্রতা অপসারণের হার} = \frac{\text{ফিডিং আর্দ্রতা}}{\text{রেসিডেন্স সময়}}$$

$$\text{Rate of moisture removal (RMR)} = \frac{\text{ফিডিং আর্দ্রতা}}{\text{রেসিডেন্স সময়}}$$

$$= \frac{৫৫}{১৬}$$

$$= ৩.৫\%$$

এখানে আর্দ্রতা অপসারণ হার অনুকূল (optimum)

উদাহরণ-২ :

$$\text{আর্দ্রতা অপসারণের হার} = \frac{\text{ফিডিং আর্দ্রতা}}{\text{রেসিডেন্স সময়}}$$

$$\text{Rate of moisture removal (RMR)} = \frac{\text{ফিডিং আর্দ্রতা}}{\text{রেসিডেন্স সময়}}$$

$$= \frac{৫৫}{১০}$$

$$= ৫.৫\%$$

এখানে আর্দ্রতা অপসারণ হার অনুকূল (optimum) এর চেয়ে বেশি।

তৈরি চায়ের প্রকারভেদ : কালো, সবুজ ও উলং চা

সব চা-ই চা নয়

ঐতিহ্যগতভাবেই 'চা' বলতে *Camellia sinensis* নামক উদ্ভিদের কচিপাতা থেকে প্রস্তুতকৃত চা'কেই বুঝায়। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে অন্যান্য কিছু বৃক্ষের অংশবিশেষ থেকে উৎপন্ন সামগ্রীকেও চা নামে অভিহিত করা হয়। এর ফলে আসল চা, এবং চা নামীয় অন্যান্য পণ্যের মধ্যে কোনটি আসল চা তা নিয়ে সংশয় সৃষ্টি হয়। কিছু মানুষ মনে করে ঐ সকল পণ্যও *Camellia sinensis* থেকে উৎপন্ন আসল চা এবং একই রকম উপকারিতাসমৃদ্ধ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য উদ্ভিদ থেকে তৈরি করা 'চা' নামীয় পণ্য সমূহের রাসায়নিক উপাদান *C. sinensis* থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তবে সেগুলো সম্পর্কে *C. sinensis* এর মত বিস্তারিত গবেষণা করা হয়নি।

একই নাম ব্যবহার করার কারণে বাজারে দোকানের শেলফে সাজিয়ে রাখা 'চা' নামীয় অন্যান্য পণ্যসামগ্রী থেকে আসল চায়ের পার্থক্য বোঝা বেশ কঠিন। সাধারণত এসকল দ্রব্যকে ভেষজ চা (Herbal tea) নামে চালিয়ে দেয়া হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মূল উদ্ভিদের নামের শেষে চা শব্দটি জুড়ে দিয়ে নামকরণ করা হয়। যেমন- ক্যামোমিলি চা, পেপারমিন্ট চা, রুইবস চা ইত্যাদি। বেশি

সংশয় তখনই সৃষ্টি হয় যখন এ সকল পণ্যের ক্ষেত্রে একটি সাধারণ নাম ব্যবহৃত হয়, যেমন – 'লাল চা' (Red tea)। সুতরাং উপরকারিতা পেতে হলে *C. sinensis* থেকে প্রস্তুতকৃত আসল চা চিনে নিতে হবে।

Camellia sinensis বৃক্ষ থেকে প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন প্রকার আসল চা : বিশ্বের বিভিন্ন দেশে চা বৃক্ষ বা *Camellia sinensis* থেকে আহরণকৃত কচি পাতা থেকে বিভিন্ন প্রকার চা উৎপাদন করা হয়। এসকল চাকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- কালো চা, সবুজ চা এবং উলং চা। এ সকল চায়ের পার্থক্য হয় কচি চা পাতা থেকে চা প্রক্রিয়াজাতকরণের বিভিন্ন পদ্ধতির কারণে।

বিশ্বে মোট উৎপাদিত চায়ের ৮০ শতাংশই কালো চা বা Black tea এবং এ চায়ের উৎপাদনকারী শীর্ষস্থানীয় দেশগুলো হচ্ছে শ্রীলঙ্কা, ভারত এবং কেনিয়া। বিশ্বে উৎপাদিত চায়ের ২০ শতাংশ হচ্ছে সবুজ চা বা Green tea এবং এর প্রধান উৎপাদনকারী দেশগুলো হচ্ছে চীন এবং জাপান। মোট উৎপাদনের মাত্র ২ শতাংশ হচ্ছে উলং চা (Oolong tea) যার উৎপাদন এবং ব্যবহার তাইওয়ান এবং চীনের কিছু অংশে সীমাবদ্ধ।

চা গাছের কচি পাতায় বিদ্যমান পানিতে দ্রবণীয় প্রধান রাসায়নিক উপাদানগুলো হচ্ছে 'পলিফেনল' নামক একশ্রেণির যৌগ। চায়ের স্বাদ প্রধানত পলিফেনলের উপর নির্ভরশীল। চায়ের পলিফেনলগুলো Flavonoids নামক উপদলের অন্তর্ভুক্ত যাদের গঠন এবং কাজের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে। চায়ের বিদ্যমান Flavanoid গুলোর মধ্যে Flavanol হচ্ছে প্রধান, যাদেরকে সাধারণভাবে ক্যাটেচিন (Catechins) বলা হয়।

'কালো চা' প্রস্তুতির জন্য প্রথমে চয়নকৃত কচি পাতাগুলোকে ড্রায়ারে উইদারিং ট্রাফের মাধ্যমে শুকানো হয় এবং জলীয় অংশের পরিমাণ প্রায় ৩০ শতাংশ কমানো হয়। তারপর বিবর্ণ পাতাগুলোকে যান্ত্রিক রোলারের সাহায্যে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিকভাবে অনেকগুলো রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হয় যা পাতায় বিদ্যমান বিভিন্ন প্রকার উৎসেচক বা এনজাইম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এসকল রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পন্ন হলে পরবর্তী ধাপ হচ্ছে গাঁজন বা Fermentation। গাঁজন নাম হলেও আসলে এ প্রক্রিয়ায় বাহিরের কোন অণুজীব ভূমিকা রাখেনা বা কোন অ্যালকোহলও উৎপন্ন হয় না। এক্ষেত্রে গাঁজনের মাধ্যমে ক্যাটিচিন থেকে থিয়াফ্ল্যাভিনস (Theaflavins), থিয়ারুবিজিনস (Thearubigins) নামক উপাদান তৈরি হয় এবং উপাদানগুলো কালো চায়ের স্বাদ, গন্ধ ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী।

পরবর্তী ধাপ হচ্ছে উচ্চ তাপমাত্রায় পাতাগুলোকে শুকানো যাতে এতে আর্দ্রতার পরিমাণ ২-৩ শতাংশে নেমে আসে। ফলে তৈরি চা অধিক দিন সংরক্ষণ করা যায়। উচ্চ তাপমাত্রা এনজাইমের কার্যকারিতা বন্ধ করে দেয়। তারপর দানার আকার অনুযায়ী চাকে গ্রেডিং করা হয়। কালো চায়ের সুপরিচিত গ্রেডগুলোর মধ্যে রয়েছে –

i) Orange Pekoe (OP)
ii) Broken Orange Pekoe (BOP)
iii) Broken Orange Pekoe Fannings (BOPF) এবং
iv) গুড়ো বা Dust.

'সবুজ চা' প্রক্রিয়াজাতকরণের প্রথম ধাপ হচ্ছে পাতা চয়নের পরপরই পাতাগুলোকে উত্তপ্ত জলীয়বাষ্পে ঝলসানো বা উত্তপ্ত কড়াইয়ে ফেলে দেয়া। এর ফলে এনজাইমগুলো নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় এবং রোলিং এর পরে আর গাঁজনক্রিয়া ঘটে না। এর ফলে সবুজ চায়ের কচি পাতায় বিদ্যমান চায়ের যাবতীয় রাসায়নিক গুণাবলী অক্ষুণ্ন থাকে।

'উলং চা' (Oolong tea) এর প্রস্তুতি কালো চা প্রস্তুতির অনুরূপ। তবে এক্ষেত্রে রোলিং এর পরে চা পাতাগুলোকে গাঁজনের জন্য কিছু সময় রেখে দেয়া হয়। 'উলং চা' আংশিক গাঁজনকৃত চা এবং এর রাসায়নিক উপাদান কালো চা এবং সবুজ চায়ের মাঝামাঝি, যা গাঁজনের মাত্রার উপর নির্ভর করে।

প্রতিদিন কী পরিমাণ চা পান করা উচিত

১৯৯৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লন্ডনের এ্যান্টিঅক্সিডেন্ট গবেষণা কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত 'Free Radical Research' থেকে একটি চমকপ্রদ তথ্য জানা যায়। এতে দেখানো হয় যে, দু'কাপ চা'তে বিদ্যমান এ্যান্টিঅক্সিডেন্টের পরিমাণ ৭ গ্লাস কমলার রস অথবা ২০ গ্লাস আপেলের রসে বিদ্যমান এ্যান্টিঅক্সিডেন্টের সমান। চা শাকসবজি বা ফলের মত সুষম খাদ্যের বিকল্প হতে পারে না। কিন্তু ১৭০ মিলিলিটার পরিমাণের এক কাপ চা প্রতিদিনের এ্যান্টিঅক্সিডেন্ট চাহিদার উল্লেখযোগ্য অংশ সরবরাহ করতে পারে।

গবেষকদের মতে চা থেকে যথাযথ উপকার পেতে হলে একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের প্রতিদিন ৪ থেকে ৫ কাপ চা পান করা উচিত। এ প্রসঙ্গে চা-পানের এগারোটি উপকারিতা সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করা হল :

১। চা ক্যালরিমুক্ত একটি নিরাপদ, বিশুদ্ধ প্রাকৃতিক পানীয় এবং এতে চর্বি বা সোডিয়াম নেই

২ এটি সজীবতাদান করে এবং সতেজতা আনয়ন করে।

৩। চা পানের মাধ্যমে ঝিমানোভাব দূর হয়, চিন্তাশক্তি জাগ্রত হয়ে এবং স্মরণশক্তি বাড়ে।

৪ ইহা ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়।

৫। ইহা হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়।

৭। এটি কোলেস্টেরল, বিশেষত নিম্নমানের লিপোপ্রোটিন হ্রাস করে।

৮। চা পানের মাধ্যমে রোগ-সংক্রমণ কমে যায়।

৯। এটি দাঁতের ক্ষয়রোধক এবং অস্থির ঘনত্ব বৃদ্ধিকরে

১০। এান্টিঅক্সিডেন্ট থাকায় চাপানের মাধ্যমে আয়ু বাড়ে।

১১। চা সামাজিক সদ্ভাব এবং বন্ধুত্ব দৃঢ় করে

অষ্টাদশ অধ্যায়

বাংলাদেশ চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধির উপায় ও কৌশল

(Methods and Strategies for enhancing production of tea)

আবাদি বিবেচনায় বাংলাদেশ চা বিশ্ব এলাকার ১.৫৪ শতাংশ এবং উৎপাদনে ১.২৭ শতাংশ অবদান রেখে দশম স্থানে রয়েছে। আবার রফতানিতে ০.০৭ শতাংশের ভাগীদার হয়ে দ্বাদশ স্থানে। কিন্তু আমাদের বর্তমান রফতানিযোগ্য প্রায় ১-২ মিলিয়ন কেজি চা যখন বিশ্বের প্রায় ২,০০০ মিলিয়ন কেজির রফতানি বাজারে প্রবেশ করছে তখন কঠিন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়। বাংলাদেশে উৎপাদিত চায়ের অধিকাংশই নিজস্ব চাহিদা মিটিয়ে থাকে। চায়ের অভ্যন্তরীণ চাহিদার পরিমাণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও ক্রমাগত শহরায়নে জনতার শহরমুখীতার কারণে দ্রুত বেড়ে চলছে। এ বৃদ্ধির হার বছরে প্রায় ৩.৫% হারের উর্ধ্বে। উৎপাদনের হার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে না বাড়াতে পারলে আগামী ২০২১ সাল নাগাদ অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ করে কোন চা আর রফতানির জন্য অবশিষ্ট থাকবে না, ফলে বন্ধ হয়ে যাবে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের একটি উৎস। বর্তমানে চা বাগানের আওতাভুক্ত মোট ভূমির মাত্র ৪২% ভূমি চা চাষে এসেছে। এ আবাদি থেকে প্রায় ৬৭.৩৮ মিলিয়ন কেজি চা উৎপন্ন হচ্ছে। কিন্তু এ উৎপাদনমাত্রা গত পাঁচ বৎসরে ৬০ থেকে ৬৭ মিলিয়নে উঠানামা করছে। বর্তমানে চা ফলনে জাতীয় উৎপাদন গড় হেক্টর প্রতি ১,২৭০ কেজি। এ ফলন শ্রীলংকা বা ইন্দোনেশিয়া সমপর্যায়ে, তবুও প্রতিবেশী ভারত ও দূরবর্তী কেনিয়া থেকে এখনও অনেক পেছনে। উন্নততর প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রয়োগের ধারা সর্বত্র অব্যাহত। আধুনিক বিজ্ঞানের দ্রুত সংযোজনে আগামী দু'দশকে প্রতিযোগিতা আরও কঠিন ও তীব্রতর হবে আমাদের চা'কে এ প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতেই হবে।

বিটিআরআই এর হাতে এ মুহূর্তে যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও প্রযুক্তি রয়েছে, চা উন্নয়নে তার পরিপূর্ণ বাস্তব ব্যবহার করলে হেক্টর প্রতি উৎপাদনের অবস্থা এত নিম্নে থাকার

কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। তবে বিগত দেড় দশকের প্রচেষ্টায় দেখা গেছে যে, বিজ্ঞান ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে বাস্তব সুফলের সূচনা হয়েছে মাত্র তাই বর্তমানের উৎপাদন মাত্রা ও গুণাগুণের উপর স্থির না থেকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করে প্রকৃত চা আবাদি জমির পরিমাণ অন্তত ৬০ হাজার হেক্টরে উন্নীতকরণ এবং ফলন হেক্টর প্রতি অন্তত ১,৫০০ কেজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে পারলে ২০২১ সাল নাগাদ অনুমিত ৬৫ মিলিয়ন কেজির অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়েও আনুমানিক ২০/৩০ মিলিয়ন কেজি চা রফতানি করা সম্ভব হবে। তবেই এ ঐতিহ্যবাহী রফতানিমুখী চা শিল্প বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের স্থিতিশীল উৎস হিসেবে দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করার সম্ভাবনা রাখে।

বিশ্বে চা চিত্র ও বাংলাদেশ

বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে বাংলাদেশসহ বিশ্বের অন্যান্য প্রধান চা উৎপাদনকারী দেশের একটি পরিসংখ্যান দিলে প্রাসঙ্গিকতায় সহায়ক হবে। নিম্নে তা উপস্থাপন করা হল :

চা উৎপাদনকারী দেশের আবাদি, উৎপাদন ও ফলন

দেশ	চা আবাদ ('০০০' হে:)	শতকরা হার	অবস্থান	উৎপাদন (মিলিয়ন কেজি)	শতকরা হার	অবস্থান	রফতানি (মিলিয়ন কেজি)	শতকরা হার	অবস্থান	ফলন (কেজি/ হে.)
১। চীন	২১১২	৫৪.৯৯	১ম	১৯৮০	৩৯.৪০	১ম	৩০১	১৬.৫০	৩য়	৭৫১
২। ভারত	৫৭৮	১৫.০৫	২য়	১১৮৫	২৩.৫৮	২য়	২০৮	১১.৪০	৪র্থ	১৬৯০
৩। শ্রীলংকা	১৮৮	৪.৮৯	৩য়	৩৭৮	৬.৭৩	৪র্থ	৩১৮	১৭.৪৩	২য়	১৬৮৪
৪। কেনিয়া	১৮৭	৪.৮৭	৪র্থ	৩৭৮	৭.৫২	৩য়	৪৯৯	২৭.৩৬	১ম	২১০৬
৫। ভিয়েতনাম	১২৮	৩.৩৩	৫ম	১৭০	৩.৩৮	৫ম	১৩০	৭.১৩	৫ম	১৩৪৮
৬। ইন্দোনেশিয়া	১২৩	৩.২০	৬ষ্ঠ	১৩২	২.৬৩	৬ষ্ঠ	৬৮	৩.৭৩	৭ম	১০৩২
৭। তুর্কি	৭৭	২.০০	৭ম	১৩০	২.৫৯	৭ম	৫.৮	০.৩২	১০ম	১৯২১
৮। বাংলাদেশ	৬০	১.৫৪	৮ম	৬৭	১.২৭	১০ম	১.৩	০.০৭	১২শ	১২৭০
৯। জাপান	৪৮	১.২৫	৯ম	৮২	১.৬৩	৯ম	৩.৬	০.২০	১১শ	১৭৩৩
১০। আর্জেন্টিনা	৪০	১.০৪	১০ম	৯৩	১.৮৫	৮ম	৮৬	৪.৭১	৬ষ্ঠ	২৩৩৮
১১। উগান্ডা	২৯	০.৭৬	১১শ	৫৪	১.০৭	১১শ	৪৬	২.৫২	৮ম	২০৩৯
১২। তানজানিয়া	২৩	০.৬০	১২শ	৩৩	০.৬৬	১২শ	২৭	১.৪৮	৯ম	১৪১৬
অন্যান্য দেশ	২৫০	৬.৫১	-	৫১৭	১০.২৯	-	১৭৬	৯.৬৫	-	৭৭১
মোট	৩৮৪১	১০০	-	৫০২৬	১০০	-	১৮২৪	১০০	-	১১৫০

তথ্য: ইন্টারন্যাশনাল টি কমিটি প্রতিবেদন, ২০১৫

বাংলাদেশে চা উৎপাদনের ধারা

ব্রিটিশ রাজত্বকালে চা চাষের সূচনলগ্ন থেকে হাল নাগাদ বাংলাদেশ চা শিল্পে লক্ষ্যণীয় কিছু মৌলিক রূপান্তর ঘটেছে প্রথমেই উল্লেখ্য যে, বর্তমান বাংলাদেশের চা এলাকা ব্রিটিশ আমলে উত্তর-পূর্ব ভারতীয় চায়ের একটি অংশ ছিল। অবিভক্ত ভারতে উনবিংশ শতাব্দির ক্রান্তিলগ্ন পর্যন্ত উন্নয়নের ধারা ছিল ব্রিটিশ মালিকানায় অনেকগুলো লিমিটেড কোম্পানির আধিপত্য। কিন্তু সাতচল্লিশের ভারত বিভক্তির শুরু থেকে এ উত্তর-পূর্ব ভারতীয় চা অঞ্চলের চা দ্বিমূখী ধারায় এগুতে শুরু করে। তথাপিও আমাদের চা বাজার ও বাণিজ্যিক দিক ছাড়া মোটামুটি একই ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন পদ্ধতি অনুসরণ করে আসছে। আবাদি উন্নয়ন ক্ষেত্রে ষাটের দশকে পাকিস্তান আমলে একবার এবং স্বাধীনতা উত্তর আশির দশকে দ্বিতীয়বার কিছুটা পরিকল্পিত উন্নয়নের পদক্ষেপই উল্লেখযোগ্য। নিম্নের সারণি থেকে চা শিল্পের উৎপাদনের উপর এর প্রভাব প্রতীয়মান হবে।

১৯৪৭ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে আবাদির আয়তন, উৎপাদন ও ফলনের তুলনামুলক চিত্র -

বৎসর	আবাদি (হেক্টর)		উৎপাদন ০০০ কেজি		হেক্টর প্রতি ফলন(কেজি)		মন্তব্য
	মোট	পূর্বধাপ থেকে বৃদ্ধি বা হ্রাস	মোট	পূর্বধাপ থেকে বৃদ্ধি বা হ্রাস	মোট	পূর্বধাপ থেকে বৃদ্ধি বা হ্রাস	
১৯৪৭	৩০,৩৩৫	-	১৮,৮৮৪	-	৬২২	-	ভারত বিভক্তি কাল
১৯৫৯	৩১,২৮৭	+৯৩৪	২৫,৫৪৯	+৬৬৬৫	৮১৭	+১৯৫	বাধ্যতামূলক সম্প্রসারন প্রাক্কাল
১৯৭০	৪২,৬৮৮	+১১৪০১	৩১,৩৮১	+৫৮৩২	৭৩৫	-৮২	স্বাধীনতা প্রাক্কাল
১৯৮০	৪৩,৭৩২	+১০৪৪	৪০,০৩৮	+৮৬৫৭	৯১৬	+১৮১	বিটিআরপি প্রাক্কাল
১৯৯২	৪৭,৭৮১	+৪০৪৯	৪৮,৯৩০	+৮৮৯২	১০২৪	+১০৮	বিটিআরপি বন্ধের প্রাক্কাল
১৯৯৬	৪৭,৮৮৮	+৪১৫৬	৫৩,৪০৬	+১৩৩৬৮	১১১৫	+১৯৯	বর্তমান অবস্থা
১৯৯৮	৪৮,৭৩৫	+৯৫৪	৫৫,৮২৪	+৬৮৯৪	১১৪৫	+১২১	গত বিসিএস প্রতিবেদন পর্যন্ত
২০০১	৫০,০৩৭	+১৩০২	৫৬,৮২১	+৯৯৭	১১৩৬	-৯০	-

২০০৩	৫০,৭০০	+৬৬৩	৫৮,৩০৪	+১৪৮৩	১১৫০	+১৪২	-
২০০৫	৫১,৯২২	+১২২২	৬০,১৪০	+১১৮৩৬	১১৫৮	+৮	খরা বছর
২০০৭	৫৩,২০৮	-২৭৭	৫৮,১৮৮	১৯৫২	১০৯৪	-৬৪	খরা বছর
২০০৮	৫৩,৫১৮	+৩১০	৫৮,৬৫৮	+৪৭০	১০৯৬	+৩৮	-
২০০৯	৫৪,০০০	+৪৮২	৫৯,২৪০	+৫৮২	১০৯৭	+১	খরা বছর
২০১০	৫৫,০০০	+১০০০	৬০,০৪০	+৮০০	১১৮০	+৮৩	খরা বছর
২০১১	৫৬,৮৪৬	+১৮৪৬	৫৯,১৩০	-৯১০	১২১০	+৩৫	
২০১২	৫৮,০৯৮	+১২৫২	৬২,৫২০	+৩৩৯০	১২৫০	+৪০	খরা বছর
২০১৩	৫৮,৬৪৪	+৫৪৬	৬৬,২৬০	+৩৭৪০	১৩২৫	+৭৫	খরা বছর
২০১৪	৫৯,৩০৯	। ৮৯০	৬৩,৮৬০	- ২৪০০	১২৩৯	-৮৬	খরা বছর
২০১৫	৬০,১৭৯	+৫৭০	৬৭,৩৮০	+৩৫২০	১২৭০	+৩১	-

বিটিআরপি- বাংলাদেশ টি রিহেবিলিটেশন প্রজেক্ট । উৎস : বাংলাদেশ চা বোর্ড, পিডিইউ এবং বিসিএস (২০১৫)

উপরোক্ত সারণি থেকে প্রতীয়মান হবে যে, ষাট দশকে (১৯৫৯-১৯৭০ পর্যন্ত) ১১,৪০১ হেক্টর পরিমাণ আবাদি বেড়েছে। কিন্তু দশক শেষে অর্থাৎ ১৯৭০ সালে এসে গড় ফলন ৮২ কেজি কমে গেল, যদিও সত্তর দশকে এর প্রভাবে ফলন কিছুটা বেড়েছে। অর্থাৎ ১৯৫৯ থেকে ১৯৮০- প্রায় ২০ বছরে হেক্টর প্রতি ফলন বাড়ল মাত্র ১৮১ কেজি। ১৯৮০ থেকে ১৯৯২ এ ১২ বছরে চা পুনর্বাসন প্রকল্পের ফলে আবাদ বৃদ্ধি পেয়েছে আরও ৪,১৫৬ হেক্টর। কিন্তু এ ক্ষেত্রে গড় ফলন কমেনি বরং পনের বৎসরে বেড়েছে ১৯৯ কেজি। এর ক্রমবর্ধমান প্রভাব আগামী বছরগুলোতেও লক্ষ্য করা যাবে।

চা গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা হয়েছে ১৯৫৭ সালে এবং এর কর্মকাণ্ড ও ফলপ্রসূ গবেষণার সূত্রপাত হতে হতে ষাটের দশক কেটে গেল। ১৯৬৬ সনের আগে কোন উন্নত জাতের ক্লোন দিতে পারেনি ইনস্টিটিউট। ঐ সময়ের মধ্যে মাত্র একটি ক্লোনই আবিষ্কৃত হয় যা মাঠে যেতে যেতে সম্প্রসারণ কর্মসূচি প্রকৃতপক্ষে শেষ হয়ে গেছে। অন্যান্য প্রযুক্তিও খুবই প্রাথমিক পর্যায়ের ছিল

পক্ষান্তরে বিটিআরপি কার্যক্রম শুরু হতে হতে ইনস্টিটিউট থেকে অন্তত তিনটি উন্নত জাতের ক্লোন ও একটি বীজজাত বিমুক্ত হয়েছে এবং এ প্রকল্পে উন্নত জাত ও প্রযুক্তি ব্যবহারে কিছুটা হলেও বাধ্যবাধক করা ও গ্রহণীয়তার আগ্রহে ঘাটতি ছিল না, যার সুফল চা শিল্প ভোগ করতে শুরু করছে। সুতরাং ভবিষ্যৎ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে এই জ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে আরও নিপুণতা ও দৃঢ়তা নিয়ে প্রকল্প প্রণয়ন করতে পারলে সুফল পাওয়া অবশ্যম্ভাবী।

ব্যবস্থাপনাওয়ারি চা শিল্পের অগ্রগতি

ঐতিহ্যগতভাবেই চা শিল্পটি মূলত বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় চলে আসছে। প্রকার ভেদে এ ব্যবস্থাপনাকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হয়। নিম্নের সারণিতে তাদের স্ব স্ব কর্মকাণ্ডের চিত্র (Performance) প্রতীয়মান হবে।

ব্যবস্থাপনাওয়ারি কর্মকাণ্ডের-চিত্র (Performance)

ব্যবস্থাপনা ও বাগান সংখ্যা	বরাদ্দ জমি ও আবাদি			চা শিল্পের মোট জমি		৯৪-৯৬ পর্যন্ত ৩ বৎসরের গড় ফলন হেক্টর/কেজি	'৯৬ সালের (হেক্টর) ফলন
	মোট বরাদ্দ (হেক্টর)	চা আবাদি (হেক্টর)	আবাদি পরিমাণ (শতাংশ)	বরাদ্দের (শতাংশ)	আবাদির (শতাংশ)		
স্টার্লিং কোম্পানি (২৫)	৩৭৫৭৪.৪০	১৮৫৮৯.১০	৪৯.৪৭	৩৩.৪১	৩৮.৭৮	১২৪৬	১৪৫৮
চা বোর্ড (৩)	২৫৫৯.৭৩	১২১৯৮.৭৮	৪৬.৮৩	২.২৮	২.৫০	১৩৫৫	১৪১৮
এনটিসি (১৩)	১০৯৮৬.৫৭	৫১৩৪.৮৪	৪৬.৭৪	৯.৭৭	১০.৭১	১০৫৪	১০৭৬
প্রাইভেট (৫৫)	৩৭৯০২.৬৩	১৪২৮৮.২৮	৩৭.১০	৩৩.৭০	২৯.৮১	৯১৫	৯৪৬
ব্যক্তিমালিকানা (৬২)	২৩৪৪০.৭২	৮৭২৭.৫৩	৩৭.২৩	২০.৮৪	১৮.২০	৬৪৯	৬৪৬
মোট (১৫৮)	১১২৪৬৪.০৫	৪৭৯৩৮.৩৮	৪২.৬৩	১০০	১০০	-	১১১৫

উপরের সারণি থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, ভূমির ব্যবহার সাম্প্রতিক সরকার ঘোষিত নীতির সঙ্গে প্রায় সমঞ্জস্য রয়েছে শুধু স্টার্লিং গ্রুপ, চা বোর্ড এবং এনটিসি এর। কিন্তু প্রাইভেট কোম্পানিগুলো এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন বাগানগুলো ৫০% মাত্রায় পৌঁছুতে অনেক পিছিয়ে আছে। হেক্টর প্রতি ফলনে স্টার্লিং গ্রুপ এবং চা বোর্ডের অধীন বাগানগুলো ব্যতীত অন্যান্য বাগানগুলো জাতীয় গড়ের নিম্নে। এনটিসি প্রায় কাছাকাছি, কিন্তু প্রাইভেট কোম্পানি এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন বাগানসমূহের অবস্থা হতাশাব্যঞ্জক। আবার ব্যক্তি মালিকানাধীন ২/১টি বাগান যেমন শ্রীমঙ্গলের শ্রীগোবিন্দপুর ও চট্টগ্রামের হলদা ভেলি চা বাগান খুবই উৎসাহব্যাঞ্জক।

চলতি শতাব্দী সূচনার প্রথম দশকের মধ্যে এই শেষোক্ত তিন শ্রেণির বাগানগুলোকে প্রাধিকার দিয়ে বিশেষ কর্মসূচির আওতায় উন্নয়ন পরিকল্পনায় এনে বাস্তবায়ন না করলে চা শিল্প পিছিয়েই পড়তে থাকবে। ভাল ব্যবস্থাপনাধীন বাগানকে আরও ভাল করা এবং পেছনে পড়ে থাকা বাগানকে আরও বেগ সঞ্চার করে সমতালে আনাই হবে সফল উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু ও লক্ষ্য।

৩। পরিকল্পনা কাল ও হেক্টর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধির কৌশল

অধিক উৎপাদনশীল আবাদি সৃষ্টি করা একটি সময় সাপেক্ষ ও পুঁজিনির্ভর বিষয়। এর সঠিক পরিকল্পনা রচনায় চা উৎপাদনে নিয়ামক কতিপয় বিজ্ঞানভিত্তিক জরুরি দিক নিম্নে আলোচনা করা গেল :

৩.১। চায়ের জীবনকাল, উৎপাদনধারা ও উৎপাদনক্ষমতা

আবাদি সম্প্রসারণ, পুনঃরোপণ বা শূন্যতা পুনর্ভরণে চায়ের অর্থকরী জীবনকাল, গাছকে পরিপূর্ণ ফলনে আনার পদ্ধতি এবং বয়সানুপাতে কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন সম্বন্ধে প্রাক-ধারণা, সুষ্ঠু পরিকল্পনা রচনায় সহায়ক হবে।

উৎপাদন নির্ধারণীতে চা গাছের বয়স অন্যতম নিয়ন্ত্রক। দেখা গেছে যে, যতই পরিচর্যা করা হোক না কেন, পঞ্চাশ বৎসরের পর চা গাছ বেঁচে থাকলেও আর অর্থকরীভাবে উৎপাদনক্ষম থাকে না। ১৬ থেকে ৩০ বৎসরই উৎকৃষ্ট সময় ও যৌবনকাল বলা যায়। আবার প্রথম চার বৎসর পর্যন্ত খুবই নাজুক এবং তরুণ বয়স। নিম্নে উদ্ধৃত উত্তর-পূর্ব ভারতের চায়ের উপর একটি পরীক্ষণ থেকে সম্যক কিছু ধারণা পাওয়া যাবে (এফ. রহমান, ১৯৯০)।

বিভিন্ন বয়সী চায়ের হেক্টর প্রতি তৈরি চা ফলনের গড় পরিমাণ (কেজি)

বয়স শ্রেণি	আসাম রাজ্যের বিভিন্ন চা অঞ্চল			
	দুয়ার্স	মঙ্গলদই	ঠাকুরবাড়ী	বিশ্বনাথ
৫০ উর্ধ্ব	২৪০০	২১০০	২০০০	২৩০০
৩১-৫০	২৮০০	২৩০০	২২০০	২১০০
১৬-৩০	৩০০০	২৬০০	২৩০০	২৩০০
৪ ১৫	৩০০০	২৯০০	২৫০০	২৪০০
৪ এর নিম্ন	১২০০	১২০০	১২০০	১২০০

আরও দেখা গেছে যে, ৫০ উর্ধ্ব বয়সের চা থেকে ৩০ বৎসরের কাছাকাছি নিম্ন বয়সের চা থেকে হেক্টর প্রতি ৪০০-৮০০ কেজি কম চা উৎপন্ন হয়। অত্র ইনস্টিটিউট থেকে সারা বাংলাদেশের চায়ের উপর এক পরীক্ষণে দেখা গেছে যে, একর প্রতি সর্বোচ্চ উৎপাদন পাওয়া গেছে ১১.৬৬ মণ অর্থাৎ হেক্টর প্রতি ১০৮০ কেজি ২১-৩০ বৎসরের চা থেকে। ৩০ বৎসরের পর উৎপাদনের প্রবণতা নিম্নগামী, কিন্তু এ ফলন ৫০ বৎসরের পর খুব দ্রুত পড়তে থাকে। এ সমীক্ষণে বাংলাদেশের চায়ের ৪০-৫০ বৎসরই অর্থকরী জীবনকাল বলে প্রতীয়মান হয়েছে (গার্জ, ১৯৭৮)। এ সকল ধারণার বশবর্তী হয়েই প্রধানত শ্রমিক জনবল প্রাপ্তি, পুঁজি বিনিয়োগ ও আবাদির বর্ধনশীলতা বা স্থিতিরক্ষার্থে পুনঃরোপণ ও সম্প্রসারণ মিলিয়ে নতুন আবাদির হার ধার্য করা হয়েছে ২.৫%। এর ব্যত্যয় ঘটলে আবাদিতে অনুৎপাদনশীল চায়ের পরিমাণ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়ে গড় চা উৎপাদন হ্রাস করে এক পর্যায়ে বাগানকে স্থবির ও অলাভজনক করে ফেলবে।

৩.২। উন্নত জাত

চায়ের জাত ও অঞ্চলভেদে উৎপাদনে উল্লেখ্যযোগ্য তারতম্য হতে পারে। আবার একই জাতের বীজচারা বা ক্লোন প্রতিবেশের কারণে উৎপাদনের উত্থান-পতন লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে প্রতিবেশোপযোগী জাত পূর্বাহ্নেই চিহ্নিত করা অবশ্য করণীয়

হেক্টর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধিতে উন্নতজাত নির্বাচন সর্বাধিক এবং প্রাথমিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এজন্য ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত উন্নত জাতের ক্লোন ও বীজজাত একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এছাড়াও বাহির থেকে আনা কিন্তু আমাদের প্রতিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়া অধিক উৎপাদনশীল জাত ব্যবহারেও আপত্তি নেই। তবে অন্ধ বিশ্বাসে এবং দেশে নির্ভরযোগ্য নিরীক্ষণ ছাড়া তার ব্যাপক আবাদি ঝুঁকিপূর্ণ এবং তার পরিণামে নিজের ও অন্যের আবাদিতে কুফল বয়ে আনতে পারে।

আমাদের চায়ের অনুৎপাদনশীলতার অন্যতম কারণ হচ্ছে অনুন্নত সেকেলে বীজজাতের আবাদি। সাম্প্রতিক এক পরীক্ষণে দেখা গিয়েছে যে, ৯০% আবাদিই অপেক্ষাকৃত কম উৎপাদনক্ষম মণিপুরি বা নিম্ন হাইব্রিড জাতের বীজ চারার। ক্লোন আবাদি সাকুল্যে ১০% এর অধিক হবে না। অবশ্য কোম্পানি ও বাগান বিশেষে এর হার বেশি দেখা গেছে। এরূপ ৩৪টি বাগান যা দেশের মোট আবাদি জমির ৩০% ব্যবস্থাপন করছে, ক্লোন চাষের পরিমাণ সেখানেও ১৬% এর অধিক নয় এবং সেখানে আবাদ বৃদ্ধির হার বছরে মাত্র ১% (আলম, ১৯৯৬)। আগামী আবাদিতে গ্রহণীয় ও অনুসরণীয় বিটিআরআই উদ্ভাবিত উন্নতমানের ক্লোন ও বীজ জাতের ফলন ও গুণাগুণ নিম্নের সারণিতে উল্লেখ করা গেল।

বিটিআরআই উদ্ভাবিত ও নিজস্ব খামারে পরীক্ষিত ক্লোন ও বীজ চারার ফলন ও গুণাগুণ

ক্লোন/বীজ জাতের নাম	বিমুক্তির বছর	হেক্টর প্রতি ফলন (কেজি)			আস্বাদনী মান	চা শিল্পের ব্যবহার
		অপ্রাপ্ত বয়স্ক (৩য়-৫ম বৎসরের গড়)	প্রাপ্ত বয়স্ক চা গড় (বৎসরের)	সর্বোচ্চ রেকর্ড		
ক্লোন বিটি ১	১৯৬৬	১৬১৪	৩২৯৮(১৪)	৪৬৮৩	উৎকৃষ্ট	বহুল
ক্লোন বিটি ২	১৯৭৫	১৮২০	৩৬২৭(১৪)	৪৮৭৪	উৎকৃষ্ট ও দার্জিলিং সুবাসিত	বহুল
ক্লোন বিটি ৩	১৯৭৫	১৪৭৬	৩৪৩১(১৪)	৪৫০৪	গড়মানের ঊর্ধ্বে	স্বল্প
ক্লোন বিটি ৪	১৯৮১	১৪১৮	২৫৮১(১৪)	৩৭৫৭	উৎকৃষ্ট	স্বল্প
ক্লোন বিটি ৫	১৯৮৭	২০৮৩	২৮১১(৭)	৪৩১৩	গ্রহণীয় উৎকৃষ্ট	বহুল
ক্লোন বিটি ৬	১৯৮৮	২১৮৯	২৯১৬(৭)	৪১০২	উৎকৃষ্ট	বহুল
ক্লোন বিটি ৭	১৯৯১	১৬৪৬	২৭৯০(৯)	৪০০৪	গড়মানের ঊর্ধ্বে	স্বল্প কিন্তু ক্রমবর্ধন শীল
ক্লোন বিটি ৮	১৯৯২	২১৪০	৩৩১৬(৭)	৫৪১০	গড়মানের ঊর্ধ্বে	ঐ
ক্লোন বিটি ৯	১৯৯৪	২০৭৬	৩৫৭৪(১২)	৪৩১৯	গড়মানের ঊর্ধ্বে	ঐ
ক্লোন বিটি ১০	১৯৯৫	৩৭৩০	৪৪৯৪(৫)	৫১০৮	গড়মানের ঊর্ধ্বে	ঐ

ক্লোন বিটি ১১	১৯৯৯	২৫১৫	৩৭১৩(৭)	৫১৭৯	গড়মানের ঊর্ধ্বে	
ক্লোন বিটি ১২	২০০০	১৯১৭	৪০১৮(৫)	৫২০৯	গড়মানের ঊর্ধ্বে	
ক্লোন বিটি ১৩	২০০০	১৫০২	৩২৩৩(৪)	৩৮৭৩	গড়মানের ঊর্ধ্বে	
ক্লোন বিটি ১৪	২০০২	১৬৮৩	৩৪৫০(৪)	৪০৫১	গড়মানের ঊর্ধ্বে	
ক্লোন বিটি ১৫	২০০২	১৯৩৮	৩৭৩৫(৬)	৪৮৩০	উৎকৃষ্ট	
ক্লোন বিটি ১৬	২০০৫	১২৮৮(৫)	৩৬৩৪(৪)	৪২৩১	গড়মানের ঊর্ধ্বে	
ক্লোন বিটি ১৭	২০০৬	১৮৭৩	৩৮৯৭(৭)	৫২৩৮	গড়মানের ঊর্ধ্বে	
ক্লোন বিটি ১৮	২০১৩	১৫৫৭	৩৭৭৭ (৭)	৪৬১৮	গড়মানের ঊর্ধ্বে	
বাইক্লোনাল বীজজাত বিটিএস ১	১৯৮৭	১৫১৬	৩৩৫৬(৪)	৩৭৪৪	গড়মানের ঊর্ধ্বে	বহুল
বাইক্লোনাল বীজজাত বিটিএস ৩	২০০১	১৮১১	৩৩৮৩(৭)	৩৯৫৬	গড়মানের ঊর্ধ্বে	
বাইক্লোনাল বীজজাত বিটিএস ৪	২০০১	১৬৮৭	৩৩১৪(৪)	৩৮৯০	গড়মানের ঊর্ধ্বে	
সাধারন বীজজাত (তুল্য নিয়ামক হিসেবে)		৭৯৮	১৫৭৪(১২)	২০৮১	গড়মানের ঊর্ধ্বে	অনুরূপ ও বহুল

সাধারণের মাঝে একটা বদ্ধ ধারণা রয়েছে যে গবেষকের গবেষণাগারে বা পরীক্ষণ প্লটে লব্ধ চা ফলনের সঙ্গে বাগানের জমিতে প্রাপ্ত প্রকৃত ফলনের বিরাট ফারাক। কিন্তু বিটিআরআই পরীক্ষাক্ষেত্রে লব্ধ উৎপাদনের সঙ্গে প্লান্টারদের বাগানে লব্ধ ফলাফল সামঞ্জস্যপূর্ণ। তুলনার সুবিধার্থে এরূপ তিনটি বাগানের আবাদকৃত ইনস্টিটিউট থেকে প্রথম দিকে বিমুক্ত উন্নত জাতের চায়ের উৎপাদনের উপর সংগৃহীত যথাসম্ভব নির্ভরযোগ্য উপাত্ত উপস্থাপন করা হলো।

চা বাগানে বিটিআরআই বিমুক্ত উন্নত জাতের দুটি ক্লোন ও একটি বীজজাত এবং টোকলাই ক্লোন টিভি১ এর তুলনামূলক উৎপাদন চিত্র

গাছের বয়স	ক্লোন বিটি ১		বিটি ১ + বিটি ২ মিশ্রণ	বিটি ২	টিভি ১		বাইক্লোনাল বীজজাত বিটিএস ১
	মধুপুর*	ধামাই*	বিদ্যা বিল (রাজঘাট)	মধুপুর*	বিদ্যাবিল (রাজঘাট)	ধামাই*	মধুপুর*
০	-	-	-	-	-	-	-
১	রেকর্ডহীন	রেকর্ডহীন	রেকর্ডহীন	রেকর্ডহীন	-	-	-
২	"	"	"	১৩১৫		রেকর্ডহীন	২৫০
৩	"	"	"	২০৫৩	-	"	২৫৪
৪	২৩৮০	৮৬৫	৯৫৯	২২৭৭	-	১০০৬	১০৪৯
৫	৩০৬২	১৬০০	১৪১৪	২৪৬৭	-	১৪৯৬	২০৯৪
৬	১৯২৭	১৭৫৫	১২২৯	২৭৯৬		১৫৪২	২৬৩৩
৭	১৯৪৭	২৩৪৮	১৭৯৩	৩২৭২	-	১৯৮৩	২১৬২
৮	২৪৫৯	২২০৪	১৮৩০	-	-	২১৮৪	৩০৪২
৯	২০৬৭	২০৯৬	২১৬৩	-	-	২১৯৭	২৯৫২
১০	১৫৬৬	২১৮০	২০০০	-	-	১৭৭০	-
১১	২৫৮২	২৩৪২	২৯০৯		-	২৩১০	-
১২	২৪০০	২২৩২	২১৬৩	-	-	২১৩০	-
১৩	৩০০০	-	৩৫০৩	-	-	-	-
১৪	২২৭০	-	২২০৫	-	-	-	-
১৫	৩৩৪৫	-	২৮৫২	-	-	-	-
১৬	৩৫৮৪		২৫৩২	-	-	-	-
১৭	৩৪১২	-	২৮৭২	-	-		
১৮	২৪৭৭	-	-	-	-	-	-
১৯	৩১০৪	-	-	-	-	-	-
২০	৩৭০৫	-	-	-	-	-	-
অপ্রাপ্ত বয়স্ক গড়	২৭২১ (২)**	১২৩৩ (২)**	১১৮৭ (২)**	২০২৮ (৪)	-	১২৫৬ (২)**	৯১১ (৪)
প্রাপ্ত বয়স্কের গড়	২৬৬১ (১৫)	২১৬৫ (৭)	২৩৩৭ (১২)	৩০৩৪ (২)*	২২৩৫ (১৪)* **	২০১৮ (৭)	২৬৯৭ (৪)*

উপাত্ত উৎস: কেদারপুর টি কোং লি., নিউ ধামাই টি কোং লিং এবং জেমস ফিনলে পিএলসি এর সৌজন্যে উল্লিখিত স্ব স্ব চা বাগান

* আবাদি পুনর্বাসিত এলাকা ও পুনঃরোপণ।

** অপ্রাপ্ত বয়স্ক উপাত্ত অপর্যাপ্ত।

*** বিদ্যাবিলের টিভি১ আবাদিটি ১৯৬৭ সালে রোপণকৃত এবং ১৯৮৪ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত প্রাপ্ত বয়স্কতার ১৪ বৎসরের গড় ফলন নেয়া হয়েছে

উৎস : বিটিআরআই এর প্রাক্তন পরিচালক, জনাব এ.এইচ.এম বদরুল আলম।

উৎপাদন বৃদ্ধিতে যে উন্নয়ন লক্ষ্য ধার্য করা হবে তাতে উফশী (উচ্চফলনশীল) জাতের ক্লোন ও বীজজাতের পরীক্ষালব্ধ ফলাফল ও প্লান্টারদের মাঠে প্রাপ্ত ফলাফলের আলোকে এবং ২১ শতকের প্রথম দশকে চা শিল্পকে নিজ স্বার্থেই প্রযুক্তি প্রয়োগে আরও যত্নবান ও দায়িত্বশীল হতে হবে। এ আশা নির্ভরে মোটামুটি রক্ষণশীল থেকেই ব্যবহার্য উফশী জাতের চা গাছের প্রাক্কলিত ফলন সংশোধনী (এস্টিমেটেড ক্রপ পারফরমেন্স) নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

রোপণ বয়স	ছাঁটাই প্রক্রিয়া	কর্ষিত উৎপাদন কেজি/হেক্টর
অপ্রাপ্ত বয়স্ক চা গাছ		
০ বৎসর (রোপণকাল)	-	-
১ম "	ডিসেন্টার/ব্রেকিং	-
২য় "	প্রুন	৫০০
৩য় "	স্কীফ	১৪০০
৪র্থ "	প্রুন	১৬০০
৫ম "	এসএসকে	২৫০০
প্রাপ্ত বয়স্ক চা গাছ		
৬ষ্ঠ "	এলপি	১৮০০
৭ম "	ডিএসকে	২৫০০
৮ম "	এমএসকে	৩০০০
৯ম "	এলএসকে	৩২০০
১০ম "	এলপি	২৪০০

৩.৩। মাটি ও আবহাওয়া

চায়ের মাটি ও আবহাওয়ার জ্ঞাতব্য ও জরুরি দিক বিবেচনায় রেখে অনুকূল ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব। যেমন-

মৃত্তিকা উর্বরতা	- বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণযোগ্য
" বুনট	- অনিয়ন্ত্রণযোগ্য
" তস	- আংশিক নিয়ন্ত্রণযোগ্য
" বায়ু চলাচল	- আংশিক নিয়ন্ত্রণযোগ্য
" পানি নিস্কাশন	- বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণযোগ্য
বৃষ্টিপাত ও উহার বণ্টন বিস্তৃতি	- অনিয়ন্ত্রণযোগ্য
পারিপার্শ্বিক তাপমান	- আংশিক নিয়ন্ত্রণযোগ্য
উদ্বায়ন (এভাপোরেশন)	- আংশিক নিয়ন্ত্রণযোগ্য
দিনের ব্যাপ্তি (ডে লেনথ্)	- অনিয়ন্ত্রণযোগ্য

একজন দক্ষ ব্যবস্থাপক উপরোক্ত বিষয়গুলোর উপর তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান সংগ্রহে এবং প্রয়োজনে বিটিআরআই থেকে পরামর্শ নিয়ে লাভবান হতে পারেন।

৩.৪। মাঠ ব্যবস্থাপনা

যেখানে গাছের সর্বোৎকৃষ্ট বৃদ্ধির জন্য আদর্শ প্রতিবেশ অর্থাৎ কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা নেই শুধু সেখানের কোন উফশী জাতের ক্লোন বা বীজজাত তার

বংশগতিক সংসাধনী সম্ভাবনা (জেনেটিক পটেনসিয়াল) অনুযায়ী সর্বোচ্চ উৎপাদন দিতে সক্ষম কিন্তু বাস্তবে এরূপ আদর্শ পরিবেশ প্রাপ্তি বিরল। তবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে ত প্রাপ্তিতে উদগ্র বাসনা থাকতেই হবে এবং সে লক্ষ্যেই টেনে নিয়ে যাবে সাফল্যে। আমদের চায়ের জন্য এর অপরিহার্য্য উপাদনগুলো হচ্ছে-পুষ্টি, ছায়া, পানি নিষ্কাশন, মৃত্তিকারস (সয়েল ময়েশচার) সংরক্ষণ, রোগ-বালাই দমন, আবাদির শূন্যতা (ভেকেন্সি) পূরণ, ছায়া ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। অবশিষ্ট কিছু উপাদান প্রকৃতিগতভাবেই পর্যাপ্ত রয়েছে। ঘাটতি দেখা দিলে ক্ষেত্র বিশেষে নিরীক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে চিহ্নিত করে পূরণ করা যেতে পারে।

৩.৪.১। আবাদ বসতি (রোপণ দূরত্ব)

গাছের বসতি ও উৎপাদনের সম্পর্ক অধিবৃত্তাকারিক (প্যারাবোলিক)। ঘন বসতিপূর্ণ আবাদি ভূমির পরিপূর্ণ আচ্ছাদন সৃষ্টিকাল পর্যন্ত উচ্চফলন দিতে পারে। কিন্তু পরিণামে গাছে গাছে প্রতিযোগিতা চরমবৃদ্ধির ফলে উৎপাদন কাঙ্ক্ষিত বয়োবৃদ্ধির আগেই হ্রাস পেতে থাকে। বিভিন্ন বসতিপূর্ণ আবাদি থেকে প্রতীয়মান হয়েছে যে, হেক্টর প্রতি ১৪,০০০ গাছ সংখ্যাই আদর্শ বসতি। এ সংখ্যার অধিক হলে চায়ের অর্থকারী বয়সও আনুপাতিক হারে হ্রাস পাবে, যদিও তা প্রথম ৭-১০ বছর উচ্চ ফলন দিবে। সুতরাং রোপণকালে বসতি সংখ্যা নির্ধারণ একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক।

৩.৪.২। পুষ্টি

সকল উদ্ভিদের ন্যায় চায়ের জন্য সকল মৌলিক পুষ্টি উপাদানগুলিও অপরিহার্য্য। এর কিছু প্রাকৃতিকভাবেই গাছ পেয়ে থাকে। অবশিষ্ট যেমন- মূখ্য পুষ্টির মধ্যে নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশ এবং গৌণ পুষ্টির মধ্যে জিঙ্ক নিয়মিতভাবেই মাটিতে এমনকি কোন কোন উপাদান পল্লবের উপরিভাগে প্রয়োগের মাধ্যমে সরবরাহ করতে হয় স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, এক হাজার কেজি তৈরি চা উৎপাদিত হলে সেখানে মাটি থেকে ৫০ কেজি নাইট্রোজেন, ১০ কেজি ফসফরাস, ৪০ কেজি পটাশ, ১০ কেজি ক্যালসিয়াম, ৭ কেজি ম্যাগনেসিয়াম ও ১ কেজি জিঙ্ক আহরিত হয় (কিররিয়া, ১৯৯৮)। বাংলাদেশ চায়ের মাটির গুণাগুণ বিচার-বিশ্লেষণ করে প্রধান কয়েকটি পুষ্টি উপাদানের সন্ধিক্ষণমাত্রা নিরুপণ করা হয়েছে। মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা ও উর্বরতা রক্ষার লক্ষ্যই থাকবে এ মানের উপরে অবস্থান করা এ মান হচ্ছে নাইট্রোজেন - ০.১%, জৈব অংশ - ১.০%, প্রতি গ্রাম মৃত্তিকায় ফসফরাস - ১০ মাইক্রোগ্রাম, পটাশিয়াম- ৮০ মাইক্রোগ্রাম, ম্যাগনেশিয়াম- ২৫ মাইক্রোগ্রাম এবং ক্যালসিয়াম -৯০ মাইক্রোগ্রাম। এছাড়া কার্বন- নাইট্রোজেনের অনুপাত (সিএন রেসিও) হবে ১০ : ১। মাটির পি এইচ মান ৪.৫ - ৫.৮ স্থির রাখতে হবে। এর নিচে চলে গেলে সাধারণত চুন বা ডলোমাইট দিয়ে সংশোধন করা হবে। আর উপরে গেলে সালফার জাতীয় উপাদান প্রয়োজন হবে। এজন্য বিটিআরআই এর দীর্ঘ গবেষণালব্ধ সুনির্দিষ্ট সার প্রয়োগ সুপারিশমালা রয়েছে সেগুলো অবশ্যই অনুসরণীয়। এছাড়াও রয়েছে পুনরোপনের পূর্বে কোন মাটিকে যথোপযুক্ত পুষ্টিমানে ফিরিয়ে আনতে মৃত্তিকা পুনর্বাসন সুপারিশমালা।

৩.৪.৩। পোকা-মাকড় ও রোগ-বালাই দমন

প্রায় প্রতিষ্ঠিত যে, চায়ে পোকা-মাকড় ও রোগ-বালাইয়ের কারণে অন্তত ১৫% ফলন নষ্ট হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পোকা-মাকড় ও রোগ-বালাইয়ের মৌসুম বিশেষে শস্যের এ ক্ষতি ১০০% পর্যন্ত হতে পারে। এ জন্য ইনস্টিটিউটে নির্ধারিত আই পি এম অনুসরণে পেস্ট নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি এবং কোন ধরনের পেস্টিসাইড সঠিক সময় ও মাত্রায় সুফল পাওয়া যাবে সে সম্বন্ধে পেস্ট ব্যবস্থাপনার সুস্পষ্ট সুপারিশমালা আছে। তবু পেস্টিসাইড রেসিডিউ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক বিধি-নিষেধ মেনে অবশ্যকরণীয় বিষয়গুলোকে আমলে নিতে হবে।

৩.৪.৫ পানি নিষ্কাশন

পানি নিষ্কাশন (ড্রেইনেজ) চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধিতে একটি বড় অন্তরায়। বাগানভুক্ত অনেক আবাদি এলাকা এবং ভবিষ্যতের সম্ভাব্য আবাদি এলাকা নানা কারনে এই নিষ্কাশন সমস্যায় নিপতিত ও সমস্যাপীড়িত। ফলে প্রায় ১০-২০% ফলন কম হয় বলে অনুমান করা হয়। এতে গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও উৎপাদন বিঘ্নিত হতে বাধ্য। তাছাড়া গাছের বিশেষত মাটির তলার শেকড়ের রোগ বালাইয়ের অন্যতম প্রধান অনুকূল পরিবেশ হচ্ছে জলাবদ্ধতা ও পানি নিষ্কাশনজনিত সমস্যা। এ সমস্যা শুধু উৎপাদন নয়, চায়ের জীবনীশক্তি নষ্ট করে চা'কে স্বল্পজীবীও করে ফেলবে।

৩.৪.৬। সেচ ব্যবস্থা

চায়ের নতুন আবাদির সফলতা নির্ভর করে অপ্রাপ্ত বয়স্ক চায়ের যাবতীয় পরিচর্যার উপর। আজকাল শীতকালীন রোপণের মাধ্যমে (উইন্টার প্লান্টিং) নতুন রোপণকে স্বল্পতম সময়ে ফলনশীল করা, জনবলের সদ্ব্যবহারের প্রযুক্তি হাতের মুঠোয়। আবার সেচ ব্যবস্থার অভাবে শীতকালীন রোপণে মৃত্যুহার ৮০% পর্যন্ত হতে পারে। শুষ্ক আবহাওয়ায় মাটির রস সংরক্ষণে মালচিং ছড়াও সেচ সুবিধে নিশ্চিত করতে পারলে শীতকালীন চা রোপণ উত্তম এবং চায়ের ফলনকালও এগিয়ে আনা সম্ভব।

৩.৪.৭। আদর্শ চয়ন পদ্ধতি

চায়ের উৎপাদন বলতে যা বুঝায় তা সার্থক চয়ন লভ্যতার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। অন্যান্য সকল প্রক্রিয়া ও প্রচেষ্টার সার্থক রূপায়ন এখানেই নিহিত। চা গাছ থেকে কচি ও বর্ধনশীল পত্র-পল্লব সুনির্দিষ্ট বিরতিকালে তুলে নিয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তুত প্রণালীর দ্বারা তৈরি চায়ের (মেইড টি) শুকনো ওজনের হিসাবকেই 'উৎপাদন' বলা হয়।

একটি চা গাছ দৈহিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে (বিশেষত সালোকসংশ্লেষণ ও শ্বসন পদ্ধতিতে) যতটুকু সার বস্তু (ড্রাই মেটার) ধরে রাখতে পারে সে অনুপাতে উৎপাদন অংশে সার বস্তুর পরিমাণ সামান্যই (হার্ভেষ্ট ইনডেক্স) এবং তা ১৫% এর বেশি নয়। চায়ে সারবস্তু হয় প্রধানত চয়নতলের নিম্নাঞ্চলে রক্ষিত পালনপত্র সমাহার (মেইন্টেনেন্স ফলিয়েজ) দ্বারা এবং বিভাজিত হয়ে (পার্টিশনিং) বর্ধনশীল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আধারে (সিঙ্ক), যেমন-পত্র, কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা, মূল ইত্যাদিতে সঞ্চিত হয় অথবা

অঙ্গবর্ধনে ব্যয় হয়। সারণিতে এ বিভাজনের উপর পরীক্ষালব্ধ একটি উদাহরণ (ওথিনো, ১৯৮২, বরুয়া, ১৯৮৭) উপস্থাপন করা গেল।

চয়ের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গে গড় সংবস্তু আহরণের হার (পাঁচটি ক্লোনের গড়)

লব্ধ ওজন	চয়নপল্লব	পরিণত পত্র	কাণ্ড	মূল	সমস্ত উদ্ভিদ
টন/হেক্টর	১.০৪	২.১১	৪.৪৬	১.৫৬	৯.১৭
% সমুদয় গাছের	১১.৩০	২৩.০০	৪৮.৬০	১৭.১০	১০০.০০
ব্যপ্তি (রেঞ্জ)	৮.৩০- ১২.৭	২০.৫- ২৫.৫	৪৪.৪- ৫১.২	১৩.৫- ২৪.৭	-

ক্লোন ও বীজজাত চা গাছের এ উৎপাদন তিনটি প্রধান কারণে প্রভাবিত হয়, যথাঃ

ক) চয়ন তলের (প্লাকিং টেবল্) একক আয়তনে চয়নযোগ্য পল্লব সংখ্যা।

খ) চয়িত পল্লবের (প্লাকড্ সুট) ওজন।

গ) পল্লব বৃদ্ধির হার।

প্রথম দু'টি মূলত বংশগত বৈশিষ্ট্য, কিন্তু ছাঁটাই (প্রুনিং) ভেদে এর তারতম্য হয়। তৃতীয়টি প্রধানত পরিবেশের উপর নির্ভরশীল অবশ্য বংশগত কারণও অন্যতম নিয়ামক। একজন বিজ্ঞানী ও সফল ব্যবস্থাপকের লক্ষ্যই থাকবে কীভাবে এ চয়নাংশ বৃদ্ধি করে উৎপাদনের সর্বোচ্চ সুযোগ নেয়া যায়।

৪। উন্নয়ন লক্ষ্য ও কৌশল

অধিক ফলন ও উৎপাদনের লক্ষ্যে আমাদের দেশেই পূর্বে অনুসৃত দু'টি বৃহৎ উন্নয়ন কর্মসূচির উল্লেখসহ বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করা হয়েছে ভারত ও কেনিয়া যারা চা উৎপাদন বৃদ্ধির কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করতে গিয়ে যে সকল কর্মপন্থা অবলম্বন করে লাভবান হয়েছেন এবং জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির এক নজীর স্থাপন করেছেন, তাঁদের কৌশলগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে যে, দু'একটি বিষয় যেমন, ভূমিভেদে হার্বিসাইড ব্যবহার সীমিত রাখা, ছায়াতরুর আবশ্যকতা, ইত্যাদি ছাড়া আমাদের সঙ্গে তাদের বিশেষ কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। আমাদের পন্থাও এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ভারতের চা আবাদির প্রধান উন্নয়ন কৌশল ছিল দীর্ঘ প্রুনিং-চক্র, রাসায়নিক দ্বারা আগাছা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন, অবাদি শূন্যতা পুনর্ভরণ, সার প্রয়োগ নীতিমালা, সম্প্রসারণ ও পুনরাবাদ, ছায়াতরু ব্যবস্থাপনা, পোকা-মাকড় ও রোগবালাই নিয়ন্ত্রণ, উফর্শী জাতের ব্যবহার এবং গাছের অধিক বসতির প্রযুক্তির ব্যবহার (এফ রহমান, ১৯৯০) অপরদিকে কেনিয়ার কৌশল ছিল অবাদি ছায়াবিহীন করা, উন্নত সার নীতিমালা, হার্বিসাইডের ব্যবহার, গৌণ উপাদান-জিঙ্কের ব্যাপক ব্যবহার এবং দীর্ঘতর চয়ন বিরতিকাল ও 'স্কীম চয়ন' পদ্ধতির প্রবর্তন। আমাদের নতুন পরিকল্পনায়ও প্রয়োজনে কিছু নতুন সংযোজন করে নবরূপায়নে কার্যকর করা আশু প্রয়োজন মাত্র।

৪.১। পরিকল্পনার প্রতিপাদ্য বিষয় ও আবাদি লক্ষ্যমাত্রা

এ পরিকল্পনা করতে নিম্নের বিষয়গুলি বিবেচনায় আনা হয়েছে:

ক) রোপণ থেকে কত বৎসর পর এবং কবে বর্তমান জাতীয় গড় ফলনকে অতিক্রম শুরু করবে তা নির্ধারণ করা। প্রকৃতপক্ষে তখন থেকেই নতুন আবাদির মোট উৎপাদন বৃদ্ধিতে ইতিবাচক প্রতিফলন ঘটবে।

খ) কতটা আবাদি আরও পুরাতন হয়ে জাতীয় গড় উৎপাদনকে আরও নিম্নগামী করবে তা বিবেচনায় রাখা।

গ) 'ক' এবং 'খ' তে বর্ণিত চায়ের সমন্বিত উৎপাদন-চিত্র বিবেচনায় নতুন রোপণ এবং পুরাতন চা উৎপাদন প্রক্রিয়া ও পরিমাণ সাব্যস্ত করতে হবে।

ঘ) এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, চা বাগানে বরাদ্দকৃত প্রায় ১১৪ হাজার হেক্টরের মধ্যে প্রায় ৬০ হাজার হেক্টর আবাদি ব্যাতীত পঞ্চগড়সহ আরও প্রায় ১৩ হাজার হেক্টর জমি চা আবাদের জন্য উপযোগী রয়েছে। সেক্ষেত্রে মোট আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ৭৩ হাজার হেক্টর পরিকল্পিত সময় ও সম্পদ বিবেচনায় সম্পূর্ণ নতুন অর্থাৎ সম্প্রসারণ আবাদি ১৩ হাজার হেক্টর ধরা হয়েছে। অতএব ২০২১ সাল নাগাদ মোট চয়নযোগ্য আবাদি লক্ষ্যমাত্রা ৭৩ হাজার হেক্টরে উন্নীত হবে।

ঙ) নতুন আবাদিতে যতই নতুন ও উন্নত জাতের চা লাগিয়ে উন্নত ব্যবস্থাদি প্রয়োগ করা হোক না কেন, এখন থেকে আগামী ২০১০ সালের আগে জাতীয় গড় উৎপাদন বৃদ্ধিতে তা এককভাবে তেমন লক্ষণীয় অবদান রাখতে সক্ষম হবে না তবে এর পরবর্তী দশক এর সুফল ভোগ করবে। সুতরাং এ মধ্যবর্তী কালটুকু অলস সময় যাপন না করে চলতি আবাদিতেই লভ্য প্রযুক্তির সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার নিশ্চিত করে 'নিবিড় চাষের' উপরই অত্যধিক জোর দিতে হবে। ধরা যাক এ সময়টা ২০২০ সাল পর্যন্ত। সে অবধি প্রচেষ্টা অবশ্যই অব্যাহত রাখতে হবে এবং ঐ পর্যন্ত নিবিড় চাষই অধিক উৎপাদনে মূখ্য ভূমিকা রাখবে পাশাপাশি, সম্প্রসারণ আবাদি ও পুনঃরোপণের মাধ্যমে নতুন চায়ের সংযোজনও অব্যাহত থাকতে হবে। পরিকল্পনাকালের মধ্যেই তা সুফল দিতে শুরু করবে। তবে সর্বোচ্চ ফলনকাল, পরিকল্পনাকালের বাইরে ব্যপ্ত থাকবে।

৪.২। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নীতি ও সুপারিশমালা

উৎপাদন বৃদ্ধির এ পরিকল্পনা ছক অনুযায়ী কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত নীতি ও সুপারিশ রাখা হলো :

ক) ফলন বৃদ্ধির কলা-কৌশলে যে সম্পদ ব্যয় হবে তার একটা চূড়ান্ত লভ্যসীমা রয়েছে। সম্পদ (ইনপুট) এর বেশি ব্যয় প্রাপ্ত বাড়তি উৎপাদনে না পুষিয়ে বরং ক্ষতির দিকেই টানবে। সুতরাং ফলন বৃদ্ধি করা সম্ভব হলেও উৎপাদন অর্থকরী পর্যায়ে রাখতে প্রযুক্তি ও সম্পদ ব্যবহারে ধৈর্য্যশীল ও সমন্বিত হতে হবে।

খ) অভিষ্ট লাভজনক পর্যায়ের উচ্চ ফলন পেতে কর্মসূচিগুলো অবশ্যই একটি সুনির্দিষ্ট সময় সীমায় বেধে বাস্তবায়নে দৃঢ় ও প্রত্যয়ী হতে হবে।

গ) সময়মতো এবং প্রয়োজনীয় পুঁজি বিনিয়োগের জন্য ব্যাংকিং সমর্থনে অর্থায়ন

নিশ্চিত করতে হবে

ঘ) নিবিড় আবাদি হোক বা সম্প্রসারণ ও পুনরাবাদের মাধ্যমে নতুন আবাদিই হোক-আধুনিক ও প্রাপন-সম্ভব সকল বিজ্ঞানও প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। সময় মত মাটির উর্বরতা সংরক্ষণ, সার প্রয়োগ নীতিমালা মেনে চলা, উফশী ক্লোন ও বীজ চারার ব্যবহার ও মাঠের যাবতীয় আদর্শ কৃষিতাত্ত্বিক পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। রোপণ ও পরিচর্যা, ছাঁটাই, চয়ন, ছায়াতরুর ব্যবহার, পানি নিষ্কাশন, মৃত্তিকার তস রক্ষা এবং খরা ও রোগ-বালাই প্রতিরোধ ইত্যাদি ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এ সকল ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত

ঙ) সকল নতুন আবাদিতে অবশ্যই উফশী ক্লোন বা বীজজাত চা রোপণ করতে হবে ক্লোন চারা বা উন্নত বীজ পরিকল্পিতভাবে রোপণ কালের পূর্বেই জন্মিয়ে যথা সময়ে সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। উন্নত বাগানগুলোকে তাঁদের বাণিজ্যিক স্বার্থ অক্ষুণ্ন রেখেই অপেক্ষাকৃত কম উন্নত, বিশেষ করে "রুগ্ন বাগান"গুলোকে তাঁদের নিজস্ব প্রয়োজনীয় লক্ষ্য সীমার অতিরিক্ত (ধরা যাক ৫-১০%) অতিরিক্ত চারা জন্মিয়ে প্রকৃতমূল্যে বা কিঞ্চিৎ লভ্যাংশে চারা সরবরাহে উৎসাহিত করতে হবে এছাড়া বাগান বহির্ভূত বেসরকারি নার্সারিতে স্বীকৃত জাত বিটিআরআই কর্তৃক প্রত্যয়নসাপেক্ষে চা নার্সারি করে চারার অধিক সরবরাহ নিশ্চিত করা যেতে পারে।

চ) দক্ষ ব্যবস্থাপক, মাঠকর্মী এবং শ্রমিক জনবল পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অপরিহার্য অঙ্গ প্রয়োজনে এঁদের প্রাতিষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ দিয়ে আরও কর্মদক্ষ করে তুলতে হবে।

ছ) উৎপাদন উপকরণ সামগ্রী যেমন, সার, পেস্টিসাইড, সিঞ্চনযন্ত্র, কৃষি উপকরণ, সেচ যন্ত্রপাতি, ছাঁটাই দা ইত্যাদি প্রয়োজনকালের আগেই সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে

জ) কর্মপরিবেশ-রক্ষার সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

ঝ) এ উন্নয়ন পরিকল্পনা বর্তমান নিবন্ধীকৃত ১৬২টি বাগান ছাড়াও অস্তিত্ববিহীন বাগান ছাড়া যেগুলো চালু রয়েছে তার বরাদ্দ জমির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে

ঞ) খরাকালীন সেচের জন্য পর্যাপ্ত পানির আধারের সংস্থান রাখতে হবে।

পাদটীকা: নতুন এলাকায় বা অঞ্চলে যদি কোন চা বাগান প্রতিষ্ঠা করা হয় সেজন্য নতুন করে পৃথক পরিকল্পনায় নেয়া যেতে পারে। চা উৎপাদনে তখন উহা নতুন সংযোজন হিসেবে গণ্য করতে হবে। এক্ষেত্রে বিশ্বের কয়েকটি দেশ, যেমন- কেনিয়া, শ্রীলংকা, ইন্দোনেশিয়া, ইত্যাদি দেশের আদলে ক্ষুদ্রায়তন চা আবাদ (স্মল হোল্ডিং টি গ্রোয়ার্স) উৎসাহিত করা যেতে পারে ক্ষুদ্রপর্যায়ে চা আবাদি যা পঞ্চগড় এলাকায় করা হচ্ছে। প্রচলিত এলাকা ছাড়া যেমন- সম্প্রতি পার্বত্য শান্তি চুক্তির ফলে অপেক্ষাকৃত অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার কারণে পার্বত্য জেলাগুলোতে পৃথক পরিকল্পনার আওতায় নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও পাহাড়ি ভূমির যথোপযুক্ত ব্যবহারকল্পে চা চাষে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। এতে চায়ের জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং চা চাষে বৈচিত্র্যও বাড়বে।

ঊনবিংশ অধ্যায়
বিবিধ

চা স্তোত্র

(কবি কাজী নজরুল ইসলাম)

চায়ের পিয়াসী পিপাসিত চিত্ত আমরা সাতক দল,
দেবতারা কন সোমরস যারে সে এই গরম জল।
চায়ের প্রসাদে চার্বাক ঋষি ব্যাকরণে হ'ল পাশ
না নাই পেয়ে চার পেয়ে জীবে চর্বণ করে ঘাস
লাখ চ'খ'ইয়া চালাখ হয়, সে প্রমাণ চাও কত লাখ?
মাতালের দাদা আমরা চাতাল, বাচাল বলিস, বল।
চায়ের নামে যে সাড়া নাই দেয়, চাষাড়ে তারেও কও
চায়ে যে 'কু' বলে 'চাকু' দিয়ে তার নাসিকা কাটিয়া লও।

(অবকাশ-১ চন্দ্রবিন্দু থেকে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল)

বাঙালির গর্ব কবি কাজী নজরুল ইসলাম এর চা নিয়ে একটি কবিতার অংশ এরূপ "কাপ – কেটলী বাসিনী, সিদ্ধি - বিধায়িনী মানস - তাপস হারিণী।" বলে যে, সোমরসের বন্দনা করেছেন, যার ব্যবহার ব্যাতীত আজ সামান্যতম অতিথি আপ্যায়নও সম্ভব নয়, সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সেই চায়ের উৎপাদনে, উৎকর্ষ সাধনে সতত নিবেদিত বিটিআরআই এর চা বিজ্ঞানীগণ।

About a Cup of Tea
If the stranger
say unto thee
That
he thirsteth
Give him
a cup
Of tea.
-Confucious

The Planters' Chronicle – March 1988 থেকে সংগৃহীত ।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের চা নিয়ে ইংরেজি কবিতার কয়েকটি লাইন –
"Come oh come ye tea-thirsty restless ones – the kettle boils, bubbles and sings, musically."

- Rabindranath Tagore

এসো চায়েরই রাজ্যে

এই বইয়ের লেখক ড. মাইনউদ্দীন আহমেদ ১৯৯২-৯৬ সনে যখন বিটিআরআই উচ্চ বিদ্যালয়ের কার্য নির্বাহী কমিটির সহ-সভাপতি ছিলেন তখন তিনি বিদ্যালয়ের কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সাংস্কৃতিক/বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পরিবেশনার উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক শ্রী হরিপদ সরকারকে চায়ের উপর একটি গান রচনার অনুরোধ করেন। বিদ্যালয়ের সহ-সভাপতি ড. মাইনউদ্দীন আহমেদ-এর প্রতি সম্মান দেখিয়ে শ্রী হরিপদ সরকার এতদাঞ্চলের কবি ও সাহিত্যিক নৃপেন্দ্রলাল দাশ, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শ্রীমঙ্গল সরকারি কলেজকে চায়ের উপর একটি গান লিখে দিতে রাজি করান। স্বনামধন্য কবি নৃপেন্দ্রলাল দাশ ছন্দ মিলিয়ে অত্যন্ত স্বাবলীল ভাষায় 'এসো চায়ের রাজ্যে' গানটি বিটিআরআই উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য রচনা করেন। গানটির সুরকার শ্রীমঙ্গলের আরেক কৃতীসন্তান শ্রী সীতেশ দাশ। গানটি বিটিআরআই উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা এখনও বিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক/ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গর্বের সাথে পরিবেশন করে থাকে ।

এসো চায়েরই রাজ্যে, এসো চা পিয়াসীজন
চায়ের গন্ধে ভরে যাবে মন ॥
যদি পেতে চাও এই ক্যামেলিয়ার মন
এই সবুজে কর বিচরণ ॥
সে যে চীন জাপানের মজার সন্দেশ
তার রসে মজেছে রে সোনার বাংলাদেশ ॥
এখানে হয় দিনের শুরু চায়ের সুগন্ধে
রাত আসে ভাই রসের আনন্দে ॥

References

Ahmed, M. 2005. Tea Pest Management. Evergreen Printing and Packaging, Dhaka. 101p.

Ahmed, N. 1963. Improving the tea plants in Pakistan. *Tea J. Pak.* 1(2): 26-33.

Akula A, Akula C and Bateson M. 2000. Betaine, a novel candidate for rapiid induction of somatic embryogenesis in tea (Camrllia sinensis L.). Plant Growth Regu. 30: 241-246.

Alam, A.F.M.B. 2002. Researches on varietal improvement of tea and their utilization in the tea Industry of Bangladesh. *Procedings* of the seminar on varietal development of tea in Bangladesh, 13 July, 2002.

Amarakoon, T 2004. Tea for health. The Tea Research Institute of Sri Lanka.37p.

Anthony Burgess 2005. The book of tea. Fance

Antrobus, H.A. 1957. A History of the Assam Company 1839-1953. T & A Constable Ltd. Edinburg.

Aoki, S. 1984. Varietal differences & effects of nitrogen fertilization on decline of photosynthetic rate in overwintered tea leaves. Japanese Journal of Crop Science. 56(2): 252-256

Baildon, S. 1877. Tea in Assam. Calcutta.

Bajaj YPS (1987) Cryopreservation of plant cell cultures and its prospects in agriculture and forest biotechnology. Biotechnology in Agriculture. Oxford and IBH Publishing Co. New Delhi, pp. 109-113.

Buckingham, J. 1885. Papers regarding the Sau Tree and its remarkable influence on the tea bush. Indian Tea Association, Calcutta.

Balentine, D.A. 2001. The role of tea flavonoids in cardiovascular health. Proceedings of 2001 International Conference on O-Cha (tea) Culture & Science, Session III, Shizuoka, Japan. pp. 84-89.

Balentine, D.A., Wiseman, S.A. & Bouwens, L.C. 1997. The chemistry of tea flavonoids. Critical Reviews in *Food Science & Nutrition*. 37: 693-704

Banerjee, B. 1993. Tea production and processing. Oxford & IBH Publishing Co., Pvt. Ltd., New Delhi, 336p.

Barua, D.N. 1989. Science and practice in tea culture. Tea Research Association, Calcutta. 493p.

Barua, P. K. 1956 . Wilson's *camellia. Camellian* 7: 18-20.

Barua, P. K. and Wight, W. 1958. Leaf sclereids in the taxonomy of *Thea* camellias. I. Wilson's and related camellias. *Phytomorphology* 8 : 257-264.

Barua, P.K. 1965. Classification of the tea plant species Hybrids. *Two and A Bud.* Vol. 12(2), Tocklai Experimental station, 1965.

Barua, P.K. and Dutta, A. C. 1959. Leaf sclereids in the taxonomy of *thea* camellias. II. *Camellia sinensis* L.Phytomorphology 9 : 372-382.

Barua, P.K. 1965. Classification of the tea plant species hybrids. *Two and A Bud:* Newsletter, Page 13– 38.

Basu, R.P. 1961. Drying of tea. Two & a Bud. 20: 27-33.
Bezbaruah, H.P. and Dutta, A.C. 1974. Tea germplasm collection at Tocklai Expermental Station *Two and a Bud* 24(2) : 23 – 30.
Chen, Xinyan 1994. Yunan-Origin of Tea Plants, Yunan Pepople's Press, pp. 25-38.
Chen, Z.M. 1990 The faunistic formation and change of the pest in the tea gardens. China Tea. 1: 6-8.
Cohen Stuart, C.P. 1920. Z. *Pflanzenz.* 7 : 157 (quoted by Hunter and Leake, 1933).
Cohen-Stuart, C.P. 1918. A Basis for Tea Selection in Bulletin du Jardin Botanique, Buitenzorg, Vol. I, Part 4.
Das SC (2001)Tea. In: Parthasaranathy VA, Bose T K, Deka PC. Biotechnology of horticultural crops. 1: 524-546.
Doi Y (1981) Feequenc of root diffrentation in anher culture of tea. Stud. Tea. 60: 1-3.
Dood AW (1994) Tissue culture of tea *(Camellia sinensis L.)* Areview. *Inter. J. Crop Agric.* 12 (3&4): 212-247.
Dutta, S.K & Basu, S. 1955. Reduced light intensity and nitrogenous manures. *Tea Trade and Industry.*
Eden, T. 1952. The nutrition of a tropical crop as exemplified by tea, in Reports of 13th International Horticultural Congress, pp. 1138-1145.
Ellis, R.T. 1984. Pruning & moisture stress. *Quarterly Newsletter,* Tea Research Foundation (Central Africa). 72:19.
Foster, A. S. 1944. Structure and development of sclereids in the petiole of *Camellia japonica* L. Bull. *Torrey bot* Cl. 71 :302-326
Gadd, C.H. 1927. Report of the Mycologist. Tea Research Institute, Ceylon, 2p.
Griffiths, J. 2007. Tea: the drink that changed the World. Deutsch, Carlton Publishing Group, London. 384p.
Gul S, Ahmed H, Khan IA and Alam M (2007) Assessment of genetic diversity in tea genotypes through RAPD primers. Pakistan Journal of Biological Science. 10 (15): 2609-2611.
Haberland G (1902) Culturversuchemit isolierten Pflanzenzellen. Sizungsber. Math. Naturwiss. Kl. Kais. Akad. Wiss. wien 111: 69-92.
Hadfield, W. 1963 Critical studies of the shade problem in Tea. *Two and a Bud,* 10 : 9.
Hadfield, W. 1968. Leaf temperature, leaf pose and productivity of the tea bush. *Nature,* 219: 282-284.
Hadfield, W. 1974a. Shade in north-east Indian Tea Plantation I. The Shade Pattern. *J. Appl. Ecol* . 11: 151-178
Hadfield, W. 1974b. Shade in north-east India tea plantations. II. Foliar illumination & canopy characteristics. Journal of Applied Ecology. 22: 179-199
Hajra, N.G. 2001. Tea Cultivation: Comprehensive Treatise. International Book Distributing Company, Lucknow, U.P. 518p.

Hemanta S, Ranjan BA and Biswajit B (2005) Potential of DNA based molecular markers for the protection of Indian tea. International tea symposium. 534-540.

Hilton, P.J. 1973. In vitro oxidation of flavanols. Phytochemistrfy II, 1243-1248

Humbert, H. and Gagnepain, F. 1943. Supplement a la Flore Generale de L'Indo-China. Tome premier, Museum National D'Histoire Naturelle, Paris : 313 :- 315.

Jhawar, R.S. 2000. Tea: the universal health drink. UBS Publishers' Distribution Ltd., New Delhi. 89p.

Jorge S and Pedroso MC (2003) Genetic Differentiation of Portuguese Tea Plant using RAPD Markers. HortScience 38(6): 1191-1197.

Kaemfer. E. 1712. Amoenitatum Exoticarum Politico-physico-Medicarum. 3: 605-631.

Kato M (1985) Regeneration of plantlets from tea stem callus. Jap. J. Breed. 35:317-322.

Kato M (1986) Micropropagation through cotyledon culture of *Camellia japonica* L. and *C. sinensis* L. *Japan J. Breed.* 36: 31-38.

Katsuo K (1969) The germination of tea seed, pollen and anther. Stud. tea. 39: 4149.

Kingdon-Ward, F. 1950. Dose wild tea exist? *Nature*. 165: 297-299.

Kitamura, Siro. 1950. *Acta Phytotax. and Geobot.*, Kyoto, 14 : 56.

Kuboi T, Suda M and Konishi S (1991) Preparation of protoplasts from tea leaves. In "Proc. Intern. Symp. Tea Sci. Shizuoka Japan. pp. 427-430.

Kuranuki Y and Yoshida S (1991) Cryopreservation of tea seeds and the excised embryonic axes in liquid nitrogen, "Proc. Intern. Symp. Tea Sci. Shizuoka Japah. pp. 419-422.

Laskar MA, Das SC, Deka PC and Bhattacharjee H (1993)Tissue culture of tea: Anther culture for haploid plant production. Proceedings of the international symposium on tea science & human health. TRA, Tea tech, Kolkata, India. pp. 194-201.

Manivel. L. 1980. Time of pruning tea bushes in relation to movement of photosynthates. *Two & a Bud.* 27(1): 8-10.

Masters, J.W. 1844. The Assam tea plant compared with the tea plant of China. J. *Agric-hort.Soc.*India 3:61

Matsuura T and Kakuda T (1990)Effect of precursor, temperatureand illumination on theanine accumulation in tea callus. *Agric. Biol. Chem.* 54: 2283-2286.

Middleton. E. & Kaswami. C. 1994. The Impact of plant flavinoids on mammalian biology: Implication for immunity,inflammation & cancer. In: Harborne JB. Ed. The Flavonoids, Advances in Research since 1986. London: Chapman & Hall. pp. 619-652.

Milion, D.J. and others. 1969. Agri Fd. Chemistry, 17, 717.

Mishra RK, Chaudhury S, Ahmad A, Pradhan M and Siddiqi TO (2009) Molecular analysis of tea clones (*Camellia sinensis*) using AFLP markers.

International Journal of Integrative Biology. 5(2): 130-136.
Modder, W.W.D. & Amarakoon, A.T.M. 2002. Tea and Health. The Tea Research Institute of Sri Lanka. 180p.
Mondal TK (2000) Camellia biotechnology: A biotechnologic search. *Inter J. Tea Sci.* 1 (2&3): 28-37.
Mondal TK (2000) Studies on RAPD markers for ditection of genetic diversity, in vitro regeneration and Agrobacterium mediated genetic transforma tion of tea (Camellia sinensis L.). Ph D. thesis Utkal University, India.
Mondal TK, Bhattacharya A, Lakshmikumaran M and Ahuja PS (2004) Recent advances of tea *(Camellia sinensis)* biotechnology. Plant Cell Tissue and Organ Culture. 76: 195-254.
Nakamura Y (1983) Isolation of protoplasts from tea plant. *Tea Japan* 58:36-37.
Othieno, C.O. 1983. Studies on the use of shade in tea plantation of Kenya I. Effects on nutrient uptake and yield of tea – preliminary results. Tea4 : 13 20.
Othieno, C.O. 1983. Effect of weather on the recovery from pruning & yield of tea in Kenya. Journal of Plantation Crops (Supplement). pp. 44-52.
Palni LMS (1993) Conservation of plant genetic resources; The role of Biotech-nology. in: Himalayan Biodiversity. Conservation Strategies (ed) U Dhar, Gyanodaya Prakashan, Nainital. pp. 481-496.
Palni LMS, Sood A, Sharma M, Rao DV, Chand G, and Jain NK (1991) Tissue culture studies in tea, Shizuoka Japah. pp Katsuo K (1969) The germi nation of tea seed, pollen and anther, Stud. Tea. 39:41-49.
Palni LMS, Sood A, Sharma M, Rao DV, Chand G, Pandey A and Jain NK (1993) Tissue culture of tea: Possibilities and liitations. In: Tea culture. pp. 21-31.
Pethiyagoda, U. 1966. The importance of the timing of pruning in relation to recovery. *Tea Quarterly*. 37: 80-85.
Powell J.J. Burden T.J. and Thompson R.P.H. 1998. In vitro mineral availability from digested tea: a rich dietary source of manganese. Analyst 123, 1721- 1724.
Purseglove, J.W. 1963. Tropical Crops. Dicotyledons 2. Longmans Green, London. pp. 599-611.
Pusat Penelition Tea dan kina 2009. More than a cup of tea. Indonesia, 1-143 pp.
Raina SK and Lyer RD (1983) Multicell pollen p-embryoids and callus forma-tion in tea anther culter. J. Plantation Crops (suppl.2):63-67.
Roberts, E. A. H. ; Wight, W. and Wood, D. J. 1958. Paper chromatography as an aid to the taxonomy of *Thea* camellias. *New phytol.* 57 : 211-225.
Roberts, G.R & Keys, A.J. 1978. Mechanism of photosynthesis in the tea plant *(Camellia sinensis* L.). J. Expt. Bot. 29: 1403-1407.
Sana, D.L. 1989. Tea Science. Ashrafia Boighar, Dhaka. 272p.
Sealy, J. R. 1958. A revision of the genus *Camellia*, London, The Royal Horticultural Society. pp. 111- 131.
Sharma, P.C. 1984. Cytogenetical and morphological studies on some triploid

tea (*Camellia sinensis* L.) produced from tetraploid-diploid crosses. Ph.D. Dissertation, Guwahati University. 231p.

Shing ID (1982) In "Proceedings of the 5th annual symposium on plantation crops". Bangalore. Sharda Press Bangalore.

Soujo. V. 1980. Effects of rainfall and shade on the incidence of yellow tea thrips, *Scirtothrips kenyensis*. Tea. 6: 7-12.

Stagg, G.V. & Millin, D.J. 1975. The nutritional and therapeutic value of tea. *J. Sci. Food Agric.* 26: 1439-1459.

Sudripta D, Borthakur A, Borthakur D and Borchetia S (2002) Cell culture systems in the for production of nutraceuticals. Inter. Tea Symp. pp. 517-533.

Sudripta, Borthakur D and Borthakur S (2005) Cell culture system in tea for production of nutraceuticals. International tea symposium. 517-533.

Sweet. R. 1818. Hortus suburbanus Londonensis, London.

Takeo, T. 1983. Effect of clonal specificity of the monoterpene alcohol composition of tea shoots on black tea aroma profile. *Jpn. Agric. Res. Quart.* 17: 120-124.

Tanton. T.W. 1979. Some factors affecting the yield of tea. Expt. Agric. 15: 187-191.

Ukers, W.H. 1935. All about Tea. Book-I, Historical Aspects. Tea and Coffee Trade Journal Co., New York. Vol. 1. 559p.

Ukers, W.H. 1935. All about Tea. Book-II, Commercial Aspects, Tea and Coffee Trade Journal Co., New York. Vol. II. 568p.

Vavilov. N.I. 1926. The origin variation, immunity of cultivared plants. Chronica Botanica. 1:6.

Walker. R. 1996. Antioxidant content and other nutritional aspects of tea. A report on the influence of tea drinking on the nation's health, UK Tea Council. London.

Watt. C. 1908. The commercial product of India. John Murray, London.

Watt. G & Mann. H.H. 1903. The pest & blight of the tea plants. Calcutta. 396p.

Wattenberg, L.W. 1992 Inhibition of carcinogenesis by minor dietary constituents. Cancer Research 52 (Suppl.): 20858-20915.

Wight. W. 1962. Tea classification revised, Curr. Sci. 31 : 298-299.

Wight. W. and Barua. P. K. 1957. What is tea? *Nature* 179 : 506-507.

Wood. D.J. and Barua. P.K. 1958. Species Hybrids of tea. *Nature* 181 : 1674-1675|

হোসেন, মোহাম্মদ আফজাল ২০০৯, সহজ চা আবাদ, আর্ডন পাবলিকেশন, ঢাকা। পৃষ্ঠা – ১ – ৮২.

আলী, মীর মোজাহার ১৯৮৮, হাতে-কলমে চা উৎপাদন, মৌসুমী প্রিন্টার্স, ঢাকা : পৃষ্ঠা – ১ – ৯২.

কাদেরী, আমিনুর রশীদ ২০১৪, চা দেশে দেশে, অবীর প্রকাশন, ঢাকা।

ড. মাইনউদ্দীন আহমেদ ১৯৫৭ সালের ১ ডিসেম্বর বরগুনা জেলার পাথরঘাটা উপজেলার মুন্সিরহাট কালীবাড়ি গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। চা-এর কীটদমনে তাঁর পরিচিতি বর্তমানে দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও ব্যাপৃত।

১৯৮৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রাণিবিদ্যার কীটতত্ত্বে ১ম শ্রেণিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৯১ সালে যুক্তরাজ্যের লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইম্পেরিয়াল কলেজ থেকে কীটতত্ত্বে এমএসসি ও DIC ডিগ্রি প্রাপ্ত হন। ১৯৯৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ঢাকা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ হতে ১৯৮৭ সালে বিএড ডিগ্রিও অর্জন করেন। ড. আহমেদ ১৯৮৬ সালে মুন্সিগঞ্জের রামপাল ডিগ্রি কলেজে জীববিজ্ঞান বিভাগে প্রভাষক পদে চাকরিজীবন শুরু করেন। গবেষণার প্রতি প্রবল আগ্রহের কারণে তিনি ১৯৮৭ সালের প্রথম দিকে বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট-এ বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (কীটতত্ত্ব) পদে যোগদান করেন। তিনি বিগত ১৭/১০/২০১১ তারিখ বিটিআরআই এর ভারপ্রাপ্ত পরিচালকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ২৮/০৬/২০১২ তারিখ হতে পরিচালকের দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী এমএস, এমফিল এবং পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেছেন। আরও পাঁচজন গবেষক বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি গবেষণারত আছেন। ইতোমধ্যে দেশে-বিদেশের বিভিন্ন জার্নালে তাঁর ৬৯টি পূর্ণাঙ্গ গবেষণা প্রবন্ধ ও ৪১টি বৈজ্ঞানিক প্রকাশনাসহ সর্বমোট ১১০টি প্রকাশনা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ২০১১ সাল থেকে 'Tea J. Bangladesh' এর চিফ এডিটর এর দায়িত্ব পালন করছেন। ২০০৩ সালে বিটিআরআই কর্তৃক প্রকাশিত 'বাংলাদেশে ক্ষুদ্র পর্যায়ে চা চাষ নির্দেশিকা' বই রচনায় অন্যতম লেখকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ২০০৫ সালে 'Tea Pest Management' নামে একটি বই প্রকাশ করেন যা ইতোমধ্যে দেশে-বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য হিসেবে সাদরে গৃহীত হয়েছে। ড. আহমেদ ১৯৯৩ সালে ভারতের কোলকাতায় অনুষ্ঠিত 'TEATECH', ২০০৭ সালে শ্রীলংকায় অনুষ্ঠিত 'Colombo International Tea Convention' এবং 'FAO/IGG Committee on MRLs' এবং ২০০৬ সালে চীনের বেইজিংসহ কয়েকটি প্রদেশে Pesticide Formulation Plant পরিদর্শন করেন। এছাড়াও দেশে-বিদেশে বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম এবং ওয়ার্কশপে সফলতার সাথে দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ইতোমধ্যে তিনি যুক্তরাজ্য, ভারত, চীন, শ্রীলংকা ও ইন্দোনেশিয়া সফর করেছেন। বিগত ২০১১ সালের নভেম্বরে ভারতের টোকলাই টি রিসার্স এ অনুষ্ঠিত World Tea Science Congress এ ড. আহমেদ তাঁর গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপনায় ২য় স্থান অধিকার করেন। তাছাড়া ২০১২ সালে কোলকাতার Shakti Biotech Ltd. এর আমন্ত্রণে গবেষণা ও উন্নয়ন বিষয়ে কোলকাতা সফর করেন। ২০১৪ সালের নভেম্বরে চীনের হাংজুতে 'International Tea Symposium' এ যোগদান করেন এবং Country profile উপস্থাপন করেন। তিনি বাগান মালিক, ব্যবস্থাপক, ক্ষুদ্রচাষি সকলের নিকট অতিপরিচিত ও সফল বিজ্ঞানী হিসেবে সমাদৃত। ব্যক্তিজীবনে তিনি একজন সৎ, সদালাপী, আন্তরিক, বন্ধুবৎসল ও সামাজিক মানুষ।